বাংলাদেশের গ্রন্থাগার

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার

প্রথম খণ্ড

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

দেবদত্ত এণ্ড কোম্পানী
৬নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটককে—

পণ্ডিতেরা গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন, কিন্তু সেগুলোকে ঠিক সাধারণ গ্রন্থাগার বলা যায় না। আধুনিক যুগে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্তন (১৭৮৪) থেকে আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত বলা চলে। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটি সাধারণের জন্যেও ছিল না, আরম্ভে তা ঠিক 'সাধারণ' গ্রন্থাগারও ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে 'লটারি' করে সংগৃহীত অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছিল বলে জানা যায় কিন্তু সে প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। অবশ্য বড়লোকের দু'একটা গ্রন্থাগার সাধারণে ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকলেও তাকে সাধারণ গ্রন্থাগার আখ্যা দেবার ন্যায়-সঙ্গত কোন কারণ নেই। সুতরাং ১৮৩৫ সালে স্থাপিত 'কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী'কেই প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার বলে ধরা যেতে পারে। তারপর ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকে ইংলণ্ডে 'লাইব্রেরী এ্যাক্ট' বলবৎ হবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও গ্রন্থাগার আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে ও সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরপর একশো বছরের ওপর অতীত হয়েছে কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাগারের ইতিহাস লিখবার কোন চেষ্টা হয়নি। বাংলা ভাষায় 'লাইব্রেরীজ অব লণ্ডন' বা 'লাইব্রেরীজ অব দি ওয়ার্ল্ড'-এর মতো বই থাকা উচিত—এবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের বিন্দুমাত্র অবকাশ আছে বলে বিশ্বাস করি না।

পৃথিবীর বেশীর ভাগ মূল্যবান গ্রন্থই কলকাতা আর তার আশেপাশে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ছড়িয়ে আছে। এছাড়া বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলার আর ভারতের বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস। এদিক থেকে বিচার করলে গ্রন্থাগারের ইতিহাসের দাম খুব বেশী। কিন্তু সে ইতিহাস আবিষ্কারের কাজ অত্যন্ত দুরূহ আর দীর্ঘদিনের অবিচল চেষ্টায়ই তা' সম্ভব।

'বাংলাদেশের গ্রন্থাগার' রচনার কৃতিত্বে মাসিক বসুমতীসম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের দাবি সমধিক। তাঁরি পরিকল্পনাকে আমি সাধ্যমত রূপ দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়বো আগে এ ভাবতেও

পারিনি। তাঁর কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য না পেলে দীর্ঘদিন ধরে এ কাজ চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবই হতো না। এ ছাড়া এ বই রচনায় অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, যুগান্তরের বার্তাসম্পাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু ও সাহিত্য শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর সাহায্যের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

'বাংলাদেশের গ্রন্থাগারে' যে সমস্ত গ্রন্থাগারের ইতিহাস দেওয়া হয়েছে এ ছাড়া আরো বহু গ্রন্থাগারের ইতিহাস দেওয়া হয়তো উচিত ছিল। কিন্তু কেন সেটা সম্ভব হয়নি তার কোন কৈফিয়ৎ নেই—কৈফিয়ৎ দিতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। আরেকটা কথা এখানে বলতে হয়। কলকাতা ও হাওড়ার প্রায় সব লাইব্রেরীই সকাল (৭টা—৮টা)—বিকাল (৬টা—৯টা) খোলা থাকে। শুধু এশিয়াটিক সোসাইটি, ন্যাশনেল লাইব্রেরী ও কলিকাতা কমার্সিয়াল লাইব্রেরী খোলা থাকে দশটা-পাঁচটা, আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ খোলা থাকে দু'পুর বারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা অবধি।

৩৬, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩৬৩ সন

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়াই এই গ্রন্থে ছাপান হইয়াছে, সুতরাং সম্পাদকের দৃষ্টিতে সময়ের ব্যবধানজনিত ত্রুটী চোখে পড়িবে। এই ত্রুটীর কথা বিবেচনা করিয়াই প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রকাশক

সূচীপত্র

কলিকাতা

বিষয়	পৃষ্ঠা

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নূতন নামকরণ হয় ন্যাশনাল লাইব্রেরী আর তা আলিপুরে বড়লাট প্রাসাদ বেলভেডিয়ারে স্থানান্তরিত হয়। কিছু দিন আগেও কেউ ভাবতে পারতো না, জনসাধারণের পদধূলিতে বেল-ভেডিয়ার ধন্য হবে, বেলভেডিয়ার পরিণত হবে এমন এক পুণ্যতীর্থে, লেগে থাকবে এখানে পুণ্যার্থী বিদ্বজ্জনের ভিড়, যুগযুগান্তসঞ্চিত মানুষের সমস্ত চিন্তার আর অগ্রগতির এ হবে আহরণী! মানুষের সমস্ত চিন্তার আর মানসিক সম্পদের ধারক আর বাহক হবে বেলভেডিয়ার—কয়েক বৎসর আগেও একথা ভাবতে কে পেরেছিল, কে ভাবতে পেরেছিল—এরি ভেতর মানুষের যাত্রাপথের দুর্গম পথরেখা স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত হয়ে ধরা থাকবে? থাকতে পারে বেলভে-ডিয়ারের নিজস্ব একটা রোমাঞ্চকর ইতিহাস, কিন্তু আজ তার যে ইতিহাসের সুরু হ'ল তার চেয়ে সেটা রোমাঞ্চকর নয়, গৌরবের তো নয়ই! প্রাসাদে আর মন্দিরে তফাৎ আছে। একদিন আমরা সমীহ করেছি—সম্ভ্রম ভরে এর দিকে চেয়ে দেখেছি তফাতে থেকে, আর আজ আমরা সেখানে যাচ্ছি নতশির ভাবজগতে প্রসারিত মানব মনের জীবন্ত বিগ্রহকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবো ব'লে। প্রাসাদ আজ মন্দির হয়ে নূতন রূপে দেখা দিয়েছে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে একটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিক মাত্রেরই এর সভ্য হ'বার যোগ্যতা আছে। কিন্তু বাঙ্গালী এটিকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভাবে। এর কারণও রয়েছে: বাংলা দেশেই এর আরম্ভ, বিস্তৃতি আর প্রতিষ্ঠা, বাংলা দেশের সম্পদ আর প্রতিভায় এর পুষ্টি। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পেছনে প্রায় সোয়াশো বছরের এক বিচিত্র ইতিহাস রয়েছে।

১৮৩৫ সালের ৩১শে আগষ্ট কলকাতার দেশী-বিদেশী নাগরিকবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়। সে সভা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি জে, পি গ্রান্টের সভাপতিত্বে টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন

'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ষ্টকোয়েলার। এ সভায় স্থির হ'ল 'কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী' নামে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে, সকলেই এর সভ্য হ'তে পারবেন—দেশী-বিদেশী, ধনী-দরিদ্র কোন প্রভেদ এখানে থাকবে না, আর সকলেরই যাতে সুবিধা আর উপকার হ'তে পারে সেজন্য লাইব্রেরীতে সব রকমের বই পত্র রাখা হবে। এদিকে এর দশদিন আগে (২০শে আগষ্ট, ১৮৩৫) কলকাতার নাগরিকগণ আরেক সভায় 'মেটকাফ লাইব্রেরী হল' নামে একটি ভবন তৈরীর প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এটা ছিল বড়লাট মেটকাফ সাহেবের প্রতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন, তিনি কুখ্যাত প্রেস আইন রদ করেছিলেন। এ সভা দুটির একটার সঙ্গে অন্যটার কোন সম্পর্ক ছিল না। ১৮৩৬ সালের মার্চ মাসে 'কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী' আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়। স্বল্লায়ু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বই আর জনসাধারণের চাঁদাই ছিল এর সম্বল। চব্বিশ পরগণার এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন ডাক্তার ষ্ট্রং-এর এসপ্ল্যানেড রো'র বাড়ীর নীচের তলায় কয়েক বৎসর ধ'রে 'কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী'র কাজ চলতে থাকে। এখানে অল্প দিনের ভেতরই জায়গার অভাব অনুভূত হ'তে লাগলো। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা থাকলেও বইপত্র রক্ষার ব্যবস্থা এখানে ভাল ছিল না। স্থানাভাবে আর আর্দ্র আবহাওয়ায় গ্রন্থগুলি নষ্ট ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে (তুলনামূলক বৃটিশ মিউজিয়ামের ও এখানকার 'হিকিনস বেঙ্গল গেজেট' ১৮৪১), পরিচালন-ব্যবস্থার গলদও সম্ভবতঃ এর জন্যে অনেকটা দায়ী। ফলে লাইব্রেরী লিয়নস্ রেঞ্জে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উঠে যায় ও সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয় রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। এদিকে মেটকাফ হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ফ্রি মেশন ১৮৪০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর আর কমিটি স্বতন্ত্র লাইব্রেরী স্থাপন না ক'রে 'কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী'কে সেখানে উঠে আসতে আমন্ত্রণ জানান। লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাবে সরাসরি রাজী হন, অবশ্য তাঁদেরকে মেটকাফ হল নির্ম্মাণ বাবদ ষোল হাজার টাকা সাহায্য করতে হয়েছিল। ১৮৪৪ সালের জুন মাসে 'কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী' ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে নব-নির্ম্মিত 'মেটকাফ হল' ভবনে উঠে আসে। অনেকেই হয়তো বর্তমানে মেটকাফ হলের খবর জানেন না, কিন্তু ১৮৪৪ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত আশী বৎসর ধরে এই 'মেটকাফ

হল'ই ছিল কলকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র। ইংলণ্ডেও তখন এমন সুপরিচালিত লাইব্রেরী ছিল না—একথা লাইব্রেরীর বিদেশী পরিচালকবর্গ স্বীকার করেছেন। বাংলা দেশের প্রথম ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্র কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত হন ও লাইব্রেরীয়ানরূপে ১৮৮৩ সালে মারা যান। তাঁকে ঘিরে বাংলা দেশের সাহিত্যিকেরা এখানে এসে জড় হয়েছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রভাবের কথা এর জন্যে মেনে নিতে হবে যে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই লাইব্রেরীর অবস্থা দ্রুত অবনতির পথে চলতে থাকে। কলকাতায় এ সময়ে অনেকগুলো সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, এটাও কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর অবনতির একটা কারণ সন্দেহ নেই। ক্রমে লাইব্রেরীর দুরবস্থা চরমে পৌঁছে। ১৮৯৯ সালে কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর অবস্থা দেখে লর্ড কার্জন মর্মাহত হন। "লাখখানেক বই পড়ে আছে স্তূপাকারে, ইতস্ততঃ দু'চারজন লোক বসে সংবাদপত্র আর হাল্‌কা উপন্যাস পড়ছে, ঘরের ভেতর কবুতরেরা উড়ে বেড়াচ্ছে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে, যেন এখানে স্থায়ী বসবাসের অব্যাহত দাবী তাদের। আমার মনে এগুলো এক অজানা অস্বস্তির ভাব ফুটিয়ে তুললো"—লর্ড কার্জনের কথাগুলো তুলে দিলাম, অবস্থা যে কি দাঁড়িয়েছিল, এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

১৮৯১ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর আরম্ভ হয়। ভারত সরকারের রেকর্ড রক্ষকের হাতে এ লাইব্রেরীর ভার ন্যস্ত ছিল। ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরে ক্রমে জমে-ওঠা বইপত্র একত্র জড় করে এ লাইব্রেরী গড়ে ওঠে। আশ্চর্যের বিষয়, ফোর্ট উইলিয়ামস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজের আর লণ্ডনস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বোর্ডের গ্রন্থগুলো এখানে রক্ষিত ছিল দেখতে পাওয়া যায়। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের ব্যবহারের মধ্যেই এ লাইব্রেরীর কর্মপদ্ধতি সীমাবদ্ধ ছিল, বেসরকারী জনসাধারণ এখানকার বই ব্যবহার করতে পারতো না। বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুমতি পেলে বেসরকারী লোক এখানে বই পড়তে পারতো [রুল ৫ (এ) ১৮৯৯] বলে নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু তা কাজে খাটানো সাধারণের পক্ষে অসম্ভব ছিল বলেই মনে হয়।

লর্ড কার্জন বাংলা দেশকে ভাগ ক'রে আমাদের যে অনিষ্ট করেছেন তার তুলনা হয় না। এ ব্যাপারে তিনি আমাদের অভিশাপ কুড়িয়েছেন যথেষ্ট, কিন্তু

আমাদের অন্ততঃ একটা উপকার তিনি করে গেছেন যার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা চিরদিন স্মরণ করবো। সীমাবদ্ধ সরকারী গণ্ডী থেকে মুক্ত করে দেশবাসীকে তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী দিয়ে গেছেন, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী আর কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীকে যুক্ত করে আজকের এ বিরাট ন্যাশনাল লাইব্রেরী গড়ে উঠবার সূচনা করে দিয়েছেন তিনিই। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী দেখতে গিয়ে তিনি দেখলেন,—অসংখ্য বই পড়ে আছে, জনসাধারণের কোন কাজেই তা আসছে না। তিনি ঠিক করলেন, 'কলকাতাকে এ নামের যোগ্য লাইব্রেরী আমি দেবো।" লর্ড কার্জন গভর্ণমেন্টকে রাজী করিয়ে কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালাতে লাগলেন। শেষটায় ঠিক হল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সঙ্গে সেটা যুক্ত হবে। তিনটি সর্তে কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী তিনি (গভর্ণমেন্ট) কিনে নিলেন,—(১) প্রত্যেক অংশের মূল্য বাবদ ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে, (২) অংশীদারগণ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সভ্য বলে গণ্য হবেন আর (৩) যে সব বই অপ্রয়োজনীয় সেগুলো কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী পরিষদকে দিয়ে দেওয়া হবে। ১৯০৩ সালের ৩০শে জুন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। মেটকাফ হলে চলে এল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে লর্ড কার্জন এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বললেন—'এখানে থাকবে বিভিন্ন ভাষায় লেখা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী, পত্র-পত্রিকা, দলিল প্রভৃতি। সব বিষয়ের রেফারেন্সের বই থাকবে এখানে, ছাত্রদের গবেষণাগার হবে এ লাইব্রেরী, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের সমস্ত মালমশলা এখানে যোগাড় করা থাকবে, সম্ভব মতো ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেখানে যা লেখা হবে এ লাইব্রেরীতে তা পাওয়া যাবেই আর পাঠ করাও যাবে।"—তাঁর একথাগুলোর সত্যতা আজকের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ন্যাশনাল লাইব্রেরী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গবেষণা-গ্রন্থাগারদের একটি, নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম লাইব্রেরীয়ান মিঃ জে ম্যাকফারলেন বৃটিশ মিউজিয়ামের সহকারী লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। ফলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে অনুসৃত হয়েছে বৃটিশ মিউজিয়ামের পরিচালন পরিকল্পনা। মনীষী হরিনাথ দে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সর্বপ্রথম ভারতীয় লাইব্রেরীয়ান হন (১৯০৭-১১)।

বিশ বৎসর ধরে লাইব্রেরী মেটকাফ হলেই ছিল, কিন্তু লাইব্রেরীর কাজ দ্রুত এতোটা প্রসারিত হয়ে পড়ে যে, ১৯২৩ সালে ৬নং এসপ্ল্যানেড ইষ্টে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু এখানেও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় স্থানের অল্পতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরী জবাকুসুম হাউসে উঠে আসে। সেখান থেকেই ১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ন্যাশনাল লাইব্রেরী নাম নিয়ে চলে আসে প্রাক্তন বড়লাট প্রাসাদ বেলভেডিয়ারে। এখনও ৫নং এসপ্ল্যানেড ভবনে লাইব্রেরীর লেনদেন বিভাগ রয়েছে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ, আর ১৬৪০ খানা পাণ্ডুলিপি এখানে রক্ষিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, গবেষণা কার্যের জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরী অপরিহার্য। এখান থেকে ডাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র সভ্যদিগকে বই পাঠানো হয়। বিশেষ করে এখানে রয়েছে (১) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, (২) কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্য সমূহের প্রকাশিত বইপত্র, (৩) রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট ও পুঁথিপত্র, (৪) আমেরিকা ও গ্রেট বৃটেনের সরকারী দলিল-দস্তাবেজ, (৫) পুরাণো সংবাদপত্র সমূহ ও (৬) বিভিন্ন ভাষায় লেখা সম্ভব মতো রেফারেন্সের সমস্ত মূল্যবান আর দুষ্প্রাপ্য পুস্তক প্রবন্ধ। এখানকার কয়েকটি বিশেষ সংগ্রহ হল—(১) বুহার লাইব্রেরী—১৯০৪ সালে বর্ধমান জেলার বুহার গ্রামের জমিদার সৈয়দ সদ্রুদ্দিন আহ্মদ মুসাভি ১৫০০ উর্দ্দু, আরবী ও ফরাসী গ্রন্থ আর ৯৫০ খানা আরবী ও ফরাসী পাণ্ডুলিপি উপহার দেন। বুহার গ্রামের নামে এর নাম হয়েছে বুহার লাইব্রেরী। (২) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ—১৯৪৯ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব লাইব্রেরীর ৮০,০০০ মূল্যবান গ্রন্থ ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে তাঁর পরিবারবর্গ দান করেছেন। এতে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ইতিহাস, আইন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ প্রায় সব বিষয়েরই মূল্যবান গ্রন্থ সমূহ রয়েছে। এমন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিগত সংগ্রহ খুব কমই চোখে পড়ে। (৩) হায়দ্রাবাদের প্রাক্তন দূতাবাসের গ্রন্থাগার—৪২৯৫ খানা পুস্তকের বেশীর ভাগই সরকারী দলিল। (৪) রামদাস সেন সংগ্রহ—বহরমপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামদাস সেনের গ্রন্থাগারের ৩৫০০ বই তাঁর উত্তরাধিকারীরা ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে দান

করেছেন। এর প্রত্যেকটি বই মূল্যবান। (৫) রেওয়ার ত্রিপুরাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১০০ খানা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি লাইব্রেরীকে দান করেছেন নৃত্যানন্দ ভট্টাচার্য। এগুলো বিভিন্ন বিষয়ের অত্যন্ত দামী পাণ্ডুলিপি, তিনশত বৎসরের পুরাতন পাণ্ডুলিপি এতে রয়েছে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সংরক্ষণ দায়িত্ব ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রী-দপ্তরের হাতে ন্যস্ত রয়েছে আর ভারত সরকার কর্তৃক বহাল একটি পরিষদের ওপর ন্যস্ত আছে এর পরিচালন ব্যবস্থা। বি, এস কেশবন ন্যাশনাল লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান, ওয়াই এম মূলে লাইব্রেরীর স্পেশাল অফিসার আর সহকারী লাইব্রেরীয়ান চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।

[১১-৫-৫২]

এশিয়াটিক সোসাইটি

১৭৮৩ সালের আগষ্ট মাস। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সুপ্রীম কোর্টের সাধারণ বিচারপতি হয়ে স্যার উইলিয়াম জোন্স বিলাত থেকে জাহাজ ক'রে আসছেন।

সাগর পাড়ি দিয়ে জাহাজ ছুটে চলেছে। মেঘ-মেদুর আকাশ, বর্ষার স্বপ্ন-বিহ্বল রঙিন বিকাল। এমন রঙ-রূপের তুলনা সারা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নেই। অবাক দু'চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছেন উইলিয়াম জোন্স। বামে তার নীলাভ্র পারস্যের তটভূমি, পালে লেগেছে আরব দেশের হাওয়া, সামনে বিস্তৃত বিশাল ভারত। এই সেই এশিয়া। প্রাচ্য তার স্বপ্নের যাদু বিছিয়ে দিয়েছে। মায়াময় পরিবেশ—মহৎ সে ক্রীড়াভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন উইলিয়াম জোন্স। চোখের সামনে পর্দার ওপর ছবির রাশি ভেসে চলেছে অতি দ্রুত,—অতীতের এশিয়ার দিকে সম্ভ্রমভরে তিনি চেয়ে আছেন। বিজ্ঞানের আদি জননী আনন্দময় জীবন-শিল্পের মহিমময়ী ধাত্রী এশিয়া গৌরবদীপ্ত রাশি রাশি কর্মপ্রবাহের জয়টিকা পরে সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে সামনে—আকীর্ণ মানব-প্রতিভার লীলা-নিকেতন এশিয়াভূমি। বিচিত্র তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আর বৈচিত্র্যময় জীবনধারা! ধর্ম, শাসন, আইন-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, গড়ন আর মানবদেহসৌষ্ঠবের বহুর এ-মহাসমন্বয়ভূমি। মনে মনে উইলিয়াম খুশি হয়ে উঠলেন—কতো কি করা যায় এখানে, কতো কিছু পড়ে আছে আবিষ্কারের অপেক্ষায়! বাংলায় গিয়ে নিজের দেশের লোকদের নিয়ে তিনি কাজে নামবেন,—সঙ্কল্প তাঁর ঠিক হয়ে গেল।

উপরের এ কথাগুলো এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা-সভায় ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্স নিজে বলেছেন, সে আজ থেকে প্রায় এক শত সত্তর বছর আগের কথা।

এশিয়ার অতীত শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান নেই, গড়ে তুলতে হবে সে প্রতিষ্ঠান। উইলিয়াম জোন্স এদেশে পৌঁছেই এখানকার

য়ুরোপীয়দের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করলেন আর তাঁদের কাছ থেকে সাড়া পেলেন আশ্চর্য রকম। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার রবার্ট চেম্বার্সের সভাপতিত্বে ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী সভা ডেকে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র গোড়াপত্তন হ'ল। বিচারপতি হাউড, জন কর্ণাক, হেনরি ওয়াটসন ডেভিড এণ্ডারসন, হান্সিস গোল্ডউইন, জনাথান স্কট, জনসোর, রিচার্ড জনসন রালফ ক্রম, উইলিয়াম ডোভ, টমাস গ্রেহাম, চার্লস চ্যাপম্যান প্রমুখ উপস্থিত ত্রিশজন সভ্যকে নিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি সেদিন আরম্ভ হ'ল। এঁরাই ছিলেন এক কথায় সেদিনের য়ুরোপীয় সুধী-সমাজ। সোসাইটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে উইলিয়াম জোন্স বললেন, "অতীত এশিয়ার নৈসর্গিক বিবর্তন আর মানুষের কার্যকলাপের এ হবে গবেষণাগার।" সত্যি আজ তাই হয়েছে, প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে এমন সমৃদ্ধ গবেষণাগার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। পরবর্তীকালে এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে উঠেছে পৃথিবীময়, আর সেটাও হয়েছে এখান থেকে প্রেরণা পেয়েই, কিন্তু এমনটি আর কোথাও হয়নি। সোসাইটির সভাপতি পদের জন্য বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু পদের গুরুত্বের আর তাঁর সময়ের অল্পতার অজুহাত দেখিয়ে তিনি পাল্টা প্রস্তাবে উইলিয়াম জোন্সের নাম ক'রে পাঠালেন। ফলে উইলিয়াম জোন্স হলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সভাপতি (কার্য-বিবরণী, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৪)। তিনি ১৭৯৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত আমৃত্যু সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্যার জনসোর এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন।

'এশিয়াটিক সোসাইটি' নামেই সোসাইটির সূচনা হয়েছিল, আর ১৭৮৪ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত এ নামেই চলতেও থাকে। ১৮২৯ সালে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব লণ্ডন এক চিঠিতে এটাকে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু এর পরও এশিয়াটিক সোসাইটি নামেই এর কাজ চলতে থাকে বহুদিন। ১৮৩২ সালের মার্চ মাসে জেমস প্রিন্সেপ তাঁর কাগজের নাম 'জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি' দেওয়ার জন্য সোসাইটির সম্মতি চান ও তাকে সম্মতি দেওয়া হয়। তিনি সেখানে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' এই নাম ব্যবহার করতে থাকায় এ নামেই সোসাইটি চারদিকে

পরিচিত হয়ে পড়ে। ১৮৫১ সালের সমিতির আইন বই-এ প্রথম 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নাম দেখতে পাওয়া যায়। তার একশো বছর পরে ১৯৫১ সালে নাম বদলে আবার 'এশিয়াটিক সোসাইটি' নাম রাখা হয়েছে।

গোড়ার দিকে য়ুরোপীয় ছাড়া এদেশীয়দের সভ্য-তালিকা থেকে বাদই দেওয়া হয়েছিল। উইলিয়াম জোন্স তাঁর বক্তৃতায় সেদিন বলেছিলেন, 'এদেশীয় কোন শিক্ষিত লোককে এ সোসাইটির সভ্য করা হবে কিনা সেটা আমরা পরে ঠিক করবো।' তারপর বহুদিন এ প্রশ্ন আর উঠেনি, ১৮২৯ সালের আগে এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব আসেনি দেখা যায়। কিন্তু ১৮০৩ সালে রামকমল সেন কেরাণী হয়ে সোসাইটিতে প্রথম ঢোকেন। কি করে এটা ঘটেছিল, জানবার উপায় নেই। আসলে তিনি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ, তাঁকে বলা হ'ত 'নেটিভ সেক্রেটারী'। দেখতে পাওয়া যায়, ১৮২৯ সালের ৭ই জানুয়ারী ডাঃ এইচ এইচ উইলসন কয়েকজন ভারতীয়ের নাম প্রস্তাব করেন ও তাঁদের সভ্য-তালিকাভুক্ত করা হয়। এর পর ১৮৫৩ সালে রামকমল ঘোষের নাম এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সভাপতিরূপে দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সোসাইটির সেক্রেটারী হন। আর তিনিই হন সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি ১৮৮৫ সালে। বর্তমানের নিয়ম হ'ল, 'যে-কোন দেশের যে-কোন জাতির লোক এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হবার যোগ্য বলে গণ্য' হবে।

স্যার উইলিয়াম জোন্স যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন সোসাইটির নিজস্ব ঘরের প্রয়োজন ততটা অনুভূত হয় নি, সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরী রুমে সোসাইটির অধিবেশনাদি হ'ত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে জায়গা আর সহজলভ্য রইলো না। এদিকে সোসাইটির আরম্ভ থেকেই গড়ে উঠতে থাকে লাইব্রেরী আর মিউজিয়াম। সেক্রেটারীর বাড়ীতেই বইপত্র আর দ্রব্য-সামগ্রী থাকতো, তাতে অসুবিধে হতো বিস্তর—হারাবার ভয়ও ছিল। ফলে গভর্ণমেন্টের নিকট সোসাইটির নিজস্ব ঘরের জায়গার জন্যে আবেদন করা হ'ল (১লা ডিসেম্বর, ১৭৯৬)। আর নিয়ম করা হ'ল প্রত্যেক সভ্যকে প্রবেশমূল্য দুই মোহর ও ত্রৈমাসিক চাঁদা এক মোহর ক'রে দিতে হবে তাতে করে গড়ে

উঠবে গৃহ-নির্মাণ তহবিল। গভর্ণমেন্ট এ আবেদনের কোন উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। দ্বিতীয় এক আবেদন পাঠান হয় ১৮০৪ সালের ৪ঠা জুলাই। পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে রাইডিং স্কুলের যে জায়গা খাসে গিয়েছিল তার কথা সে আবেদনে উল্লেখ করা হয়। গভর্ণমেণ্ট অল্প জায়গা রেখে বাকি সমস্তটাই সোসাইটিকে দিয়ে দেন। পুলিস থানার জন্যে সেটা রাখা হয়েছিল, ১৮৪৯ সালে সে জায়গাটুকুও সোসাইটি পেয়েছে। জায়গা পাওয়ার পর ১৮০৫ সালে বাড়ী নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। বাড়ীর পরিকল্পনা তৈরী করলেন বাংলা দেশের তখনকার ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপ্টেন লক আর বাড়ী তৈরীর ভার নিলেন জিন জেক্স পিচন নামক ফরাসী দেশের এক ভদ্রলোক। চব্বিশ হাজার টাকার চুক্তি ফুরান হলেও খরচ ত্রিশ হাজার টাকার মতো পড়েছিল (কার্য-বিবরণী ১লা ফেব্রুয়ারী ও ৬ই এপ্রিল, ১৮০৬)। পরিকল্পনায় অদল-বদল করতে গিয়ে অবশ্য আরো খরচ পড়েছে। ১৮০৮ সালের প্রথম ভাগে সোসাইটির কার্যালয় নূতন বাড়ীতে চলে আসে।

এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যকলাপ বহুবিস্তৃত। আমাদের বর্তমান সরকারী মিউজিয়ামের ভিত্তি গড়েছে সোসাইটির মিউজিয়াম আর প্রাচীন মুদ্রা। বর্তমানে সোসাইটিতে অশোকের প্রস্তরলিপি (খৃঃ পূঃ ২৫০) ও খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের আগের একখানা তাম্রলিপি রক্ষিত আছে। এ ছাড়া প্রায় ৪ শত ছবির মূল্যবান সংগ্রহ সোসাইটিতে রয়েছে, জগদ্বিখ্যাত শিল্পী বুকাননের ছবিও রয়েছে তার ভেতর। তৈলচিত্র, প্রতিকৃতি আর আবক্ষ প্রতিমূর্তি সোসাইটির সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য। সোসাইটির গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগে আরবী ফারসী, তিব্বতী ও সংস্কৃত ভাষায় আজ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকাশিত পুস্তকগুলোর মধ্যে ডাঃ এস, কে, মিত্রের 'আপার এট্‌মস্‌ফিয়ার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বৎসরে স্যার যদুনাথ সরকারের বাংলার ইতিহাসের মূল পুস্তকগুলোর অনুবাদ প্রকাশিত হবে। গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ ও সোসাইটির জার্ণালের জন্য সরকারী অর্থ-সাহায্য ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমানে ত্রৈমাসিক 'জার্ণাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি' সোসাইটির মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। জার্ণালের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের এক ইতিহাস।

এশিয়াটিক সোসাইটি

১৭৮৪ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত ২০ ভল্যুম 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' বের হয়েছিল। ১৮৩২ সাল থেকে জেমস প্রিন্সেপ 'জার্ণাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' বের করতে থাকেন। সোসাইটি জার্ণালের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছেন ১৮৪২ সালে। সেই থেকে আজ অবধি সোসাইটির ত্রৈমাসিক মুখপত্র হিসাবে জার্ণাল প্রকাশিত হয়ে আসছে।

সোসাইটিতে বর্তমানে অল্পসংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা ও তাম্রলিপি সংগৃহীত হয়েছে। সংখ্যায় অল্প হ'লেও এগুলো অত্যন্ত দামী। সোসাইটির বর্তমান কার্যকলাপের ভেতর নিয়মিত সভা-সমিতির অধিবেশনাদি ছাড়া পৃথিবী-বিখ্যাত মনীষীদের দ্বারা বক্তৃতার আয়োজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরীর মতো প্রাচ্য-বিদ্যা সম্বন্ধে এমন সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার আর কোথাও নেই। সোসাইটি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই আরবী, ফারসী সংস্কৃত, চীনা, শ্যামদেশীয় ও তিব্বতী প্রভৃতি প্রাচ্যভাষাসমূহের দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হয়। ডাঃ উইলসনের পরিচালনায় প্রাচ্য পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ভাষার অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করা হয় গোড়ার দিকেই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পুস্তক ও মেকেঞ্জী-সংগ্রহও আরম্ভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করে। 'শ্রীরঙ্গপতন প্রাইজ কমিটি' টিপু সুলতানের নিজস্ব লাইব্রেরীর কিছু বই সোসাইটি-গ্রন্থাগারে দান করেন, ১৮০৮ সালে। তা ছাড়া কেরি, গ্লেডউইন ও গিলখ্রাইষ্টের সংগৃহীত প্রাচ্য ভাষার পাণ্ডুলিপিগুলো পাওয়া যায় সরকারের কাছ থেকে, সরকারী ব্যয়ে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজও চলতে থাকে। এমনি ক'রে ক্রমে সোসাইটি-গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বর্তমানে সোসাইটি গ্রন্থাগারে প্রাচ্যভাষার প্রায় এক লক্ষ বই রয়েছে আর পাণ্ডুলিপির সংখ্যা হবে ছত্রিশ হাজারেরও বেশী। তামিল-তেলেগু ভাষায় ও যাভা-মালয়-শ্যামের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি আর সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার, এ ছাড়া ছয় হাজার আরবী, ফারসী ও প্রায় সাত শত চীনা-তিব্বতী পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। সোসাইটি-গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলো (১) সাধারণ, (২) সংস্কৃত-গোষ্ঠির ভাষা, (৩) ইসলাম বিষয়ক ও (৪) চীন-তিব্বত বিষয়ক—এই চার শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, তবে এর বাইরেও আরো অনেক কিছু থেকে

যায়। গ্রন্থাগারে উল্লেখযোগ্য অনেকগুলো গ্রন্থ-সংগ্রহ দান হিসাবে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে রয়েছে (১) সি, ডব্লিউ, গার্ণার সংগ্রহ, গ্রীক ও লেটিন ভাষার চার শতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ, (২) আর, পি, চন্দ সংগ্রহ, ভারতীয় শিল্প ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক বইপত্র, (৩) বি, সি, লাহা সংগ্রহ ও (৪) সি, সি, ঘোষ সংগ্রহ। শেষোক্ত সংগ্রহ ইতিহাস বিষয়ে একটি অত্যন্ত দামী সংগ্রহ। ভারতে বৃটিশ শাসনের গোড়ার দিকের ইতিহাস আলোচনায় এ সংগ্রহ অত্যন্ত দরকারী। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার প্রাচ্য সম্বন্ধীয় গবেষণাকার্যে ও প্রাচ্যভূমির সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস জানাবার পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার চল্লিশ হাজারেরও বেশী সাময়িকপত্র সোসাইটিতে রয়েছে। এই লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ প্রধানতঃ সোসাইটির সভ্যরাই পেয়ে থাকেন। সভ্যদের ত্রৈমাসিক চাঁদা বর্ত্তমানে দশ টাকা।

এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান সভাপতি ডাঃ এস কে মিত্র, সম্পাদক অধ্যাপক জে এম সেন, লাইব্রেরীয়ান এস কে সরস্বতী ও ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান এস চৌধুরী।

[১৮-৫-৫২]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

ইংরাজী ১৮৯৩ সালের ২৩শে জুলাই, ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণের কথা। কয়েকজন সাহিত্যানুরাগীর, বিশেষভাবে মিঃ এল লিওটার্ড ও ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর চেষ্টায় ২।২ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার' নামে এক সাহিত্য-সভা স্থাপিত হ'ল। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন। ইহার সভাপতি হলেন বিনয়কৃষ্ণ দেব ও সহকারী সভাপতি এল লিওটার্ড ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এ ছাড়া তখনকার কর্মাধ্যক্ষ-গণের মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ তালুকদার। প্রথম দিকে প্রতি রবিবারে বেঙ্গল একা-ডেমি অব লিটারেচারের অধিবেশন হতো, পরে সেটা পনেরো দিবস অন্তর হতে থাকে। এই সমিতির মুখপত্র হিসেবে 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার' নামক পত্রিকা এ বছর আগষ্ট মাস থেকে বের হ'তে থাকে। সভার কার্যাদি তখন ইংরাজী ভাষার মারফতেই হতো।

ক্রমে ইংরেজী বহুলতার আপত্তি উঠতে লাগলো এবং উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম-এ-সি-এস-এর প্রস্তাবে বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার-এর বাংলা প্রতি-শব্দ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিসদ—এই নাম গৃহীত হল। পত্রিকার নাম বদলে হল সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা। ১৩০১ সালের ১১ই বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরি-ষদের প্রথম অধিবেশন হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত ও সহকারী সভাপতি নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সম্পাদক হলেন এল লিওটার্ড ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিসদের কার্যালয় ২।২, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে ছিল। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের মাঝামাঝি কার্যালয় উঠে যায় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ২৯, গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে আর তাঁর ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে অধিবেশনাদি হ'তে থাকে। এদিকে সভ্য সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগলো। সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে কার্যালয়

স্থানান্তরিত করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ এগার জন সভ্য নিজেদের নাম স্বাক্ষর করা এক পত্র লিখলেন সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে। সে হ'ল ১৩০৬ সালের শেষ দিকের কথা। ফলে ৩রা ফাল্গুন (১৯শে ফেব্রুয়ারী) বুধবার সাড়ে পাঁচটায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশন হ'ল এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্যালয় সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। পরদিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ স্থানান্তরিত হ'ল ৩৭১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে। শোনা যায়, গ্রে ষ্ট্রীট থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনয়কৃষ্ণ দেব প্রমুখ ব্যক্তিগণ পরিষদের গ্রন্থাদি ঘাডে করে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের এই নূতন ভাড়াটে বাড়ীতে। কাজ বেড়ে চললো। এখানকার ছোট ঘরে পরিষদের কাজ আর চলে না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নিজস্ব বড় বাড়ীর প্রয়োজন প্রতিদিনকার অসুবিধের ভিতর দিয়ে অনুভূত হ'তে থাকলো।

১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ ইষ্টারের ছুটিতে সাহিত্য-পরিষদের পাঁচজন সভ্য—চারুচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও নগেন্দ্রনাথ বসু গেলেন কাশিমবাজারে, কাশিমবাজারের বিদ্যোৎসাহী বদান্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের জন্য ভূমি প্রার্থনা করলেন আর মহারাজ রাজী হলেন পাঁচ কাঠা ভূমি দিতে হালসীবাগানে আপার সার্কুলার রোডের উপর। পরে তাঁর কলকাতা অবস্থানকালে আরো দু' কাঠা বাড়িয়ে সেটাকে সাত কাঠা করে দেন। দলিল লেখাপড়া হ'ল ২০শে আগষ্ট, ১৯০১ সাল। ন্যাসরক্ষক বা ট্রাষ্টি নির্বাচিত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, সন্তোষের প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, টাকির রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই পাঁচজন ট্রাষ্টির অনুকূলে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী হালসীবাগান ও আপার সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জন্যে ৭৩ ফুট দীর্ঘ ও ৬৪ ফুট বিস্তৃত জমির ন্যাসপত্র লিখে রেজিষ্টারী করে দিলেন ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (২০শে আগষ্ট, ১৯০১)।

সাতাশ হাজার টাকা ব্যয়ে সার্কুলার রোডের উপর পরিষদ মন্দির নির্মিত হ'ল। দ্বিতল নির্মাণের সমগ্র ব্যয় ১০,০৫৮৲ টাকা বহন করলেন লালগোলার

রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, মুর্শিদাবাদের রায় শ্রীনাথ পাল দিলেন ২৫০০ বর্গ ফুট মূল্যবান মার্বেল আর সাহিত্যিকদের মূর্তি বসানোর বেদী নির্মাণের জন্তে ১০০ ফুট উৎকৃষ্ট মর্মর দিলেন প্রফুল্লনাথ ঠাকুর। দেশবাসী আরো অনেকের বদান্যতায় এই বিরাট পরিষদ-মন্দির-নির্মাণকার্য সেদিন সম্ভব হয়েছিল (সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৬ পৃঃ ১০২-৩)।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৯শে অগ্রহায়ণ ভাড়াটে বাড়ী থেকে পরিষদের কার্যালয় নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হ'ল আর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হ'ল তার দু' দিন পরে, ২১শে অগ্রহায়ণ। সে বিরাট উৎসবে বক্তৃতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও বাংলা দেশের আরো আরো সুধিবৃন্দ। সেদিন বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"নব বঙ্গসাহিত্য অদ্য প্রায় একশত বৎসর হইল জন্মলাভ করিয়াছে; আর একশত বৎসর পরে যদি এই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সভার শততম বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হয়, তবে সেই উৎসব সভায় যে সৌভাগ্যশালী বক্তা বঙ্গ-সাহিত্যের জয়গান করিতে দণ্ডায়মান হইবেন, তিনি আমাদের মত প্রমাণরিক্ত হস্তে কেবলমাত্র অন্তরের আশা এবং অনুরাগ, কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষার আবেগ লইয়া, কেবলমাত্র অপরিস্ফুট অনাগত গৌরবের সূচনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি প্রত্যূষের অকস্মাৎ জাগ্রত একক বিহঙ্গের অনিশ্চিত মৃদু কাকলির স্বরে সুর বাঁধিবেন না—তিনি স্ফূর্তির অরুণালোকে জাগ্রত বঙ্গ কাননে বিবিধ কণ্ঠের বিচিত্র কলগানের অধিনেতা হইয়া বর্তমানের উৎসাহে আনন্দধ্বনি উত্থিত করিয়া তুলিবেন এবং কোনকালে যে অমানিশীথের একাধিপত্য ছিল এবং অন্ধকার আমরা যে প্রদোষের অন্ধকারে ক্লান্তি এবং শান্তি, আশা এবং নৈরাশ্যের দ্বিধার মধ্যে সকরুণ দুর্বল কণ্ঠের গীততান সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম, সে কথা কাহারও মনে থাকিবে না।"

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি, আজ অর্ধশতাব্দী যেতে না যেতেই তাঁর সেদিনের কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রূপ সেদিনের অস্ফুট আলোকে তাঁর চোখে অতি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল, আজ আমরা সেটাই প্রত্যক্ষ করছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিচিত্র কর্মধারাকে এক কথায় বলা চলে, অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ-সাধন। তার অসংখ্য কর্মপন্থার বিশদ আলোচনা এখানে না করলেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে কতো বড় কাজ এর ভেতর দিয়ে হ'য়ে চলেছে।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র প্রাচীন সারগর্ভ পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হল, স্থাপিত হল পরিষদের পুঁথিশালা। পুঁথিশালায় সংগৃহীত হতে লাগল দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি-পাণ্ডুলিপি। বর্তমানে এই পুঁথিশালায় সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা সর্ব্বমোট ৫২৭৫, এগুলো এমন পুঁথি-পাণ্ডুলিপি, যা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এর ভেতর বাংলা, তিব্বতী, ওড়িয়া, হিন্দী, অসমীয়া, ফার্সী প্রভৃতি ভাষার পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্যিকগণের আলেখ্য, হস্তাক্ষর, চিঠিপত্র প্রভৃতি সংগ্রহ ও রক্ষণের প্রস্তাব আনলেন। বর্তমানে পরিষদ-মন্দিরে ৯টি প্রতিমূর্তি ও ১৩৫ খানি চিত্র রয়েছে। সাহিত্যরথিগণের এতো নিদর্শন এখানে রয়েছে যে, লণ্ডনের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবির পোয়েটস কর্ণারের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। সাহিত্যিকগণের এতো নিদর্শন বর্তমানে আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তার থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বাংলা ভাষা কোথা থেকে আরম্ভ করে কোন জায়গায় এসে পেঁছিল—এ হ'ল বাংলা ভাষার ক্রমপরিণতির ইতিহাস। তাতে রয়েছে পরিভাষা নির্মাণের চেষ্টা ও ভাষা বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থাবলী। এখানে মুদ্রিত হয়েছে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির শব্দকোষ সহ 'বাংলা ভাষা', আচার্য রায়ের রাসায়নিক পরিভাষা (১৩১৯) ব্রতকথা, ছেলে ভুলানো ছড়া, মেয়েলী ছড়া, পাঁচালী, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধাবলী, কিরণবালা দেবীর ব্রতকথা (১৩১৯), শব্দতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ও শব্দকথা—রামেন্দ্র সুন্দর, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, গ্রহগণিত, মনোবিজ্ঞান, লেখমালানুক্রমী, জ্যোতিষ দর্পণ, বেদান্ত উপনিষদ, ন্যায় দর্শন, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অসংখ্য গ্রন্থাবলী। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত

পরিশ্রম ও সাধনার ফলস্বরূপ আমরা পাচ্ছি উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের ইতিহাস। তাঁর সংবাদপত্র ও বঙ্গীয় নাট্য-শালার ইতিহাস দু'খানি, মূল্যবান তথ্যপূর্ণ রেফারেন্সের বই—গবেষণামূলক কার্যে এগুলোকে অপরিহার্য বলা চলে। এই বিভাগের বর্তমান কার্যকলাপের মধ্যে ঝাড়গ্রামের দান-তহবিল থেকে অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতকের কবি-সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী প্রকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এতে করে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভাষা ও সাহিত্যের সেতু রচনা করা হয়েছে, প্রকাশ করা হয়েছে ভারতচন্দ্র, রামমোহন, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও শরৎকুমারী চৌধুরাণীর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী আর রামেন্দ্রসুন্দর ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী।

লক্ষাধিক পুঁথি রয়েছে পরিষদ গ্রন্থাগারে। কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও চিন্তানায়কদের গদ্যে-পদ্যে লিপিবদ্ধ হাজার বছরের সাধনা এখানে জমা হয়ে আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এতো ভালো ও এতো বড় সংগ্রহ আর কোথাও নেই। বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র ও বিনয়কৃষ্ণ দেবের সমস্ত জীবনের গ্রন্থ-সংগ্রহ স্থান পেয়েছে পরিষদ গ্রন্থাগারে। পরিষদ পাঠাগারে পড়বার ও সমস্ত বিষয় জেনে নেবার রয়েছে সুবন্দোবস্ত। গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য গ্রন্থ গবেষণা-কার্যে সত্যি অপরিহার্য।

এদিকে সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে ১৩১৪ বঙ্গাব্দ থেকে সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে—এ হলো বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক মিলন-কেন্দ্র। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সর্ববিষয়ে অগ্রগতির হিসেব-নিকেশের একটা সুযোগ পাচ্ছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সংযোগ সূত্র গেঁথে চলেছে, ইতিহাস গড়ে চলেছে অতীতে-বর্তমানে। এর কাজ হ'ল পুরাতন ইতিহাসের ভিত্তিতে নূতনকে পথ দেখিয়ে দেওয়া, পুরাতন কর্মধারায় নূতনের কর্মস্রোতকে প্রবাহিত করা। যে উপাদান আমাদের অতীত ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে আমাদের ঘরে-বাহিরে, কবিতায় গানে, পুঁথিতে ছড়ায়, প্রবাদে কাহিনীতে, শিলালিপিতে আর তাম্র-শাসনেও—তারই সংগ্রহ আর রক্ষণাবেক্ষণ হ'ল সাহিত্য-পরিষদের কাজ।

গত ৫৮ বৎসর ধরে সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা চলছে, তাতে করে আমরা পাচ্ছি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সমস্ত গবেষণা—সমস্ত খবর। পুরাতন তাম্রশাসন, শিলালিপি, দলিল-দস্তাবেজ, মুদ্রা, মূর্ত্তি বিষয়ের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। পত্রিকাকে না জানলে আমরা আমাদের অতীতকেই জানতে পারিনে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বাঙালী জাতির অতীত থেকে বর্তমানের ইতিহাস, আর বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসও এখান থেকেই গড়া হবে।

[৬-১-৫২]

ইউনাইটেড রিডিং রুম

এই পাঠাগার নিজ বাটীতে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ও গৌর লাহা ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এর গোড়াপত্তন হয়েছিল আজ থেকে আশী বছর আগে ১৮৭২ সালে 'কলিকাতা রিডিং রুম' নামে। দেখা হ'ল লাইব্রেরীর আজীবন সদস্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার বসুর সঙ্গে, তাঁর বয়স বর্তমানে ৮২ বৎসর। একেবারে আরম্ভে না হোক, গোড়ার দিক থেকেই লাইব্রেরীর সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত। এ ছাড়া বর্তমান কর্ম-পরিষদের সদস্য ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ বসাকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁদের জবানীতে আর লাইব্রেরী রেজিষ্টারীর দলিল থেকে যে তথ্য পাওয়া গেল, তারি ওপর ভিত্তি ক'রে এ ইতিহাস লিখতে হয়েছে।

১৮৭২ সালে কলিকাতা রিডিং রুম স্থাপিত হয় আপার চিৎপুর রোড ও বিডন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে চিৎপুর রোডের উপর এক ভাড়াটে বাড়ীতে। উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'র সেক্রেটারী বেচারাম চ্যাটার্জী, ডব্লু সি ব্যানার্জী, রাজেন্দ্র মিশির, মহারাজ যদুমোহন ঠাকুর প্রভৃতি গণমান্য ব্যক্তিবৃন্দ। এর থেকেই বোঝা যায়, কলিকাতা রিডিং রুম ভালোভাবেই আরম্ভ হয়েছিল। প্রথম দিকে লাইব্রেরীর দ্রুত উন্নতি হ'তে থাকে। বছর দশেক লাইব্রেরী খুব ভালোভাবে চলবার পর সম্ভবতঃ পরিচালকদের দোষে লাইব্রেরীতে ভাঙ্গন ধরে ও ক্রমে কার্যকলাপ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেচারাম চ্যাটার্জী 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'র দুখানা কোঠায় লাইব্রেরীর বইপত্র বন্ধ ক'রে ফেলে রাখেন। কিছুদিন লাইব্রেরী বন্ধ থাকে। সেই সময় ভূপেন্দ্রকুমার বসু, নগেন্দ্রনাথ সরকার, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পাড়ার যুবকবৃন্দ বেচারাম চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের চেষ্টায় কলিকাতা রিডিং রুম-এর কাজ আবার চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে নিজেদের ভেতর মতানৈক্য দেখা দেয়, ফলে পাড়ার যুবকেরা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৯০ সালে নারায়ণকিষেণ সেন, অমৃতলাল

চন্দ্র প্রমুখ পাড়ার যুবকেরা গোপীকৃষ্ণ পাল লেনে 'আহিরীটোলা রিডিং রুম' নামে আরেকটি গ্রন্থাগারের করলেন প্রতিষ্ঠা। আহিরীটোলা রিডিং রুম দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠে ও ১৯০১ সাল পর্যন্ত দুটো লাইব্রেরীই অনেকটা প্রতিযোগী ভাব নিয়ে পাশাপাশি চলতে থাকে। মনোভাবের দিক থেকে না দেখে লাইব্রেরীর উন্নতির দিক থেকে বিচার করলেও এই দ্বিধাবিভক্ত কার্য-কলাপের চেয়ে যুক্ত কর্ম-প্রচেষ্টায় সাফল্যের কথা পাড়ার অনেকেই তখন ভাবতে সুরু করেছেন। এ ব্যাপারে বিশেষ ক'রে ভুপেন্দ্রকুমার বসু এবং আরো অনেকে উদ্যোগী হ'লেন। ১৯০১ সালে 'কলিকাতা রিডিং রুম' ও 'আহিরী-টোলা রিডিং রুম' যুক্ত হয়ে নাম নিলে "ইউনাইটেড রিডিং রুম"। তখন থেকে ইউনাইটেড রিডিং রুম-এর কাজ চলতে লাগলো ২১এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ীতে। বর্তমান বাড়ীর ঠিক মুখোমুখী গৌর লাহা ষ্ট্রীটের ওপারে সে বাড়ী অবস্থিত ছিল। এর পর 'ইউনাইটেড রিডিং রুম' নামেই লাইব্রেরী রেজিষ্টারী করা হ'ল।

লাইব্রেরীর ১৯০১ সালের কর্ম-পরিষদের দিকে তাকালেই ইউনাইটেড রিডিং রুম-এর গুরুত্ব কিছুটা বোঝা যাবে। সভাপতি ছিলেন মাননীয় সি ডব্লু বল্টন, সি-এস-সি-এস-আই, সহঃ সভাপতি কুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, চেয়ারম্যান নারায়ণকিষেণ সেন, সেক্রেটারী মুকুন্দলাল কুণ্ডু ও বিপিনবিহারী ধর, লাইব্রেরীয়ান ভুপেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি, আর পৃষ্ঠপোষকদের ভেতর ছিলেন মাননীয় সার জন উডবার্ণ (বাংলার গভর্ণর), মাননীয় সার চার্লস এম রিভাজ (পাঞ্জাবের গভর্ণর), মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কুমার রাধাপ্রসাদ রায় (পোস্তা), কুমার মন্মথ মিত্র প্রভৃতি। অতীতের ইউনাইটেড রিডিং রুমের ইতিহাস সত্যি গৌরবময় ছিল।

লাইব্রেরীর কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব বাড়ীর অভাব অনুভূত হ'তে থাকে। ফলে প্রায় তিন কাঠা জমি কিনে তার ওপর লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ী নির্মিত হয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ বদান্যতায়। প্রথমে একতলা বাড়ী নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে (১০ বছরের মধ্যে) অমৃতলাল চন্দ্রের চেষ্টায় দোতালা নির্মিত হয়। বর্তমান কর্তৃপক্ষ তিনতলা নির্মাণের চেষ্টায় আছেন। লাইব্রেরীর কার্যকলাপ ছাড়া একতলার কিছুটা অংশ বর্তমানে ভাড়া খাটছে।

বই লেন-দেন ছাড়া বর্তমানে লাইব্রেরীতে 'শহীদ-দিবস' 'রবীন্দ্র জয়ন্তী', 'নেতাজী-জন্মোৎসব' প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়ে থাকে।

ইউনাইটেড রিডিং রুম-এর আজীবন সদস্যপদ বর্তমানে তুলে দেওয়া হচ্ছে, মাত্র দশ বার জন পুরাতন আজীবন সদস্য বর্ত্তমানে আছেন। সাধারণ সদস্যদের ভেতর তিনটি শ্রেণী—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা যথাক্রমে ৪ খানা, ২ খানা, ও একখানা বই একসঙ্গে নিতে পারেন। এর প্রথম শ্রেণীও কর্তৃপক্ষের তুলে দিবারই ইচ্ছা, বর্ত্তমানে পাঁচ ছয় জনের বেশী এই শ্রেণীর সভ্য নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমা ৮৲ টাকা ও মাসিক চাঁদা ৸০ আনা আর তৃতীয় শ্রেণীর জমা ৫৲ টাকা ও মাসিক চাদা ।৵০ আনা করে। শেষ পর্যন্ত এই দুটো শ্রেণীই মাত্র থাকবে। বর্তমানে লাইব্রেরীর কর্ম-পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীঅমৃতলাল চন্দ্র ও শ্রীধনীন্দ্র মুখার্জী আর শ্রীকেশবলাল ভট্টাচার্য হচ্ছেন লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান।

লাইব্রেরী-গৃহের নীচের তলায় একটি কোঠায় পাঠাগার। পাঠাগারে সর্বসাধারণের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা আছে। অনেকগুলো ইংরেজী-বাংলা দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা পাঠাগারে রাখা হয়। ইউনাইটেড রিডিং রুম-এর বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ২৫,০০০ হাজার। এই লাইব্রেরীর ইংরেজী বইএর সংগ্রহ খুব ভালো আর বাংলার চেয়ে ইংরেজী বই-এর সংখ্যাই অধিক। ভ্রমণ ও সমুদ্র-যাত্রা বিষয়ক অসংখ্য বই এখানে রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের এমন মূল্যবান পুস্তক-সংগ্রহ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। দুষ্প্রাপ্য বই-এর ভেতর রয়েছে (১) টি এইচ গ্রিফিথের বাল্মীকি রামায়ণের ইংরেজী পদ্যানুবাদ ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ, (২) জনসনের 'রেমব্রার এণ্ড আইডলার' প্রভৃতি, (৩) মেলভনের 'শেকসপীয়ার', (৪) ডেভিড হুম-এর 'এচেইজ', (৫) কাউন্ট টলষ্টয়ের 'দি ফিজিওলজি অব ওয়ার' 'পাওয়ার এণ্ড লিবার্টি, (৬) ও' ডায়ারের 'ইণ্ডিয়া এজ আই নো ইট', (৭) ম্যাকম্যানের 'মার্শিয়েল রেইসেজ অব ইণ্ডিয়া', (৮) জন বিল-এর 'হিষ্টরি অব দি ওয়াল্ডস প্রোগ্রেস', (৯) সি রবার্টস-এর 'হোয়াট ইণ্ডিয়া থিঙ্কস', (১০) ইস্রায়েল স্মিথ কেয়ারের 'আনরাই-ভেলড হিষ্টরি অব দি ওয়াল্ড' ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ, (১১) ক্রি ম্যানের 'হিষ্টরিকেল এচেইজ, (১২) রাধাকুমুদ মুখার্জীর 'হিন্দু সিভিলাইজেশন', (১৩) ওয়াটের (সার

প্রতিষ্ঠা করলেন। আনন্দমোহন বসু হ'লেন প্রথম সম্পাদক আর সেই প্রতিষ্ঠা দিনেই এর সভ্য হ'লেন সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, মনোমোহন ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, অক্ষয়কুমার সরকার, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মহেশচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ বাংলা দেশের প্রখ্যাতনামা বরেণ্য ব্যক্তিবৃন্দ। সত্তর জন থেকে আরম্ভ করে এসোসিয়েশনের সভ্য-সংখ্যা আজ ছয়শতের ওপর উঠেছে। বিদেশী শাসনের চক্রপিষ্টে অবদমিত জনগণের দাবী নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করেছে এসোসিয়েশন সেদিন আর আজো দেশবাসীর সর্ববিধ উন্নতির জন্য এর কাজ চলছে অবিরাম। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের আর জাতীয় উন্নতির মূলে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অবদান অপর্যাপ্ত।

১৮৭৯ সালে এসোসিয়েশন ভারতে প্রতিনিধিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের আরম্ভ হয়। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮৩ ও ৮৪ সালে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন ও বক্তৃতা করেন। সমস্ত ভারতের প্রতিনিধিদের নিয়ে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আহ্বানে ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন বসে কলকাতায় এলবার্ট হলে। জাতীয় আন্দোলনের ইহাই সূত্রপাত। তারপর ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৮৮৫ সালে কলকাতায়। এবার এসোসিয়েশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমবেত চেষ্টায় অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেন। এটা হল ভারতের জাতীয় পার্লামেন্টের আরম্ভ—এই ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন আনন্দমোহন বসু কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন চলতে লাগলো। তাতে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছে এসোসিয়েশন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনে এসোসিয়েশন সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছে। এক কথায় বিদেশী শাসনের অত্যাচার-উৎপীড়ন আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ন্যায্য প্রতিবাদ বার বার ধ্বনিত হয়েছে এসোসিয়েশনের মাধ্যমে, এমন কি বিলেতে পার্লামেন্টে লালমোহন ঘোষকে পর্যন্ত পাঠানো হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্মধারা বহু ব্যাপক।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে এসোসিয়েশনের নাম জড়িত রয়েছে ওতপ্রোতভাবে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হবার পর ১৯১২ সাল থেকে পরবর্তী আট বৎসর বিহার ও আসামের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল যাতে আবার বাংলা দেশে আসতে পারে সেজন্য এসোসিয়েশন আন্দোলন চালাতে থাকে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মে কিছু ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে এলেও মোটের ওপর দেশবাসীর কোন লাভই হল না। ১৯২৫ সালে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে এসোসিয়েশনের যে ক্ষতি হল তাহা আর পূরণ হবার নয়। কিছুদিন এসোসিয়েশনের কাজ অত্যন্ত মন্থরগতিতে চলতে লাগলো। ১৯৪৩ সাল থেকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কাজ আবার পূর্ণোদ্যমে চলছে বলা চলে। সেই থেকে বাংলা দেশের ও সর্বভারতীয় সমস্ত সমস্যার সমাধানে এসো-সিয়েশন সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়েও বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহকে বাংলা দেশের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্যে এসোসিয়েশনের অবিরাম চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে তার নিজস্ব বিরাট ভবনে রয়েছে। এখানেই কিন্তু চিরদিন এসোসিয়েশন ছিল না। এ বাড়ীর দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব হয় ১৯১৫ সালের ৮ই এপ্রিল বিকাল ছ'টায় আর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন এসোসিয়েশনের তখনকার সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার। অম্বিকাচরণ তাঁর সেদিনের বক্তৃতায় বলেছিলেন, "চল্লিশ বছর আগে কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণে যে ছোট অন্ধকার কোঠায় একদিন এই এসোসিয়েশন জন্ম নিয়েছিল, আজ আর তাকে খুঁজে বের করা যাবে না।" সত্যি তাই। এসোসিয়েশন প্রথমে ছিল ২২নং মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে—এইটুকু জানা যায়, এর বেশী আজ আর বের করবার উপায় নেই। সম্ভবতঃ সেটা ছিল প্রথম সেক্রেটারী ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বসুর বাড়ীতে—বর্তমানে যেখানে সিটি কলেজ রয়েছে তারি ভেতর কোন এক স্থানে। সেখান থেকে ৩৪নং কলেজ ষ্ট্রীটে এসোসিয়েশন উঠে যায়, সেটা বর্তমান মেডিকেল কলেজ কম্পাউণ্ডের ভেতর পড়েছে। বর্তমানে যেখানে এসোসিয়েশন রয়েছে, একতলা বাড়ী সহ এ জায়গাটা কিনে নিয়ে ১৯০৫ সালে এসোসিয়েশন সেই একতলা বাড়ীতে

চলে আসে। তারপর নূতন বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯১৩ সালে। ইঞ্জিনীয়ার সি কে সরকার সি-ই'র পরিকল্পনানুযায়ী বর্তমান এসোসিয়েশনের নূতন বাড়ী তৈরী সম্পন্ন হয় ১৯১৫ সালে, তাতে খরচ পড়ে সর্বমোট ৪৮০০০৲ টাকা। ১৯১৫ সালের ৮ই এপ্রিল নূতন এসোসিয়েশন-গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবে সুরেন্দ্রনাথের স্মরণীয় বক্তৃতার কথা কোনদিন লোকে ভুলতে পারবে না।

এসোসিয়েশনে প্রদত্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থ সংগ্রহের নাম গোখেল লাইব্রেরী। এ ছাড়া এসোসিয়েশন লাইব্রেরীতে বর্তমানে সর্বমোট বই রয়েছে সাত হাজারেরও ওপর। এই লাইব্রেরীকে বিশেষভাবে গবেষণা গ্রন্থাগার বলা যেতে পারে। এখানে রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান-বিদ্যা (ষ্টাটিষ্টিকস্) ও ইতিহাসের মূল্যবান গ্রন্থসমূহ সযত্নে রক্ষিত হয়েছে, আর সমস্ত বিষয়ে গবেষণাকার্যের জন্য এ লাইব্রেরী সত্যি অপরিহার্য। এছাড়া শিল্প, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ের মূল্যবান বহু গ্রন্থও এখানে আছে। এই লাইব্রেরীর পুরানো গেজেটিয়াস´ ও সরকারী দলিল প্রভৃতির সংগ্রহও বিশেষ মূল্যবান। পুরাতন বেঙ্গলী (১৮৮০) ও ইণ্ডিয়ান পত্রিকার অনেক কপি এখানে সযত্নে রক্ষিত হয়ে আসছে। এসোসিয়েশনের পাঠাগারে সাধারণের পত্র-পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা আছে, তবে পাঠাগারে বসে গবেষণা করতে হলে এসো-সিয়েশনের অনুমতি নিতে হয়। পাঠাগারে দৈনিক ও সাময়িক প্রায় সমস্ত পত্রিকাই রাখা হয়ে থাকে।

এসোসিয়েশনের অনারারী সদস্য, আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্য—এই তিন শ্রেণীর সভ্য রয়েছেন। আজীবন সদস্যকে কমপক্ষে একশত টাকা চাঁদা দিতে হয়। এ ছাড়া এসোসিয়েশনের সাধারণ সভ্যের চাঁদা বার্ষিক পাঁচ টাকা। কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্মতি নিয়ে তবে এসোসিয়েশনের সভ্য হতে পারা যায়। বর্তমানে এসোসিয়েশনের সভ্য-সংখ্যা ছয়শত।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি শ্রীসতীনাথ রায়, সহ-সভাপতি শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী, বর্তমান সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার আর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান শ্রীহেমরঞ্জন বসু।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রথম থেকেই সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যাপক-

কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল, আজো তা সেই একই আদর্শ অনুসরণ করে চলেছে। এসোসিয়েশনের গৌরবময় অতীত ভারতের জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে আর ভবিষ্যৎ ভারতের যে সোনার স্বপ্ন আমরা আজ দেখছি তার সার্থক রূপদানে এসোসিয়েশনের কর্মপন্থা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে, এ আশাই আমরা করছি। অতীত যার মহান, ভবিষ্যৎ তার মহত্তর হবেই।

[৬-৭-৫২]

তালতলা পাব্লিক লাইব্রেরী

প্রত্যেক জিনিষেরই জোয়ার-ভাটা আছে, জাতির জীবনেও এ কথা খাটে। জোয়ার যখন আসে তখন সবদিক থেকেই আসে, বন্যাবেগে দিগ্বিদিক প্লাবিত করে ছুটে চলে। তেমনি একদিন জোয়ার এসেছিল বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে, উনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে শেষ অর্ধশতকে। কি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, কি শিক্ষায়-দীক্ষায়, কি সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে দেশকে একেবারে ভাসিয়ে—নিয়ে গিয়েছিল। বাঙ্গালা দেশের এ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস শুধু যে আমাদের চোখের ওপর বিস্ময়ের মতো জেগে ওঠে তা নয়, সমস্ত বিশ্ব এ সময়ের বাঙ্গালা দেশের দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে দেখে। এ সময়ের সূচনাই আজিকার সার্থক স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতি জীবনে এমন শুভলগ্ন আর আসেনি। সে সময়ের লোকদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, সে কি চেষ্টা তাদের। প্রত্যেক লোক যেন একটা আদর্শের পেছনে ছুটছে, মাথায় সকলের এক চিন্তা—যে করেই হোক নিজেকে বড় করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে বড় করে নিজের জাতটাকে। আত্ম-প্রতিষ্ঠার সে কি সাধনার রূপ! আজিকার আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরবদীপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সব কটারই আরম্ভ হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর কোন এক পুণ্যদিনে।

উত্তর-মধ্য কলকাতায় বর্তমানে যতোগুলো সাধারণ পাঠাগার ও গ্রন্থাগার আছে তালতলা লাইব্রেরীকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন বলা চলে। প্রায় সমসাময়িক সাধারণ গ্রন্থাগার আরো আছে, এর আগেও দু'চারটা যে না হয়েছিল এমনও নয়, কিন্তু আগেরগুলো হয় অন্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেছে নয় আজ আর নেই। তখন গ্রন্থাগার স্থাপনের একটা ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল মাত্র। সূচনার ইতিহাসে সম্ভাবনার বেশীর ভাগেরই অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যু হয়ে থাকে, আর তারি সমাধির ওপর সেই সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে অমরতায়। বহুর আত্মোৎসর্গের বিনিময়েই তবে গড়ে ওঠে এক

একটা সার্থক স্বপ্নের ইতিহাস। তালতলা লাইব্রেরীর ইতিহাস তেমনি একটা সার্থক স্বপ্নের ইতিহাস। ১৮৮১ সালে সেটার সূচনা, আর প্রথম আনুষ্ঠানিক-ভাবে তার প্রতিষ্ঠা ১৮৮২ সালের একেবারে গোড়ার দিকে বাণীপূজার পুণ্যতিথিতে।

প্রথম একটা সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের কথা তালতলা পল্লীর তরুণদের মাথায় আসে। তাদের ভেতর ছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকুলচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যচরণ রায়, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলমণি রায় প্রভৃতি অনেকেই। প্রত্যেকে নিজেদের বাড়ী থেকে বই সংগ্রহ করে এনে ছোট রকমের একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন করলেন। পাড়ার অভিভাবক শ্রেণী গোড়া থেকেই এটাকে ছেলেদের 'ছেলেমানুষী' বলে স্নেহের চক্ষে দেখতে থাকেন। ক্রমে ছেলেদের উৎসাহ তাঁদের ভেতরেও সংক্রামিত হতে থাকে। আর শেষটায় ছেলেদের এ প্রচেষ্টাকে একটা সুষ্ঠু রূপ দিতে পাড়ার অভিভাবকরাও এগিয়ে আসেন। ফলে পূর্ণাবয়ব গ্রন্থাগার স্থাপনের আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এসে যোগ দিলেন সর্দার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সরকার, মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, ব্রজমোহন ঘোষ, গঙ্গানারায়ণ পাল, মহামহোপাধ্যায় নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনকড়ি রায়, ডাঃ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ পল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ১৮৮২ সালে ৩/১, নিয়োগীপুকুর ওয়েষ্ট লেনে এক জনসভা আহূত হল। সেই সভায় পাঠাগারের নামকরণ হল 'তালতলা পাব্লিক লাইব্রেরী'। লাইব্রেরীর প্রথম সভাপতি হলেন সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সম্পাদক হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ আজীবন লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন। তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় বিনা ভাড়ায় লাইব্রেরীকে তাঁর বাড়ীর একখানা ঘর ছেড়ে দেন ও সেখানে লাইব্রেরীর কাজ চলতে থাকে। ১৮৮৯ সালে তাঁর ভাগিনেয় লাইব্রেরীর সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর পর লাইব্রেরীর সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর অর্পিত হয় ও তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় লাইব্রেরীর কাজ চলতে থাকে।

গোড়ার দিকে লাইব্রেরীর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। সে সময়ে

লাইব্রেরীকে পুস্তকাদি দান করে আর সংগ্রহ করে দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, এফ, এম আব্দার রহমান, সরোজবাসিনী দেবী প্রভৃতি অনেকেই। হিতবাদী ও বসুমতীর কর্মাধ্যক্ষগণ লাইব্রেরীকে বিনামূল্যে পত্রিকা দুটি দিয়ে সাহায্য করেছেন। ১৮৮৮ সালে অযোধ্যার রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র দানবীর ভুবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তালতলা পল্লীতে বাস করতে আসেন। পাঁচ ছয় বৎসর তিনি এখানে ছিলেন। সে সময় তিনি প্রায়ই লাইব্রেরীতে আসতেন আর অর্থ, আসবাবপত্র ও বই দিয়ে লাইব্রেরীকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এরূপে অনেকের সাহায্যপুষ্ট দানে দিনে দিনে লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। অবশ্য লাইব্রেরীর কর্মাধ্যক্ষগণের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তালতলা লাইব্রেরীর সঙ্গে মহাকালী পাঠশালার নাম জড়িয়ে আছে। ১৮৯৪ সালে যুক্ত প্রদেশ থেকে স্বনামধন্যা মাতাজী কলিকাতায় এসে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে মনোযোগী হন। তাঁরি আদর্শে আর লাইব্রেরীর পরিচালকবর্গের সহযোগিতায় তালতলায় মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত হয়। ফলে লাইব্রেরী উঠে আসে শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জীউর দেবোত্তর সম্পত্তির ওপর, বর্ত্তমানে লাইব্রেরী যেখানে আছে তার দক্ষিণাংশে। পাশাপাশি লাইব্রেরী ও মহাকালী পাঠশালা লাইব্রেরী পরিচালকদের পরিচালনাধীনে চলতে থাকে। এমনি বারো তেরো বছর চলবার পর পাঠশালা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় এখানে 'প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়ন' নামে একটি সাহিত্য-সঙ্ঘও স্থাপিত হয়েছিল আর লাইব্রেরী পরিণত হয়েছিল সহরের এক বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে।

বর্ত্তমানে যেখানে লাইব্রেরী গৃহের অবস্থিতি (১২ বি, নিয়োগীপুকুর লেন), সেটাও আসলে ৺রাধাকান্ত জীউর দেবোত্তর সম্পত্তিরই একটা অংশ ছিল। দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত নরেন্দ্রনাথ কুমারের কাছ থেকে বার্ষিক এক টাকা খাজনায় লাইব্রেরীর পাকা বাড়ী নির্মাণের জন্যে এ জায়গা বন্দোবস্ত নেওয়া হয়। তারপর ওই বন্দোবস্তী জায়গার ওপর লাইব্রেরীর বর্তমান গৃহ নির্মিত হয় তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, পরাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির চেষ্টায় আর সার গুরু-

দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ও বার লাইব্রেরীর আইনজীবিগণের অর্থানুকূল্যে। ভুবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই লাইব্রেরীর এই একতলা পাকা বাড়ী নির্মাণের জন্য আশাতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করেছেন। দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড নিবাসী তিন ভ্রাতা উমাচরণ সাহা, অভয়চরণ সাহা ও পাঁচুকালী সাহা ৬৬২০৲ টাকায় পাঠাগার যে ভূমির ওপর অবস্থিত সেটা কিনে লাইব্রেরীকে দান করেছেন। তাঁদের পিতার নামে নীচের হলঘরের নাম রাখা হয়েছে ভুবনমোহন সাহা হল। ১৯০১ সাল থেকে লাইব্রেরী কলিকাতা কর্পোরেশন থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে আসছে। বর্তমানে কর্পোরেশন সাধারণ বিভাগে পাঁচশত টাকা ও বালক বিভাগে ৪০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করে চলেছেন।

এই বালক বিভাগের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৩২ সালে, তখনকার কর্ম-সচিব শ্রীপূর্ণচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের চেষ্টায়। বর্তমানে এই বিভাগের পনের শত শিশুপাঠ্য পুস্তক রয়েছে। তাছাড়া এ বিভাগে শিশুসাথী, মৌচাক, শুকতারা ব্যায়াম, পাঠশালা, রামধনু প্রভৃতি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা রাখা হয়। এ বিভাগের জমা এক টাকা ও চাঁদা দুই আনা মাত্র। ব্যাপক কার্যক্রম অনুসরণের পক্ষে বর্তমান লাইব্রেরী গৃহে একান্তই স্থানাভাব।

১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ১৯শে কার্তিক (ইং ৫ই নভেম্বর ১৯৫০) পাঠাগারের সভ্যগণ এক বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে মিলিত হন। সেই অধিবেশনে বিধাদেন্দু বিশ্বাস, ডাঃ অমূল্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পাঁচুকালী সাহা ও শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় এই পাঁচজন সভ্যকে নিয়ে এক অছি কমিটি বা 'বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ' গঠিত হয়। তাঁরা পাঠাগার গৃহ, গৃহ নির্মান তহবিল ও মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার এ কয়টি সম্পত্তির ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। আশা করা যায় তাদের চেষ্টায় দোতলা বাড়ী নির্মাণ-কার্য শীঘ্রই সম্ভব হয়ে উঠবে।

সুসাহিত্যিকদের পাঠাগারে নিমন্ত্রণ করে এনে ১৯২৯ সাল থেকে সারস্বত সম্মিলনীর সৃষ্টি করা হয়। প্রথমে ছিল এটা একদিনের ব্যাপার। ১৯৩৩ সালে এটাকে বৃহত্তর আকার দেওয়া হয় 'কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনী' নামে। বড়দিনের ছুটিতে এর চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠান হত কুমারসিং হলে, সমবেত হতেন

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকেরা। যুদ্ধের সময় এ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের ২৬শে থেকে ২৯শে মার্চ লাইব্রেরীর হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এটাকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছিল, কিন্তু অর্থাভাবের দরুণ তারপর আবার তা বন্ধ হয়ে গেছে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আর রবীন্দ্র জন্মোৎসবকেই বর্তমানে লাইব্রেরীর প্রধান সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে।

লাইব্রেরীর আজীবন সভ্যের চাঁদা কম পক্ষে পঞ্চাশ টাকা আর সাধারণ সভ্যকে দু'টাকা প্রবেশ মূল্য, চার টাকা জমা আর আট আনা করে মাসিক চাঁদা দিতে হয়। পাঠাগারে ইংরেজী-বাংলা প্রধান সমস্ত পত্রিকা ও সাময়িক পত্রই রাখা হয় আর লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা বর্তমানে পনের হাজারেরও কিছু বেশী। লাইব্রেরীতে ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকের চমৎকার সংগ্রহ রয়েছে। রেফারেন্সের বই-এর সংখ্যা তিন শতাধিক, আর বাঁধানো প্রাচীন মাসিকের সংখ্যা যাটখানারও বেশী, এর ভেতর বেশীর ভাগই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। এক কথায় তালতলা লাইব্রেরী প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার তো বটেই আর শিক্ষার্থীর কাছে এটা পরম তীর্থ বলেই গণ্য হয়ে আসছে আজ সত্তর বছর। লাইব্রেরীর বইগুলো দেখলে সাহিত্য রসিক মাত্রেই খুসী হয়ে উঠবেন, নিঃসন্দেহে এ কথা বলা চলে।

তালতলা লাইব্রেরীতে আরেকটা প্রচলিত নিয়ম রয়েছে। জমার টাকা থেকে বই-এর দাম বেশী হলে হলে সে টাকা জমা দিয়ে বই নিয়ে যেতে হয়, বই ফেরৎ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য এ টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়। তালতলা লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি হচ্ছেন শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আর শ্রীঅপূর্বকুমার মুখোপাধ্যায় হচ্ছেন বর্তমান লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান।

[২৮-৪-৫২]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী গ্রন্থাগার

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর ঐকান্তিক যত্নে ও চেষ্টায় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর আরম্ভ হয়। সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল যুগাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্তিত বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচার ও প্রসার। এর উদ্যোক্তাদের ভেতর হাওড়ার বিখ্যাত ব্যবহারজীবী পরেশনাথ দত্ত, কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, এষ্টেটের তখনকার পরিদর্শক বামাচরণ বসু. অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, বৈষ্ণবাচার্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাশয় ব্যক্তিগণ ছিলেন। নয়টি উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মিলনী স্থাপিত হয়। তার ভেতর "বৈষ্ণবধর্মের সাধারণ গ্রন্থাগার, পাঠাগার, বিদ্যালয় ও উপদেশ স্থান স্থাপন" (৫) অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

সম্মিলনী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলনীর নিজস্ব গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগলো। এর জন্যে এণ্টনীবাগানের তিনকড়ি নন্দী সর্বপ্রথম ১০০১৲ টাকা সম্মিলনীকে দান করেন। তারপর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এ উদ্দেশ্যে দিলেন ১২০০১৲ টাকা। সম্মিলনীর গৃহ-নির্মাণের জন্য এবার জমি কেনা হল। কলকাতার একজন সাত্ত্বিক দাতা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) ১২০০০৲ হাজার টাকা দিলেন নাটমন্দির নির্মাণের জন্যে। তারপর আরো বহু দাতার অকুণ্ঠ বদান্যতায় সম্মিলনীর নিজস্ব গৃহ ও নাটমন্দির তৈরী হল। সাধারণ গ্রন্থাগার অবস্থিত সেই সম্মিলনী গৃহেরই একাংশে।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হয়। সম্মিলনীর প্রথম স্থায়ী সভাপতি প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর চিরজীবনের সঞ্চিত মূল্যবান গ্রন্থরাজি দিয়েই এ গ্রন্থাগারের প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর প্রভুপাদ ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী তাঁর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ সম্মিলনী গ্রন্থাগারে দান করেন। ক্রমে গ্রন্থাগার পুষ্ট হয়ে ওঠে হরিদাস নন্দী, গোকুলচন্দ্র লাহার সহধর্মিণী, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কুমার কার্তিকচন্দ্র মল্লিক, সাক্ষীগোপাল বড়াল,

কুমার মহেশচন্দ্র মল্লিক, কুমার নরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি বহু মহাশয় ব্যক্তির দেওয়া গ্রন্থসম্ভারে। শুধু বৈষ্ণবধর্মেরই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব ক'টি ধর্মের ও ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত ধর্মপুস্তকই এ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হতে থাকে ও দেখতে দেখতে ধর্মপুস্তক ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের সংখ্যা বেড়ে চলে। ক্রমে এর কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ে গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগে, আর 'গৌড়াঙ্গ সেবক' নামে ধর্ম সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা বেরুতে থাকে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় (১৩৩৪-৩৫)। পরবর্তীকালে গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের কার্যকলাপ ও পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর থেকে আবার পত্রিকা প্রকাশ ও গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগের কাজ আরম্ভ হবে। বহু দুষ্প্রাপ্য ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এখান থেকে।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সম্মিলনী গ্রন্থাগারে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৩৪০, ১৩ই ফাল্গুন), কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি (১৩৪১, ২৭শে শ্রাবণ), মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৩৪৩, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ) প্রমুখ মনীষিবৃন্দ এসেছেন ও এর গ্রন্থ সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। গ্রন্থাগারের সমস্ত কার্যকলাপ গ্রন্থাধ্যক্ষ ও সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষের নির্দেশানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সম্মিলনীর বর্তমান গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সোম ও সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীচন্দ্রনাথ মল্লিক। গ্রন্থাগারের বর্তমান সভ্য-সংখ্যা ৩৫০। প্রবেশিকা ১৲ টাকা ও মাসিক চাঁদার হার ৷৷০ আনা করে। দুষ্প্রাপ্য বই নিতে হলে সভ্যদের পাঁচ টাকা জমা রাখতে হয়। বিকাল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য পাঠাগার ও গ্রন্থাগার খোলা থাকে। পাঠাগারে বসে পুস্তকাদি পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

ধর্মসম্বন্ধীয়—বিশেষ করে বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থের এরূপ একত্র সমাবেশ অন্য কোথাও বড় একটা চোখে পড়ে না। সম্মিলনী গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা বর্তমানে চার হাজারের উপর। অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও হাতে লেখা পুঁথি এ গ্রন্থাগারে রয়েছে। হাতে লেখা পুঁথির ভেতর একাদশ শতাব্দীতে লেখা পুঁথিও আছে। সদস্যদের এককালীন দান, চাঁদা ও বৃত্তির আয় থেকেই সম্মিলনীর ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। সম্মিলনীর বর্তমান সভাপতি শ্রীচৈতন্যচরণ গোস্বামী, সহকারী সভাপতি পণ্ডিত শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ, সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদাস নন্দী ও শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী আর শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী সম্মিলনীর বর্তমান গ্রন্থাগারিক।

[৭-৭-৫৩]

বড়বাজার লাইব্রেরী

কলকাতার হিন্দী ভাষার সাহিত্যিকদের ভেতর সত্যিকারের জাগরণ আসে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে। সে সময় কলকাতায় একসঙ্গে অনেকগুলো মাসিক পত্রিকা বের হতে থাকে। পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদজী মিশ্র হিন্দী ভাষায় সুসাহিত্যিক। অনেক মাসিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আর তিনি নিজেও 'উচিত বক্তা' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পরিবারে সকলেই ভালো লিখতেও পারতেন। ফলে কলকাতার, বিশেষ করে বড়বাজার অঞ্চলের সাহিত্যিকেরা তাঁর বাড়ীতে এসে জড়ো হতেন। ছেলে-বেলা থেকেই তাঁর ভাইপো পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্রের সমাজসেবার ঝোঁক ছিল। এদিকে কলকাতায় সে সময় কোন হিন্দী লাইব্রেরী ছিল না। ফলে কেশবপ্রসাদজী মিশ্র বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে চেয়ে আনা বই দিয়ে লাইব্রেরী স্থাপনে উদ্যোগী হন ও পণ্ডিত গোবিন্দনারায়ণজী মিশ্র, ছোটুলালজী মিশ্র, দুর্গাপ্রসাদজী মিশ্র, জীবনানন্দজী মিশ্র, ডাঃ এস কে বর্মণ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বর্মণ এবং পণ্ডিত কালীপ্রসাদজী তিবারী প্রভৃতি সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতায় ১৯০০ সালের ২রা জানুয়ারী বড়বাজার লাইব্রেরী স্থাপন করেন। কেশব-প্রসাদজীরই অন্তরঙ্গ বন্ধু মুরলীধর গোয়েঙ্কা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। দেখতে দেখতে বড়বাজার লাইব্রেরী সামাজিক ও সাহিত্যিক কার্যকলাপের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠে। এ লাইব্রেরী প্রথমে কলকাতার ক্ষত্রী সমাজের ও পরে মাড়োয়ারী সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতা লাভ করে বেড়ে উঠেছে।

বড়বাজার লাইব্রেরীর প্রথম সভাপতি ছিলেন বাবু আর ডি মেহতা সি-আই-ই ও প্রথম সম্পাদক কেশবপ্রসাদজী মিশ্র। তারপর বড়বাজার লাইব্রেরীর সভাপতি হন বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র (১৯০৫—০৬)। ১৯২০ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরীর ধারাবাহিক কোন ইতিহাস পাবার উপায় নেই। পুরণো কাগজপত্র থেকে এটুকু জানা যায়, বহুদিন ধরে লাইব্রেরী সাহিত্যিক কার্য-

কলাপের কেন্দ্রভূমি ছিল এবং এর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় আর সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ থাকায় সব সময়েই লাইব্রেরীর আর্থিক অব্যবস্থা চলতে থাকে। এমন কি ঘরভাড়া দেবার সঙ্গতিটুকুও লাইব্রেরীর ছিল না। লাইব্রেরী প্রথমে ছিল কেশবপ্রসাদ মিশ্রের বাড়ীতে। ১৯০৮—০৯ সাল নাগাদ লাইব্রেরী মিসেস ধন্না বিবির বাড়ীতে ছিল। তারপর ১৯২০ সালে লাইব্রেরী ছিল মহাদেব প্রসাদ আহীরের বাড়ীতে ও এরপর কিছুদিন ছিল পপোট মলজী রাজদেবের বাড়ীতে। তারপর শেঠ ঘনশ্যামদাসজী বিড়লা তাঁর পিতার তৈরী ১০।১।১ সৈয়দশালী লেনস্থিন মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ বাড়ীর একধারে বিনা ভাড়ায় লাইব্রেরীকে থাকতে দেন। বর্তমানে লাইব্রেরী সেখানেই আছে। বড়বাজার লাইব্রেরী আসলে হিন্দী লাইব্রেরী হলেও কোন সাম্প্রদায়িক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সারদাচরণ মিত্র, মিঃ পি ই এস গ্রীয়ার, বাংলার গভর্ণর সার উডবার্ণ প্রভৃতি বাঙালীও ইংরেজ বহুদিন ধরে এ লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মাঝে কিছুদিন বাংলা, ইংরেজী, উর্দু প্রভৃতি ভাষার বই লাইব্রেরীতে রাখা হতো, বর্তমানে একমাত্র হিন্দী ভাষার বইই রাখা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর ছাত্র-জীবনে (১৯১১) বড়বাজার লাইব্রেরীর সদস্য ছিলেন ও লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে ডাঃ ভগবান দাসের সম্পাদকত্বে পরিচালিত ‘হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনী’র সভ্য ছিলেন।

১৯২৫ সালে বাবু নবলকিশোর হলবাসিয়ার (“ভারত মিত্র” পত্রিকার লিকুইডেটর) দেওয়া ১২০০৲ টাকায় লাইব্রেরীর “বালমুকুন্দ গুপ্ত (সম্পাদক, ভারত মিত্র) পারিতোষিক ফাণ্ড” গঠিত হয় ও প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, সমালোচনা প্রভৃতির প্রতিযোগিতার আয়োজন ক’রে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে এর থেকে প্রতি বৎসর পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করা হয়। কয়েক বৎসর খুব আড়ম্বরে এ প্রতি-যোগিতা চলবার পর নানা কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে সাড়ম্বর সরস্বতী পূজার আয়োজন চ’লে আসছে একেবারে লাইব্রেরীর আরম্ভ থেকে। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের মানপত্র প্রদান বর্তমানে বড়বাজার লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া লাইব্রেরীতে বর্তমানে মাঝে মাঝে সাহিত্য-সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বড়বাজার লাইব্রেরী

সদস্যদের চাঁদা, এককালীন দান ও কলকাতা কর্পোরেশনের ৪৭৫৲ টাকা বার্ষিক অর্থ সাহায্যে বড়বাজার লাইব্রেরীর বর্তমান ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর সদস্য-সংখ্যা বর্তমানে চারশত। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হিসেবে সভ্যদের মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১৲ ও ॥০ ক'রে আর বই নেবার যোগ্যতা একসঙ্গে দু'খানা ও একখানা। বই নেবার জন্য সদস্যদের কোন জমা দিতে হয় না। পাঠাগারে ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলা প্রসিদ্ধ দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। বই লেনদেন ও পত্র-পত্রিকা পাঠের জন্য লাইব্রেরী সকাল ৬টা থেকে ৯টা ও বিকাল ৫টা থেকে ৮॥টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বড়-বাজার লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক-সংখ্যা ১০,০০০ হাজার। অল্প সংখ্যক ইংরেজী ও বাংলা বই বাদে প্রায় সব বই-ই হিন্দী। বহু দুষ্প্রাপ্য হিন্দী পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি এ লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত আছে। হিন্দী বই-এর এমন সমৃদ্ধ লাইব্রেরী বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। অন্যত্র দুর্লভ 'গদর লেটার', 'পৃথ্বীরাজ রাসৌ' প্রভৃতি পুস্তক এখানে আছে। এ ছাড়া এখানে রয়েছে আলাদা করা ১০০০ হাজার বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থ। তবে বিশেষভাবে এ লাইব্রেরীকে 'হিন্দী লাইব্রেরী' বলা যেতে পারে।

বড়বাজার লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি শ্রীচম্পালালজী গুপ্ত, সম্পাদক শ্রীমহাবীর প্রসাদজী অগ্রবাল ও শ্রীকৃষ্ণদত্তজী শুক্ল এ লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান।

[২৩-৭-৫৩]

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী

লর্ড রিপন তখন বড়লাট, ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে এ-দেশস্থ ইংরেজরা জোর আন্দোলন চালাচ্ছে। কলকাতায় এ নিয়ে দেখা দিয়েছে প্রবল উত্তেজনা, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এর সঙ্গে যোগ রেখে চলেছেন, সংবাদপত্রে তীব্র বাদানুবাদ চলছে, উত্তর কলকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক তখন সংবাদপত্র পাঠের একটা কেন্দ্রের কথা ভাবতে থাকেন। সংবাদপত্র কিনে পড়বার সঙ্গতি অনেকেরই নেই, কিন্তু একটা পাঠ-কেন্দ্র বা 'ক্লাব' স্থাপন ক'রে চাঁদা তুলে সেখানে সকলেই সংবাদপত্র বা পুস্তকপাঠ ও আলাপ-আলোচনা করতে পারে। প্রথমে এই শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এ-নিয়ে বাদানুবাদ চলতে থাকে ৪২নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে বাবু কীর্তিচন্দ্র মিত্রের বাড়ীর বাহিরের বারান্দায় বসে। বর্তমানে সেখানে 'সরস্বতী ইনষ্টিটিউশন' রয়েছে। এই আলাপ-আলোচনার ফলে ১৮৮৩ সালের ৩রা জুন ১৮ নং আপার চিৎপুরে 'হিন্দু বয়েজ স্কুলে' স্থানীয় জনসাধারণ এক সভায় মিলিত হয়ে 'বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী' নামে এক পাঠকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ৬৫নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে বর্তমান ৩নং রাধামাধব গোস্বামী লেনে দোতলা ভাড়া ক'রে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়, ইংরেজী ১৮৮৩ সালের ১৬ই জুন। প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর উপেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জী, আশুতোষ ব্যানার্জী, (পরে রায়বাহাদুর) মহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, নীলকমল দাস প্রভৃতি ছিলেন। বাগবাজার রিডিং লাই-ব্রেরীর প্রথম সম্পাদক ছিলেন উপেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জী। গোড়ার দিকে এ লাই-ব্রেরীকে বহু সংবাদপত্রের মালিক বিনামূল্যে সংবাদপত্র দিয়ে আর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন, রঙ্গলাল ব্যানার্জী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ গ্রন্থকারগণ আপন আপন গ্রন্থাবলী উপহার দিয়ে সাহায্য করেন।

তখন লাইব্রেরীর সংখ্যা বেশী ছিল না আর উত্তর কলকাতায় জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের একটা চেতনা জেগে উঠেছিল। যে দু'একটা

লাইব্রেরী ছিল (যেমন, রাজা রাধাকান্তদেবের নিজস্ব লাইব্রেরী), সেগুলো ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরম-তীর্থ। ফলে এক বছর যেতে না যেতে সভ্য সংখ্যা বেড়ে উঠলো, আয় বাড়লো, বই-এর সংখ্যা হ'ল ৫৮৫ খানা, লাইব্রেরীর জন্য বড় ঘর দেখে নিতে হ'ল—এখানকার ছোট ঘরে আর কুলোয় না। ১৮৮৪ সালের ১৫ই মে লাইব্রেরী ৩নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে প্রশস্ত বারান্দা, হল ও ভেতরের ঘরযুক্ত দোতলায় স্থানান্তরিত হয়। এখানেই বাগবাজার রিডিং লাই-ব্রেরীর প্রথম বাৎসরিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। সে সভায় পৌরোহিত্য করেন রেভারেণ্ড ডাঃ কে, এম, ব্যানার্জী।

লাইব্রেরীর কার্যকলাপ আর সভ্য-সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে চললো যে, কিছুদিনের ভেতরই দেখা গেল ৩নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের প্রশস্ত গৃহেও আর চ'লছে না। স্পষ্ট বোঝা গেল, এবার লাইব্রেরীর জন্য নিজস্ব বড় বাড়ীর প্রয়োজন। এদিকে লাইব্রেরীর সম্পত্তি আইনসম্মত করবার জন্যে লাইব্রেরীকেও রেজিষ্টারী করে নিতে হয়। ১৮৯৬ সালের ৪ঠা অক্টোবর এক বিশেষ সাধারণ সভায় প্রস্তাব দুটি আলোচিত ও গৃহীত হ'ল। লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর জন্য পাশেই জমি কেনা হ'ল ২ হাজার টাকায়। ১৮৬০ সালের একুশ আইনে লাইব্রেরী ও লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর জন্য জমি কেনার দলিল রেজেষ্টারী করা হয় ১৮৯৬ সালের ৬ই নভেম্বর। এই জমির সীমানা নিয়ে রাসবিহারী ব্যানার্জীর সঙ্গে মামলা বাধে ও পরে ১৮৯৮ সলের নভেম্বর মাসে সেটা আপোষে নিষ্পত্তি হয়।

৩নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে লাইব্রেরীর কাজ চলতে থাকে। ইতিমধ্যে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, উপেন্দ্রনাথ সাউ, ঈশ্বরচন্দ্র হাজরা, যোগেন্দ্রনাথ ঘটক, বিশ্বম্ভর মিত্র, বিহারীলাল মিত্র, ক্ষেত্রমোহন মুখার্জী, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, দুর্গাদাস চ্যাটার্জী, রাসবিহারী ব্যানার্জী, আশুতোষ ব্যানার্জী প্রমুখ বহু ব্যক্তির মুক্তহস্ত-বদান্যতায় ১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ভূমিকম্পে লাইব্রেরী ঘরে বিপজ্জনক ফাটল দেখা দেয় আর ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টির জল পড়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ নষ্ট হয়ে যায়। তখনও নূতন বাড়ীর নির্মাণকার্য শেষ হয়নি। রায় বাহাদুর হরিবল্লভ বসু তাঁর ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ ভবনের

একাংশ বিনা ভাড়ায় লাইব্রেরীর জন্যে ছেড়ে দেন। এখান থেকে লাইব্রেরী ইংরেজী ১৯০১ সালের ১লা ডিসেম্বর ২৫।১ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট নিজস্ব নূতন বাড়ীতে চলে আসে। এই বাড়ীতে পঞ্চাশত্তম বৎসরে লাইব্রেরীর কনক-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল; কিন্তু বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর স্থানান্তরের ইতিহাস এখানেই শেষ হয়নি। পরবর্তীকালে এ বাড়ী কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আওতায় পড়ে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বাড়ী-জমি দখল করে নেয়। লাইব্রেরী উঠে আসে ২২নং লক্ষ্মী দত্ত লেনে ভাড়াটে বাড়ীতে। তারপর ২নং কে, সি, বোস ষ্ট্রীটে দোতলা বাড়ীর নির্মাণকার্য শেষ হ'লে বর্তমান নিজস্ব বাড়ীতে লাইব্রেরী স্থায়ীভাবে চ'লে আসে।

১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে কম্বুলেটোলা লাইব্রেরী এসে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর সংগে সংযুক্ত হয় আর এর দিন কয়েক পরে জোড়াসাঁকো লাইব্রেরীও এখানে উঠে আসে। ফলে লাইব্রেরীর কাজ আরও ব্যাপক হয়ে পড়ে।

১৯৩৩ সালের ১৬ই জুন মহাসমারোহে লাইব্রেরীর কনক-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়। এ সম্বন্ধে ১৯৩৩ সালের ১লা জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকায় যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল তার কিয়দংশ এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি :—

> "ছয় দিবসব্যাপী প্রোগ্রামের ভেতর দিয়ে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর কনক-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। দার্জিলিং থেকে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠিয়েছেন। ১৫ই জুন বৈকালিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছেন অনারেবল জজ মন্মথনাথ মুখার্জী। ১৬ই জুন প্রতিষ্ঠা দিবসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে অল্ডারম্যান জে, সি, গুপ্তের সভাপতিত্বে। ১৭ই জুন অতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে সাহিত্যসভার অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চ্যাটার্জী, আশীষ গুপ্ত, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ। ১৮ই জুন চতুর্থ দিবসে লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে রায় বাহাদুর আশুতোষ ব্যানার্জীকে মানপত্র দেওয়া হয়েছে 'তুলট' কাগজে ছেপে, বক্তৃতা দিয়েছেন সম্পাদক কিরণচন্দ্র দত্ত ও সভাপতি জে, এন, বসু। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কীর্তন-কলাসুধাকর দু'ঘণ্টাব্যাপী সুমধুর কীর্তনে সকলকে আপ্যায়িত করেছেন।

পঞ্চম দিন ১৯শে জুন লাইব্রেরী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে সার ডি, পি, সর্বাধিকারীর সভাপতিত্বে আর লাইব্রেরীর আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন কুমার মণীন্দ্র দেব রায় (বাঁশবেড়ে) ও সুশীলচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক, লাইব্রেরী এসোসিয়েশন। ষষ্ঠ দিন ২০শে জুন সঙ্গীত অনুষ্ঠানে বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া গোপালচন্দ্র ব্যানার্জী ও খ্যাতিমান যুবক খেয়ালী ভীষ্মদেব চ্যাটার্জীর সঙ্গীতে সকলে বিমোহিত হন।"

এর থেকে বোঝা যায়, কি পরিমাণ আড়ম্বরের ভেতর দিয়ে লাইব্রেরীর কনক-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়েছিল।

পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে মিল রেখে লাইব্রেরীর নিয়মাবলী রচিত হয়েছিল। স্থায়ী সভ্যের দেয় চাঁদা আগে ছিল ১০০৲ টাকা, বর্তমানে সেটা ২৫০৲ করা হয়েছে। এ ছাড়া গোড়ার দিকে লাইব্রেরীর সভ্যদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর সভ্যদের দেয় চাঁদার হার ছিল মাসিক দু'টাকা। তার পরের শ্রেণীর সভ্যদের চাঁদার হার ছিল এক টাকা ও আট আনা। সভ্যেরা লাইব্রেরী থেকে ইংরেজী-বাংলায় যথাক্রমে ৪ খানা, দু'খানা ও একখানা বই নিতে পারতেন। পরে চার আনা চাঁদায় চতুর্থ শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, ওদেরকে কেবলমাত্র একখানা বাংলা বই দেওয়া হ'ত। কিছুদিন পরে দেখা গেল, দু'টাকা চাঁদায় সভ্যসংখ্যা মাত্র দু'জন, ফলে সে শ্রেণী তুলে দিয়ে একটাকা, আট আনা ও চার আনায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সভ্য করা হ'ল, আসলে কিন্তু উঠে গেল চতুর্থ শ্রেণীটাই। লাইব্রেরীর সভ্যদের বর্তমানে দেয় চাঁদার হার দেড় টাকা, বার আনা ও ছয় আনা।

একজন সভাপতি, চারজন সহঃসভাপতি, ১ জন সম্পাদক, ১ জন লাইব্রেরীয়ান, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন হিসাব-রক্ষক ও ১৩ জন মেম্বার নিয়ে বর্তমান কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে। বর্তমানে লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী ও লাইব্রেরীয়ান শ্রীশ্যামসুন্দর ব্যানার্জী।

বর্তমানে লাইব্রেরীর বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকের সংখ্যা ত্রিশ হাজারেরও বেশী হবে। পাঠাগারে সর্বসাধারণের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা রয়েছে। পাঠাগারে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দৈনিক মাসিকে মিলে ১৫ খানা।

এ ছাড়া লাইব্রেরীর কিশোর-বিভাগ খোলা হয়েছে। কিশোর বিভাগের চাঁদা মাসিক চার আনা। এ বিভাগে কিশোর-পাঠ্য নয়শত বই আছে আর প্রত্যহই এ বিভাগেরও কাজ চলে।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর বর্তমান কার্যকলাপের মধ্যে বড় রকমের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার আয়োজন অন্যতম। এই প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পৃথকভাবে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় আর প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে, তাদের পুরস্কৃত করা হয় মূল্যবান পুস্তক উপহার দিয়ে।

লাইব্রেরীর দোতলায় প্রকাণ্ড হল ঘর। লাইব্রেরীর সংস্কৃতি-সংসদের (কালচারেল সাব-কমিটি) উদ্যোগে সেই ঘরে নাট্যাভিনয় ও সংগীত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ছাড়া সর্বসাধারণও এই প্রকাণ্ড হল নানা অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে থাকে অন্যান্য সভা-সমিতির জন্যেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান বৎসরে নূতন কার্য-নির্বাহক সমিতির প্রথম সভায় লাইব্রেরীর মহিলা-বিভাগে পৃথক সাব-কমিটি (উপসমিতি) গঠিত হয়েছে।

বহু পুরাতন এই বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক সাধনার তপোভূমি বলে গণ্য হবে— গণ্য হবে ভবিষ্যৎ বাংলার মানসতীর্থ বলে—এ কথায় আমরা বিশ্বাস করি।

[২০-১-৫২]

কুমারটুলী ইনষ্টিটিউট

১৮৮৪ সালের কথা। তখনো কলকাতার রাস্তাঘাট বড় বেশী হয়নি। কুমারটুলী মিত্রপাড়া তখনকার দিনে খুব উন্নত পাড়া ছিল। পাল-পার্বণ আর দুর্গোৎসবে পাড়ায় আনন্দের ঢেউ খেলে যেতো। সে সময়ের কথাগুলো বেশীর ভাগই আজ বিস্মৃতিতে হারিয়ে গেছে, সে সময়ের কথা বলবার মতো লোক আজ আর কেউ বেঁচে নেই। যে দু'একজন আজো বেঁচে আছেন তাঁদের ক্ষীণ প্রবাহ স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা চলে না, বেশীর ভাগই আন্দাজ ক'রে নিতে হয়।

জাতি হিসেবে আমরা ঐতিহাসিক নই। ইতিহাসের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ ক'রে রাখা আমাদের ধাতে পোষায় না। একটা জিনিষ হয়েছে, এর চেয়ে বড় সত্য আমাদের কাছে আর কিছুই নেই। হয়েছে দেখলেই আমরা খুশী; কেন হ'ল, কি করে হ'ল, কারা করলে এ-কথাগুলো জানবার বা জানাবার প্রয়োজন আমরা বোধ করিনে। "ফুটেছে"—একথাটাই পরম বিস্ময়। কি ক'রে ফুটলো, কখন ফুটলো আর কেন ফুটলো—এ প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে নিতান্তই অবাস্তব। তাই আমাদের নিয়ে ঐতিহাসিকের হয়েছে মুস্কিল। তাঁকে টেনে টেনে খণ্ড টুকরোগুলো বের করে নিয়ে মাঝ-খানের মস্ত বড় ফাঁকগুলোতে ভরাট করে জোড় লাগাতে হয় অবাধ কল্পনা ঢেলে। অবশ্য আমরা আজ আর এ সব ব্যাপারে উদাসীন নেই, এটা একটা আশার কথা। আমরা নিজেরা আমাদের ইতিহাস লিখলে বাস্তব সত্যই উদ্‌ঘাটিত হ'তো, বিদেশীর কল্পনাপ্রসূত ইতিহাসের বিকৃতি ঘটতো না।

কুমারটুলী ইনষ্টিটিউটই কলকাতার একটি পুরাণো প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর প্রচুর নামডাক। ১৯নং অভয়চরণ মিত্র ষ্ট্রীটে কুমারটুলী স্কোয়ারের পূর্ব সীমা ঘেঁষে এর বর্তমান বাড়ী। ১৮৮৪ সালের জুলাই মাসে এর আরম্ভ। প্রথম এটা আত্মপ্রকাশ করে 'কুমারটুলী রিডিং রুম' নামে। পাড়ার যুবকেরা সংস্কৃতিকেন্দ্র হিসেবে এটাকে গড়ে তোলেন। প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর

ছিলেন যদুনাথ মল্লিক, বেণীমাধব মিত্র, হরিদাস মিত্র, বি সি মুখার্জী, পি সি মুখার্জী, মণীন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরথনাথ মল্লিক প্রভৃতি। তখনকার দিনে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বর্তমানে তাঁর বয়স হয়েছে। তিনি বললেন সুরথনাথ মল্লিকের কথা। সুরথনাথ মল্লিক শুধু উদ্যোক্তাই ছিলেন না, ইনষ্টিটিউটকেও পরিচালিত করেছেন তিনি বহুদিন ধ'রে, আর এই সুরথনাথ মল্লিকই ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। কুমারটুলী রিডিং রুম প্রথম আরম্ভ হয় ৪৫নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীটে মালঞ্চের জমিদার রমানাথ মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীর এক ছোট ঘরে। প্রত্যেক সভ্য নিজেদেরই বই দিয়ে ছোট একটি লাইব্রেরী দাঁড় করালেন। এর প্রথম লাইব্রেরীয়ান হ'লেন কুমুদবিহারী চক্রবর্তী আর সম্পাদক হ'লেন চণ্ডীচরণ মিত্র। অল্প দিনের ভেতরই লাই- ব্রেরীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো বিতর্ক ও আলোচনা-সভা।

লাইব্রেরীর কাজ দ্রুত বেড়ে চললো, ফলে নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট থেকে লাইব্রেরী উঠে এলো ৫নং অভয়চরণ মিত্র ষ্ট্রীটে ত্রাণদানাথ মিত্রের বাড়ীর দোতলায়। সেটা ১৮৮৭ সালের কথা। ১৮৮৯ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কুমার- টুলীতে অনেকগুলো রাস্তা তৈরী করতে লাগলেন। তখন লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন মিঃ এন এন ঘোষ ('ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার সম্পাদক)। তিনি ছিলেন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সদস্য। আর কলকাতা মিউ- নিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ হ্যারি লী। মিঃ এন এন ঘোষের মারফৎ লী সাহেব লাইব্রেরীর শুভানুধ্যায়ী হয়ে ওঠেন আর তাঁরি চেষ্টায় লাইব্রেরীর সঙ্গে একটি ব্যায়ামাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঠের মুখোমুখী নতুন রাস্তার অপর পারে (বর্তমান ৬নং অভয়চরণ মিত্র ষ্ট্রীট) মিউনিসি- প্যালিটির এক কাঠা জায়গা লী সাহেব 'কুমারটুলী ইনষ্টিটিউট'কে বন্দোবস্ত ক'রে দেন আর সেই থেকে কুমারটুলী রিডিং রুমের নাম পরিবর্তিত হয়ে কুমারটুলী ইনষ্টিটিউটে পরিণত হয়। ইনষ্টিটিউটের সভ্যদের খেলবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি মাঠের অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন। লী সাহেবের চেষ্টায় ফোর্ট উইলিয়াম থেকে একজন সৈন্য এসে প্রত্যেক শনিবার ইনষ্টিটিউটের সভ্যদের প্যারেড করাতো। ১৮৮৯ সালে ইনষ্টিটিউটের ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয় আর সে বৎসরই বন্দোবস্তী জায়গার ওপর নূতন ঘরে লাইব্রেরী চলে

আসে। এর একটা ইতিহাস আছে।

ইনষ্টিটিউটের সভ্য দ্বারিকানাথ মিত্রের (পরে হাইকোর্টের জজ) খুড়তুতো ভাই কোচবিহার ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তাঁরি চেষ্টায় কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ইনষ্টিটিউটের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন। লাইব্রেরীর ঘর তৈরীর জন্য মহারাজা ৫০০৲ টাকা ইনষ্টিটিউটকে দান করেন আর সে টাকা সম্বল করে সদস্যগণ নিজেরাই ইঁটের গাঁথনি দেওয়াল আর টিনের চালা দিয়ে ইনষ্টিটিউটের ঘর তৈরী ক'রে নেন বন্দোবস্তী জমির ওপর ৬নং অভয়চরণ মিত্র ষ্ট্রীটে। ১৮৯০ সালে ইনষ্টিটিউটে ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়।

সে সময় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ইনষ্টিটিউটকে বিখ্যাত কোচবিহার কাপ প্রদান করেন। আই এফ এ তখনো সৃষ্টি হয়নি (১৮৯৩)। কুমারটুলী ইনষ্টিটিউটের পক্ষ থেকে সর্ত রেখে আই এফ এ'র হাতে এ কাপ দেওয়া হয়। সর্ত ছিল—এ কাপের খেলায় কোন ইউরোপীয়ান ক্লাব যোগ দিতে পারবে না, শুধু ভারতীয় টিমগুলোর মধ্যেই এর খেলা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কোচবিহার কাপ সম্বন্ধে এ নিয়ম আজো চলে আসছে। কুমারটুলী ফুটবল ক্লাব ভারতীয় দলগুলোর ভেতর পুরাতন একটি। দু' দু'বার প্রথম ডিভিশন লীগে ওঠবার যোগ্যতা অর্জন ক'রেও বিশেষ কারণে কুমারটুলী প্রথম ডিভিশনে উঠতে পারেনি, সত্যি এটা দুঃখের বিষয়। এ ক্লাব ১৯১৪ সালে ট্রেডার্স কাপ পেয়েছে, ১৯১৫ সালে পেয়েছে কোচবিহার কাপ আর ১৯২০ সালে শীল্ড ফাইন্যালে ব্ল্যাকওয়াচের কাছে ২—১ গোলে হেরে যায়। কৃতিত্ব থাকা সত্ত্বেও প্রথম ডিভিশনে উঠতে না পারার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বর্তমানে এর কিছুটা নিরুৎসাহ হয়ে পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ফুটবল ছাড়া ইনষ্টিটিউটে ক্রিকেট, হকি, পিংপং ও টেনিস খেলার ব্যাপক ব্যবস্থা রয়েছে।

কুমারটুলী ইনষ্টিটিউটে দেহ ও মনের পুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি, লাইব্রেরী ও ব্যায়ামাগার দুটোই চলছে। লাইব্রেরীতে কর্পোরেশনের সাহায্য রয়েছে একেবারে আরম্ভ থেকেই। ১৯০৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার লাইব্রেরীকে ১০০০ বই-এর এক সংগ্রহ দান করেন। সে সংগ্রহের ভেতর জীবনী, ইতিহাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও উপন্যাস প্রভৃতি ছিল। তা ছাড়া প্রাদেশিক

সরকারও ইনষ্টিটিউটকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক সরকার প্রকাশিত প্রচুর পুস্তক দিয়েছেন।

কুমারটুলী ইনষ্টিটিউটের কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বাড়ীতে স্থানাভাব অনুভূত হ'তে থাকে। ১৯১৩ সালে কিরণকুমার বসু ছিলেন ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক। নূতন বাড়ী তৈরীর তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা। স্থানীয় একদল লোকের বাধাদান সত্ত্বেও কর্পোরেশনের কাছ থেকে আবার প্রায় দু'কাঠা জায়গা বন্দোবস্ত নেওয়া হ'ল। সেই জমির ওপরই ইনষ্টিটিউটের বর্তমান বাড়ী নির্মিত হয়েছে। নূতন বাড়ী নির্মাণ তহবিলে নয়শো এক টাকা দান করেন দুর্গাচরণ ব্যানার্জী আর সদস্যগণ প্রত্যেকে পঁচিশ টাকা ক'রে দান করেন সে তহবিলে। ১৯১৪ সালে গৃহনির্মাণকার্য শেষ হ'লে কুমারটুলী ইনষ্টিটিউট ১৯নং অভয়চরণ মিত্র ষ্ট্রীটের নিজস্ব বর্তমান বাড়ীতে চলে আসে। কুমারটুলী স্কোয়ারের পূর্ব সীমায় উত্তরে রাস্তার ওপর ও পশ্চিমে খোলা মাঠের দিকে সম্মুখ রেখে এ বাড়ী নির্মিত হয়েছে। কুমারটুলী ইনষ্টিটিউটের অবস্থান সত্যি ভারি সুন্দর। বাড়ী তৈরীর দু'তিন বছর পরে হাটখোলার মণীন্দ্র লাইব্রেরী বই ও আলমারী সহ ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। বর্ধমানের মহারাজা ইনষ্টিটিউটকে টেনিস প্রতিযোগিতার জন্য বর্ধমান মেডেল দান করেছেন। অবশ্য এ প্রতিযোগিতা ইনষ্টিটিউটের সভ্যদের ভেতরই সীমাবদ্ধ।

লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তকসংখ্যা পাঁচ হাজারের কিছু বেশী। লাইব্রেরীতে অনেকগুলো পুরাণো বাঁধানো মাসিক রয়েছে, তার ভেতর সাহিত্য, সবুজপত্র, মালঞ্চ, মানসী ও মর্মবাণী আর নারায়ণের নাম করা যেতে পারে। ইনষ্টিটিউটের পাঠাগারে দৈনিকে মাসিকে গোটা দশেক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। এর আজীবন সভ্যের চাঁদা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী হিসেবে যথাক্রমে এক টাকা ও বারো আনা। প্রত্যেক সাধারণ সভ্যকে চার টাকা জমা দিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর সভ্যদের দু'খানা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যদের একখানা বই নেবার যোগ্যতা থাকে। তা ছাড়া চার টাকা জমা ও ছয় আনা চাঁদার কেবলমাত্র লাইব্রেরীর সভ্য হ'তে পারা যায়, তবে এই শ্রেণীর সভ্যদের সঙ্গে ইনষ্টিটিউটের বই লেন-দেন ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক থাকে না।

নববর্ষ উৎসব ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী এ দুটোকে ইনষ্টিটিউটের সাম্বৎসরিক প্রধান

অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে। এ দুটোতে গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। নেতাজীর জন্মোৎসব, গান্ধী, বিবেকানন্দ ও কবি-সাহিত্যিকের স্মৃতিবার্ষিকী ইনষ্টিটিউটে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

কুমারটুলী ইনষ্টিটিউটের বর্তমান সভাপতি শ্রী-এইচ এল সরকার, সম্পাদক শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান শ্রীনিতাইকুমার দে। কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কুমারটুলী ইনষ্টিটিউটের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[২০-৪-৫২]

কালীঘাট লাইব্রেরী

অতীত ভারতের জীবন-ব্যবস্থায় ধর্ম্ম আর সংস্কৃতি ছিল সমসূত্রে গাঁথা, একটাকে বাদ দিয়ে আর একটার কথা ভাবা যেত না তখন। অতীতের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই একটাকে ঘিরে আরেকটা গ'ড়ে উঠেছে ; অর্থাৎ হয় আমাদের তীর্থকে ঘিরে সংস্কৃতি-কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছে কিংবা সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলোই তীর্থে পরিণত হয়ে গেছে। তাই কাশী শুধু বিশ্বনাথের মন্দিরে সীমাবদ্ধ নয়, সেটা প্রাচ্য-বিদ্যারও পীঠস্থান আর নবদ্বীপ শুধু প্রাচ্যের 'অক্সফোর্ড'ই নয়, সেটা মানুষেরও পুণ্য তীর্থভূমি। এমনি নজীর একটা-দু'টো নয়, হাজারে হাজারে ছড়িয়ে আছে ভারতের সর্বত্র। এমনি হ'ত আগের যুগে। সে এক অতীত যুগের কথা। কথাটা সব দেশেরই একটা বিশেষ প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে সমান খাটে। তীর্থকে ঘিরে বিদ্যায়তন আর বিদ্যায়তনকে ঘিরে তীর্থ। তারপর সামাজিক বিবর্তনে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে পরিস্থিতির, ইতিহাসের পাতার পর পাতা উল্টে আমরা আজ এসে দাঁড়িয়েছি বিংশ শতাব্দীর ঘাটে—যন্ত্র-সভ্যতার তীর্থভূমে। ভেসে আসছে আরো ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আর পেছন পানে ফিরে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অতীত-পদক্ষেপের পরিচিহ্নিত পথ-রেখা! মোহ নেই, আছে আনন্দ ; সভ্যতার পথে মানুষের অব্যাহত জয়যাত্রা চলছে—চলতে থাকবে।

কালীঘাট প্রাচীন হিন্দুতীর্থ। যখন কলকাতা ছিল না তখনো কালীঘাট ছিল, যখন বর্তমান গড়ের মাঠ ছিল দস্যু-তস্করপূর্ণ হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল ঘন অরণ্যভূমি, তখনো তারি এক প্রান্তে কালীঘাটে প্রবাহিত হ'ত একটি স্বচ্ছ আনন্দিত পুণ্যার্থী জীবনধারা। জনপদ গড়ে না উঠুক, তীর্থকে ঘিরে একটা পল্লী যে গড়ে উঠেছিল তা' ঠিক। আর তারো ছিল একটা নিজস্ব সংস্কৃতি। কালীঘাটের পটোদের পটের যে বৈশিষ্ট্য আজ আমরা স্বীকার করছি, সেটা কিছু রাতারাতি গড়ে ওঠেনি, তারো পেছনে রয়েছে মানুষের বহুদিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভের এক বিচিত্র ইতিহাস। প্রাচীন যুগের বিস্মৃতপ্রায়

কীর্তির পাশে গড়ে উঠেছে আধুনিক যুগের বিজয়-বৈজয়ন্তী সৌধ-কিরীটিনী কলকাতা মহানগরী। কালীঘাটে আজো যখন হাঁটি, মনে মনে অনুভব করি তার অতীত-মাহাত্ম্য। আধুনিক যুগের মুখোমুখি অতীতের একটা স্মৃতি যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

কালীঘাট লাইব্রেরী পাড়ার সংস্কৃতি-কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৬ সালে। পাড়ার যুবকরা মিলে সেটা করেছিলেন, কলকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের একটা উদ্যোগপর্ব তখনো চলছে। পুরাণো লাইব্রেরী বলেই এর গোড়ার দিকের ইতিহাস হারিয়ে গেছে, লাইব্রেরীতেও সেটা রক্ষিত হয়নি। আমরা হলাম লোমশ মুনির বংশধর, যুগ-যুগান্ত সাগর-সৈকতে দাঁড়িয়ে পরলোকের দিকে হাত বাড়াই, তবু ঘর বাঁধি না, এমনি অবজ্ঞা আমাদের ইহজগতের প্রতি। তাতে করে পরলোকের দরবারে জমার ঘরের অঙ্কগুলো যতই স্ফীত হোক, ইহলোকের ব্যাপারে আমরা মার খাই। এই যে ইতিহাসের প্রতি অবজ্ঞা, সেটা আসলে আমাদের পার্থিব বিষয়ে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরই ফল। এ ছাড়া দলাদলি হল বাঙালী জাতির বিশেষত্ব, সেটা শুধু আমাদের দিনেই ঘটছে এমন নয়, আমাদের আগের যুগেও তা সমান ছিল। তাতে করে ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে আমরা বারবার বৃহত্তর আদর্শকে বলি দিয়েছি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাসের পাতায় দলের ছাপে সত্যটা ঢাকা প'ড়ে গেছে আগাগোড়া।

কালীঘাট লাইব্রেরীর ইতিহাস জানতে পাড়ার পুরাণো লোকদের দ্বারস্থ হতে হ'ল। খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে অনেক কিছু জেনে নিলাম। হালদার পাড়া রোডের ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের বয়স আশীর ওপর, লাইব্রেরী স্থাপনে সহযোগী আর সহকর্মী ছিলেন বললেন, সম্ভব বলেই মনে হ'ল সেটা। উনি ছাড়া সে সময়ে বর্তমান ছিলেন এমন কারো সাক্ষাৎ পাইনি বিশেষ খোঁজাখুঁজি করেও। তাঁর কাছ থেকে গোড়ার দিকের একটা ইতিহাস নিলাম। শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ আর শৈলেন্দ্র হালদার লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় ছিলেন। এ দু'জনেই প্রধান উদ্যোগী। খ্যাতি আর প্রতিপত্তির যোগ্যতায় এঁরা দু'জনেই ছিলেন পাড়ার যুবকদলের প্রতিনিধি। শ্রীপদবাবুর ছেলে দেবীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স হয়েছে, তিনি যতটুকু জানেন

বললেন। শৈলেন্দ্র হালদার মহাশয়ের ছেলে নিখিরাজ হালদার (বর্তমানে লাইব্রেরীর সুযোগ্য সম্পাদক) আর লাইব্রেরীর বিশিষ্ট পুরাতন সভ্য অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে গোড়ার দিকের একটা ইতিহাস পাওয়া গেল। অবশ্য স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে সঠিক সাল তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়।

১১নং সিকদার পাড়া রোডে (বর্তমান মহিম হালদার ষ্ট্রীট) শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদের বাড়ীর সংলগ্ন ছোট বাগানের ভেতর ততোধিক ছোট এক পুকুর পাড়ে হেলে-পড়া এক চালাঘর ছিল। সেটা গোলপাতায় ছাওয়া কিংবা টালিরও হতে পারে। পাড়ার যুবকরা সেখানে জড়ো হতেন আলাপ-আলোচনা করতে আর আড্ডা জমাতে—গুরুজনদের নজর এড়িয়ে যুবকদের তামাক খাওয়ার আড্ডা ছিল সেখানে। হঠাৎ একদিন ওদের মাথায় এলো—সাধারণ গ্রন্থাগার নেই এ এলাকায়, লাইব্রেরী একটা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমনি মাথায় আসা অমনি দুড়দাড় কাজে নেমে গেলেন ওঁরা। এলো কেরোসিন কাঠের বাক্স, আলমারী তৈরী হয়ে গেল। নিজেরা বই দিয়ে ওঁরা করলেন ১৮৮৬ সালে কালীঘাট লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা সেই হেলে-পড়া চালাঘরে তামাক খাওয়ার আড্ডাখানায়। বর্তমানে সেটা বাড়ীর উদর-গহ্বরে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। শ্রীপদবাবু লিখতেন, এছাড়া বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারেও তার ছিল জানাশোনা। উপেন্দ্রনাথের সেখানে যাতায়াত ছিল। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার আলাপ-আলোচনার মাঝখানে উপেন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে হাজির হন আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন বসুমতীর প্রকাশিত পুস্তক তাঁদের দেবার। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেওছিলেন লাইব্রেরীতে বসুমতীর বই দিয়ে। কালীঘাট লাইব্রেরীর প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ, শৈলেন্দ্রনাথ হালদার, ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, বেণীমাধব বসু, ভূষণ ভট্টাচার্য, চন্দ্রমাধব ঘোষাল, বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়, সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাড়ার যুবকবৃন্দ।

লাইব্রেরীর কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেই ছোট কুঁড়েঘর থেকে লাইব্রেরী উঠে যায় বর্তমানের ১নং মহিম হালদার ষ্ট্রীটে এক ভাড়াটে বাড়ীতে। কানাই চট্টোপাধ্যায় এখানে থাকাকালীন লাইব্রেরীতে যোগ দেন ও ইউনিক ক্লাবে কিছুদিনের জন্য লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয়। এখান থেকে লাইব্রেরী

উঠে যায় পাথুরে পটির সুকুমার হালদারের বাড়ীতে। সুকুমার হালদারের বাড়ী থেকে লাইব্রেরী চলে আসে শৈলেন্দ্র হালদারের বাড়ীর নীচের তলায় বৈঠকখানার একটি ঘরে। কয়েক বৎসরের এই স্থানান্তরের ইতিহাসে কোন এক সময় কিছুদিন লাইব্রেরী রসা রোডের চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে, যেখানে বর্তমানে রয়েছে বসুশ্রী সিনেমা হল, সেখানটায় ছিল, তবে সেটা শৈলেন্দ্র হালদারের বাড়ীতে আসার আগেই হবে। কারণ শৈলেন্দ্র হালদার মহাশয়ের বাড়ী থেকেই ১৯০২ সালের শেষভাগে বা ১৯০৩ সালের গোড়ার দিকে লাইব্রেরী ৪৬, মহিম হালদার ষ্ট্রীটের বর্তমান নিজস্ব বাড়ীতে চলে আসে।

শৈলেন্দ্র হালদারের বাড়ীতে লাইব্রেরী আসার পর শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদের সঙ্গে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। শ্রীপদবাবুর ধারণা হয়, শৈলেন্দ্রবাবু এটাকে নিজস্ব লাইব্রেরীতে পরিণত করতে চান। এর পেছনে ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার দলাদলির প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছু ছিল বলে মনে হয় না। আগেই বলেছি, দু'জনেই ছিলেন পাড়ার প্রতিনিধিস্থানীয়। লাইব্রেরীর জন্য শৈলেন্দ্র হালদার ও তাঁর পুত্র বর্তমান সম্পাদক নিধিরাজ হালদারের অকৃপণ সেবা ও দান সত্যি গর্ব করে বলে বেড়াবার মতো। শৈলেন্দ্র হালদার কালীঘাট মহাকালী পাঠশালা, সর্বার্থসাধিনী সভা আর লাইব্রেরীর স্থায়ী ঘরের জন্য চার কাঠা জমি ও এক হাজার টাকা দান করেন, অবশ্য তাঁর দানের শেষ এইখানেই নয়। সেই জমির ওপর পাঠশালা, সভা ও লাইব্রেরীর ঘর নির্মিত হয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ বদান্যতায়।

প্রথম দিকে লাইব্রেরীর বিশেষ সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সার হারবার্ট হোপ রিজলে প্রভৃতি মণীষিবৃন্দ যোগ দিয়েছেন আর পরবর্তীকালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এস এন, মল্লিক, মিঃ পেন, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি যোগ দিয়েছেন লাইব্রেরীর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে। এস, এন, মল্লিক ও মিঃ পেনের আমলে লাইব্রেরী কলকাতা কর্পোরেশনের অর্থসাহায্য পেতে আরম্ভ করে ও বর্তমান সম্পাদকের হাতে সেটা বেড়ে ৪৫০৲ টাকা পর্যন্ত ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভে ১৯১৪ সালে বিপ্লবী কার্যকলাপের অজুহাতে পুলিস লাইব্রেরীতে খানাতল্লাসী করে,

কিন্তু সন্দেহজনক কিছু না পাওয়ায় সেটার পরিসমাপ্তি ঘটে সেইখানেই, তাতে করে লাইব্রেরীর কোন ক্ষতি হয়নি। ১৯০০ সালে লাইব্রেরীর সম্পাদক হন শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরে পর পর লাইব্রেরীর সম্পাদক হন বীরেশ্বর বসু, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মাত্র অল্প দিনের জন্য) ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৬ সালে লাইব্রেরীর বর্তমান সম্পাদক শ্রীনিধিরাজ হালদার লাইব্রেরীর সম্পাদক হন। কালীঘাট লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি হলেন শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় আর শ্রীনির্মল বসু হলেন বর্তমানে লাইব্রেরীয়ান।

কালীঘাট লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তকসংখ্যা ৭,৯০০, তার মধ্যে ৬৫০০ বাংলা পুস্তক আর বাকী ১৪০০ খানা ইংরেজী। লাইব্রেরীর পাঠাগারে বর্তমানে ইংরেজী, বাংলা প্রায় সবগুলো মাসিক ও সাময়িক পত্র রাখা হয় আর দৈনিক রাখা হয় মাত্র দু'খানি যুগান্তর ও ষ্টেটস্‌ম্যান। লাইব্রেরীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যের চাঁদার হার যথাক্রমে আট আনা ও চার আনা, জমা আট টাকা ও পাঁচ টাকা, আর দুই শ্রেণীতেই এক টাকা প্রবেশমূল্য দিতে হয়। লাইব্রেরীর দুষ্প্রাপ্য বই-এর ভেতর হ্যাভলক এলিস (সম্পূর্ণ) ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড অব নোলেজ-এর নাম করা যায়।

[২৫-৫-৫২]

চৈতন্য লাইব্রেরী

চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রাচীনতার কথা বললেই সব বলা হয় না, আরো অনেক কিছু তবু বাকী রয়ে যায়। কলকাতার সাংস্কৃতিক ক্রমঃবিকাশে এ-লাইব্রেরীর দান অসামান্য। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে স্কটিশ চার্চ কলেজ হলে ১৯৪৯ সালের ৯ই এপ্রিল বিকেল পাঁচটায় চৈতন্য লাইব্রেরীর হীরক-জয়ন্তী উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। সে উৎসবের পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের তখনকার রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু। উৎসব-সভায় ডাঃ কালিদাস নাগ যা' বলেছিলেন তার সারমর্ম হ'ল—

লাইব্রেরী বলতে কতকগুলো বই-এর সমষ্টিমাত্র বোঝায় না, বোঝায় জ্যোতির্ময় কতকগুলো আত্মার সমন্বয় আর তারই ভেতরে রয়েছে লাইব্রেরী-আন্দোলনের আসল সার্থকতা। রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর রাজা রাধাকান্ত দেব চেয়েছিলেন ব্যাপকতর শিক্ষার প্রসার। তাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে সর্বপ্রথমে উত্তর-কলকাতায় লাইব্রেরী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। চৈতন্য লাইব্রেরীও উত্তর কলকাতায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস চ্যাটার্জী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রথম থেকেই এ লাইব্রেরীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, ফলে চৈতন্য লাইব্রেরী সে যুগের সংস্কৃতি-কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিল। সাহিত্যানুরাগী ইউরোপীয় মাত্রেই এর সঙ্গে এসে যোগ দেন। এখানে হয়েছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে ভাব-বিনিময়, আর এরই ফলে চৈতন্য লাইব্রেরী প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ভূমিতে পরিণত হয়।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সে হীরক-জয়ন্তী উৎসবে যা' বলেছিলেন তার কিয়দংশের সারমর্মও এখানে দিচ্ছি—

চৈতন্য লাইব্রেরী যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন নাম করবার মতো কলকাতায় একটি মাত্র লাইব্রেরী ছিল,—'ক্যালকাটা পাব্লিক লাইব্রেরী'; মেটকাফ হলে লর্ড মেটকাফের অনুরাগীদের দ্বারা সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড কার্জন সেটাকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত করে দেন; উত্তরযু

কলকাতা থেকে মেটকাফ হল অনেক দূর। একদল যুবকের চেষ্টায় উত্তর কলকাতায় চৈতন্য লাইব্রেরী স্থাপিত হ'ল। তাদের অর্থ ছিল না সত্যি, কিন্তু উৎসাহ ছিল অফুরন্ত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ-লাইব্রেরীর প্রাণ-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। দ্রুত এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে নিলে যে, এখানে এসে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন বঙ্কিমচন্দ্র, ডাঃ গ্রিয়াস´ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ফাদার লাফোঁ, স্যার হারবার্ট হোপ রিজলে, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যার কোমার পাথ্রাম, ডাঃ গুরুদাস ব্যানার্জী, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ মনীষিবৃন্দ। এটা চৈতন্য লাইব্রেরীর গর্ব করবার মত নিঃসন্দেহ।

"কম্বুলেটোলা লাইব্রেরীর অনুকরণে, গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের আনুকূল্যে পাদরি টমরি সাহেবের নেতৃত্বে বিডন ষ্ট্রীটের ৮৩ নং বাড়ীতে, ১৮৮৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়"—এ-উদ্ধৃতিটুকু চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি সেনের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

কম্বুলেটোলা লাইব্রেরীর তখন খুব নামডাক, পরে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর সঙ্গে সেটা যুক্ত হয়েছে। ১৮৮৭ সালে গৌরহরি সেন সেটার সভ্য ছিলেন, ১৮৮৮ সালে তাঁর বন্ধু কুঞ্জবিহারী দত্তকে তিনিই সেটাতে ভর্তি করান। কম্বুলেটোলা লাইব্রেরীতে বর্ষাকালে যাওয়া কষ্টকর ছিল, তাইতে বিডন ষ্ট্রীটে এ ধরণের একটা লাইব্রেরী করতে তাঁদের ইচ্ছে হয়। তাঁদের কথাবার্তা শুনে কুঞ্জবিহারী দত্তের ছোট ভাই নিতাইচাঁদ দত্ত তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি ছিলেন খুব উৎসাহী। দু'এক দিনের ভেতর তাঁদের দলে যোগ দিলেন নিতাইচাঁদের গৃহ-শিক্ষক হরলাল শেঠ আর তাঁদের প্রতিবেশী রঙ্গলাল বসাক। এই পাঁচজন একজোট হয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন, কি ক'রে লাইব্রেরী খোলা যায়? গৌরহরি সেন এফ-এ ফেল ক'রে তখন বেকার, কুঞ্জবিহারী এফ·এ ক্লাসের ছাত্র, নিতাইচাঁদ পড়েন হেয়ার স্কুলে, হরলালবাবু সামান্য গৃহ-শিক্ষক আর রঙ্গলালবাবু অল্প মাইনের কেরাণী মাত্র। লাইব্রেরী খুলবেন টাকা কোথায়? গৌরহরি সেন কুঞ্জবাবু ও নিতাইবাবুর পিতামহ—গঙ্গানারায়ণ দত্তের ইংরেজী চিঠিপত্র লিখে দিতেন। গঙ্গানারায়ণ দত্ত গৌরহরি সেনকে অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন। কুঞ্জবিহারী ও নিতাইচাঁদবাবুর পরামর্শে গৌরহরি সেন একদিন তাঁর কাছে লাইব্রেরীর কথা পাড়লেন, প্রথমটা গঙ্গা-

নারায়ণবাবু কিছু বললেন না। কিন্তু কয়েকদিনের ভেতরই গৌরহরি সেনকে ডেকে কিছু টাকা দিলেন আর লাইব্রেরীর জন্য ছেড়ে দিলেন তাঁর নিজের ঘুমোবার, হরিনাম করবার আর হিসেব লেখবার ঘরখানা। সেটা হ'ল বিডন ষ্ট্রীটের ৮৩নং বাড়ীতে ঢুকতেই বাঁ ধারের ঘর। সে ঘরে বিনা ভাড়ায় লাইব্রেরী ছিল চার বছরেরও বেশী দিন। দত্ত মহাশয়ের টাকায় কয়েকখানা বই কেনা হ'ল আর নিজেদের বই এবং আরও দু'একজনের কাছ থেকে বই চেয়ে এনে একটা আলমারীতে পুরে লাইব্রেরী আরম্ভ হ'ল। সংবাদপত্রের ভেতর কুঞ্জবিহারী বাবুর শ্বশুর পাঠিয়ে দিতেন, 'ইণ্ডিয়ান মিরার' আর ও'রা সঞ্জিবনী ও বঙ্গবাসী কিনে নিতেন।

পাদরি টমরি সাহেব থাকতেন বিডন ষ্ট্রীটের ৩২।৬নং বাড়ীতে। গৌরহরি সেন তাঁকে ধ'রে নিয়ে এলেন। বই আর সভ্যের সংখ্যা দেখে টমরি সাহেব হাসতে লাগলেন, অপ্রস্তুত গৌরহরি সেন সেদিন হাসির উত্তরে বলেছিলেন, বুঝলে সাহেব, রোম নগরী এক দিনে তৈরী হয়নি। অল্পদিনের ভেতর টমরি সাহেব হলেন লাইব্রেরীর সভাপতি আর স্থায়ী সভ্য। স্থায়ী সভ্যের চাঁদা ছিল তখন দশ টাকা আর সাধারণ সভ্যের চাঁদা মাসে দু'আনা করে। বহু দিন লাইব্রেরী এই টমরি সাহেবের পরিচালনাধীনে চলতে থাকে।

গৌরহরি সেন প্রথম এ লাইব্রেরীর নাম দিয়েছিলেন 'বিডন স্কোয়ার লিটারারী ক্লাব', কিন্তু গঙ্গানারায়ণ দত্ত তাতে রাজী হলেন না। তিনি ঠাকুর-দেবতার নামে নাম রাখতে চাইলেন। শেষটায় লাইব্রেরীর নাম ঠিক হ'ল 'চৈতন্য লাইব্রেরী এণ্ড বিডন স্কোয়ার লিটারারী ক্লাব'। আজো এ নামেই লাইব্রেরী চলছে। গৌরহরি সেনের ইচ্ছে ছিল ১৮৮৯ সালের ১লা জানুয়ারী সাইনবোর্ড লাগিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে লাইব্রেরী আরম্ভ হয়, কিন্তু পাঁজি দেখে দিনটা খারাপ ব'লে সেটাও পিছিয়ে দিয়েছিলেন গঙ্গানারায়ণ দত্ত আর তাঁরই ইচ্ছা মতো ৫ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজোর দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে লাইব্রেরীর কাজ আরম্ভ হয়েছিল। গৌরহরি সেন প্রাণপাত পরিশ্রমেও এক বছরে লাইব্রেরীকে বিশেষ বাড়াতে পারেননি। শেসটায় ১৮৯০ সালের প্রারম্ভে লাইব্রেরীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবকে সভাপতি যোগাড় করা হ'ল আর গৌরহরি সেন নিয়ে এলেন ব্যারিষ্টার

আশুতোষ চৌধুরীর (পরে সার) নিকট থেকে সভার জন্য "লিটারেচার এণ্ড দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি" নামে প্রবন্ধ। চৌধুরী সাহেবের প্রবন্ধের আলোচনা বের হ'ল কলকাতার সমস্ত দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য লাইব্রেরীর নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে টমরি সাহেব, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী এই চার জনের চেষ্টায় বহু স্থায়ী সভ্য হয়েছিল আর এককালীন চাঁদা হিসেবে টাকা আদায় হয়েছিল যথেষ্ট পরিমাণে। ১৮৯১ সালে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ব্যয়ে লাইব্রেরী রেজিষ্টারী করা হয়েছিল। কুঞ্জবিহারী দত্তের যত্নে আর রামকৃষ্ণ দত্তের ব্যয়ে ১৮৯৩ সালের শেষের দিকে ৪।১নং বিডন ষ্ট্রীটে চৈতন্য লাইব্রেরীর নূতন দোতলা বাড়ী তৈরী হয়েছিল, বাৎসরিক সে বাড়ীর ভাড়া দু'শো টাকা। লাইব্রেরী এখনো সেখানেই আছে।

গৌরহরি সেন চৈতন্য লাইব্রেরীর কেবলমাত্র সম্পাদকই ছিলেন না, নিজের রক্তবিন্দু দিয়ে এ লাইব্রেরী তিনি গ'ড়ে গেছেন। এর প্রতিটি কাজে গৌরহরি সেন, প্রতিটি উন্নতিতে গৌরহরি সেন। গৌরহরি সেনের বিকশিত আত্মাই চৈতন্য লাইব্রেরীরূপে আজ ফুটে উঠেছে, এর ভেতর দিয়ে গৌরহরি সেনের সমস্ত জীবনের সাধনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

চৈতন্য লাইব্রেরীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের কথা হ'ল দেশ-বিদেশের মনীষিবৃন্দের দ্বারা বক্তৃতার আয়োজন। এ রকমের শতাধিক বক্তৃতার আয়োজন এখানে করা হয়েছে। চৈতন্য লাইব্রেরীতে বক্তৃতা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস ব্যানার্জী, ফাদার লাফোঁ, হারবার্ট রিজলে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, আলেকজেণ্ডার মিলার, হেনরি কটন, কোমার পাথ্রাম, জন ষ্ট্যানলি আনন্দ চালু, সার গ্রিয়ার্সন, রাসবিহারী ঘোষ, টি এন মুখার্জী, ই বি হ্যাভেল, আর্ল রিচার্ডস, ফার্মিঙ্গার, অধ্যাপক ওয়াচ, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সি ভি রমণ প্রমুখ বহু মনীষী ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ এই লাইব্রেরীতে য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক, বঙ্কিমচন্দ্র, মেয়েলি ছড়া, স্বদেশী সমাজ, পথ ও পাথেয়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা নামক রচনা পাঠ ও বক্তৃতা করেছেন।

চৈতন্য লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর জন্য ১৯৩৬ সালে সাত কাঠা জমি কেনা

হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য জিনিষ-পত্রের দাম অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়ায় গৃহ-নির্মাণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরে এ জায়গা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, অবশ্য তাতে কিছুটা লাভও পাওয়া গেছে। এ বাবদে পাওয়া ও হাতের নগদে ১,১২,৫২২৸/১১ পাই কোম্পানীর কাগজে ও ব্যাঙ্কে রয়েছে। গৃহ-নির্মাণ তহবিলে দেশবাসীর নিকট থেকে আরো টাকা না উঠলে লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ী করা সম্ভব নহে। রমেশচন্দ্র দত্তের ভাইপো প্রতাপচন্দ্র দত্ত ৩০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ লাইব্রেরীকে দান ক'রে গেছেন, তার সুদের থেকে কুড়ি জন বেসরকারী কলেজের ছাত্র বিনা চাঁদায় লাইব্রেরীর বই পড়তে পায়। ১৮৯০ থেকে ১৯১৭ সালের ভেতর চৈতন্য লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে ৫৪টি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে ও প্রথম স্থান অধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে স্বর্ণপদক, রৌপ্যপদক অথবা নগদ একশত টাকা।

চৈতন্য লাইব্রেরীকে একটু বেশী রক্ষণশীল বলেই মনে হয়। নূতন কার্য-নির্বাহক সমিতি গোড়া থেকেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হিসেবে চলে আসছে। সভাপতি, ৪ জন সহ-সভাপতি, ২ জন সম্পাদক, ৬ জন লাইব্রেরীয়ান, ২ জন কোষাধ্যক্ষ, ২ জন হিসাব রক্ষক ও ১ জন হিসাব পরীক্ষক নিয়ে কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত। ডাঃ কালিদাস নাগ বর্তমানে লাইব্রেরীর সভাপতি আর সম্পাদক শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ দত্ত ও শ্রীঅরুণ দত্ত। অপূর্বকৃষ্ণ দত্ত গত ত্রিশ বৎসর ধ'রে সম্পাদক। বহু বৎসর ধরে শ্রীশ্যামসুন্দর দত্ত ধনাধ্যক্ষের পদে আছেন। লাইব্রেরীর উন্নতির জন্যে তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে লাইব্রেরীতে পুস্তকসংখ্যা ২৬,০০২, তার মধ্যে বাংলা বই ১৫,১০৭ আর বাকী ১০,৮৯৫ খানা ইংরেজী। লাইব্রেরীতে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বর্তমানে দৈনিকে-সাময়িকে ৩০ খানা হবে। এই লাইব্রেরীতে বহু দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য গ্রন্থ রয়েছে, দুঃখের বিষয় অনেকে বইগুলো নিয়ে গিয়ে আর ফিরিয়ে দেন না। এটা সত্যি আমাদের লজ্জার কথা। লাইব্রেরীর পাঠাগারে সকলের পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের সুবিধে রয়েছে। লাইব্রেরীর বর্তমান স্থায়ী সভ্যের সংখ্যা ২৮৬ আর সাধারণ সভ্যসংখ্যা ছয় শত।

চৈতন্য লাইব্রেরী বহু বৎসর কলকাতা কর্পোরেশন থেকে নিয়মিত অর্থ-

সাহায্য পেয়ে আসছে। গত ১৯৪৬ সালে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। গত ছয় বৎসরের ভেতর মাত্র দু'বছর ৫০০৲ টাকা ক'রে সেখান থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে। ১৯৪৯ সাল থেকে আই এফ এ ফুটবল এসোসিয়েশন ১০০৲ টাকা করে লাইব্রেরীকে অর্থ সাহায্য করছেন, আশা করা যায় এ চলতে থাকবে।

[১১-২-৫২]

ভারতী পরিষদ

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে উত্তর কলকাতায় গ্রন্থাগার আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে। আন্দোলন চলছিল অনেক দিন ধরেই আর ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে উত্তর কলকাতায় কয়েকটি সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার গড়েও উঠেছিল (কুমারটুলি ইনষ্টিটিউট, কম্বুলেটোলা লাইব্রেরী, জোড়াসাঁকো লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী প্রভৃতি)। এ ছাড়া সে সময় ও-দিকটায় অনেকের নিজস্ব লাইব্রেরীও গড়ে উঠতে থাকে আর সেগুলোতেও সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। মোটের ওপর জনসাধারণের ভেতর শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা যে খুব বেশী, একথাটা তখনকার শিক্ষিত লোক মাত্রেই বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে গ্রন্থাগার-আন্দোলন সমগ্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল আর উত্তর কলকাতায় সেটা দ্রুত খুব জোরালো হয়ে উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে।

ইংরেজী ১৮৯০ সালের নভেম্বর মাস, শ্যামবাজার পল্লীর কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রের মাথায় এলো সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের কথা। তখন ওদিকটায় কোন সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল না। অখ্যাত নিঃসম্বল কয়েকজন ছাত্র। অখ্যাত, কারণ তাদের নাম আজ হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে, চারজন ছাড়া কারুর নাম হাজার চেষ্টায়ও জানবার উপায় নেই; নিঃসম্বল, কারণ তাদের জল-খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে তারা গ্রন্থাগার গড়বার স্বপ্ন দেখেছিল। এ যেন শিল্পীরা সুন্দর করে মনের মতো ইমারত গড়লে, তারপর তার সঙ্গে জড়িয়ে রইলো কোন মহারাজাধিরাজের নাম! যে শিল্পীরা বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে ইমারতের ভেতর তাদের স্বপ্ন সার্থক করে তুললো, তাদের কথা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল, সে আর কেউ মনে করে রাখলে না। এমন ব্যাপার আমাদের দেশে চিরদিন ঘটছে দেখতে পাই, এমন ব্যাপার অন্য দেশে ঘটেছে এর নজির তো খুঁজে পাইনে। অন্য দেশে একটা ইমারত নয়, ইমারতের একখানা দরজা তৈরী করেছে কোন্ কোন্ শিল্পী তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রয়েছে আর

সেটা মনে করে আর মনে করিয়ে দিয়ে সে দেশের লোকের আনন্দে! আমাদের দেশেও শিল্প-কাজ হয়েছে প্রচুর সত্যি, কিন্তু শিল্পীদের ভুলে গিয়ে শিল্পীদের প্রতি জনসাধারণ যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে, সেটার প্রশংসা করতে পারিনে। তেমনি দেখি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের গায়ে বড় বড় নামের লেবেল আঁটা মার্কাগুলো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে—যাঁরা পদার্পণ করে বা না করে শুধু নাম ধার দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধন্য করেছেন, আর যারা বুকের রক্ত দিয়ে সেগুলোকে গড়ে তুললো তাদের নাম বিস্মৃতির অবলুপ্তিতে কোথায় যে হারিয়ে গেছে খুঁজে তার আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। ১৮৯০ সালের নভেম্বর মাসে ৮৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে 'আলবার্ট লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষেত্র গুপ্ত, সতীশ গুপ্ত, কালী পাণ্ডে, নলিনবিহারী মিত্র, তারাপদ সেন প্রভৃতি ছাত্রদের জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে।

৮৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আলবার্ট লাইব্রেরী আরম্ভ হয় আর উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় সেটা বাড়তে থাকে। প্রতিষ্ঠাতৃদের সামর্থ্য অল্প ছিল সত্যি, কিন্তু চেষ্টা-যত্নের অভাব ছিল না। সাধ্যের চেয়ে বেশী অর্থসাহায্য আর পুস্তক-সাহায্য ওরা করেছিল। ফলে শীঘ্রই ৮৮নং বাড়ীতে স্থানাভাব দেখা দিলে লাইব্রেরী উঠে গেল কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ৯৯নং বাড়ীতে। কিছুদিন যেতে না যেতেই লাইব্রেরীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে গৃহস্বামীর মনান্তর উপস্থিত হ'ল, ফলে সেখান থেকে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হ'ল ৮৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে।

আলবার্ট লাইব্রেরীর ১৮৯৩ সালের বার্ষিক অধিবেশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষে 'জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিটিউশন'—বর্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের কেন্দ্রীয় কক্ষ সুসজ্জিত করা হয়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সে সভার সভাপতি, আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সে সভার প্রধান বক্তা। এটা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হবার অল্প দিন আগের ঘটনা।

প্রায় একই সময়ে সিকদারবাগানে 'যমুনা লাইব্রেরী' স্থাপিত হয়েছিল। যমুনা লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা নন্দ মিত্র আর অক্ষয় মিত্র (সুবল মিত্রের ভাই)। দুটোর পরিচালকবর্গের চেষ্টায় আর সম্মতিতে আলবার্ট লাইব্রেরী আর যমুনা লাইব্রেরী ১৮৯৪ সালে একত্রীভূত হ'য়ে 'আলবার্ট-যমুনা লাইব্রেরী'

নাম নিলে। তখন লাইব্রেরীর কর্মকর্তাগণ সাহায্যের জন্যে গেলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সি আর উইলসন, মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শোভা-বাজারের মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কাছে আর তাঁরা যথাক্রমে সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও হিতৈষী হিসেবে লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত হ'লেন। সভাপতি উইলসন সাহেবের চেষ্টায় লাইব্রেরীর প্রভূত উন্নতি হ'ল, আর তাঁরই চেষ্টায় লাইব্রেরী স্থানান্তরীত হ'ল ১৩৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ও লাইব্রেরীর নূতন নামকরণ হ'ল 'কর্ণওয়ালিশ য়ুনিয়ন ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী'। ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরী ওখানেই ছিল আর এ সময়ের ভেতর লাইব্রেরীর অশাতিরিক্ত উন্নতি হয়। সে সময় যাঁদের বদান্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কুচবিহার, ময়ুরভঞ্জ আর দিনাজপুরের মহারাজাগণ, ঢাকার নবাব, রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সার ই আর বেকার, সার রোপার লেথব্রিজ, সার এ পেডলার, রেভারেণ্ড এইচ হোয়াইট হেড, ফাদার লাফোঁ, মিঃ এইচ আর জেইমচ, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

পরে আবার ৮৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয়. তখন সভা-সমিতির অধিবেশন হ'ত লাইব্রেরী-কক্ষে বা মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে। এ ঘরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় পরিচালকবর্গ ৮৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ভবনের তখনকার মালিক ক্ষেত্রমোহন গুহ মহাশয়ের দ্বারস্থ হ'লে তিনি নিজের ব্যয়ে লাইব্রেরীর জন্য একটি সুবৃহৎ কক্ষ নির্মাণ করিয়ে দেন। সেখান থেকে পুনরায় স্থানচ্যুত হ'য়ে লাইব্রেরী উঠে আসে ১২৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে। এ সময় লাইব্রেরী একান্ত গতানুগতিক হ'য়ে পড়ে, লাইব্রেরীর কাজে দেখা দেয় সাধারণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক, ঢিলেঢালা ভাব, ফলে এ সময় একটা লক্ষ্মীছাড়া নিরুৎসাহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ রকম যখন অবস্থা, অন্তরের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে কোনমতে টিকে থাকা লাইব্রেরীর ক্ষীণপ্রবাহ প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ চলছে। লাইব্রেরী সেখান থেকে ওঠে এলো ৬নং আর জি কর রোডের বর্তমান ভবনে, —সেটা ১৯১৭ সালের কথা। লাইব্রেরীর বই দেওয়ার কাজে গোড়া থেকেই পাড়ার ছেলেরা সাহায্য ক'রে এসেছেন। ছাত্র অবস্থায় এখানে কাজ

করেছেন মতিলাল ঘোষ, সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, ভূপেন বসু, ডাঃ গণেন্দ্রনাথ মিত্র, বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় অশোকনাথ শাস্ত্রী, তুষারকান্তি ঘোষ প্রভৃতি।

১৯১৭ সালে লাইব্রেরী বর্তমান গৃহে উঠে আসে। ১৯১৭ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরীর সম্পাদক ছিলেন পুলিনবিহারী মিত্র আর লাইব্রেরীয়ান ছিলেন নীরোদচন্দ্র দে। লাইব্রেরীর উন্নতির জন্যে চেষ্টা করেও তাঁরা তখন কিছু করে উঠতে পারেননি। লাইব্রেরীর অব্যবস্থা তখন চরম দুরবস্থায় পৌঁছেছে বর্তমান ঘরে লাইব্রেরী থাকলেও এ ঘর তখন ছিল না—পরে এটা তৈরী করা হয়েছে। এই ১৯১৭ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কর্ণওয়ালিশ লাইব্রেরীর ইতিহাস একটা প্রচণ্ড সংঘাতের ইতিহাস, নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সংঘাত। এ সময় মণিলাল শ্রীমাণী এসে লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত হন—বছর ষোল তাঁর বয়স তখন। তরুণ বয়স্ক এই মণিলাল শ্রীমাণীই পুরাতন কর্মপন্থায় প্রথম আঘাত হানেন, ফলে পুরাতন কর্ম পরিষদের সঙ্গে সংঘাত বাধে। সে সময় (১৯২২-২৬) লাইব্রেরীর এমন দুরবস্থা চলছে যে, সময় সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত মিলে যাবার কথা উঠেছে,—ঘর ভাড়া বাকী পড়েছে, টাকা পয়সার অভাব, আর চলে না এমন অবস্থা। মণিলাল শ্রীমাণী ঢুকে পড়লেন কর্মপরিষদে। তাঁর সঙ্গে রইলেন জগবন্ধু দে, জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মনাথ সুর, অমরপাল চৌধুরী, সুনীলচন্দ্র বসু, তারকনাথ পাইন, সৌরীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, তারকদাস সেনগুপ্ত, কল্যাণময় শ্রীমাণী প্রভৃতি একদল উৎসাহী তরুণ কর্মী। ১৯২৮ সালে এঁদের হাতে লাইব্রেরীর সমস্ত কর্মভার চলে আসে, কর্ণওয়ালিশ লাইব্রেরীকে নবজন্মে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব এঁদেরই। কল্যাণময় শ্রীমাণী ১৯৩০ সাল থেকে আজ (১৯৫২) পর্যন্ত লাইব্রেরীর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত আছেন, আর মণিলাল শ্রীমাণী আজ ত্রিশ বছর লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য পরিশ্রম করে চলেছেন।

ইংরেজী ১৯৩৪ সালে কর্ণওয়ালিশ লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। লাইব্রেরীর ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখযোগ্য বৎসর। এ বছরে লাইব্রেরীর শিশু-বিভাগ খোলা হয়। এই শিশু-বিভাগের উদ্বোধনী সভার সভাপতি ছিলেন কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়

মহাশয়। এ সময়ে লাইব্রেরী ও পাঠাগারের স্থান-বিস্তৃতি ও পুস্তকাধার নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া এ সময়ে পুস্তক নির্বাচন সমিতি নামে লাইব্রেরীর এক অনুসমিতি গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে সভা ডেকে লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। 'কর্ণওয়ালিশ ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী'র বদলে নূতন নামকরণ হয়েছে 'ভারতী পরিষদ'।

ভারতী পরিষদের বর্তমান কার্যকলাপের মধ্যে কলকাতার লাইব্রেরী-গুলোর দুষ্প্রাপ্য বই-এর তালিকা তৈরী উল্লেখযোগ্য। তা' ছাড়া মনীষীদের দ্বারা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার আয়োজন, রাষ্ট্রভাষা-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, মহাত্মা গান্ধীর লেখা ও গান্ধীর বিষয়ে লেখা গ্রন্থ সংগ্রহ দ্বারা গান্ধী বিভাগ পরিচালনা লাইব্রেরীর কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত (লাইব্রেরী বুলেটিন, জুন, ১৯৪৮)।

সভাপতি, দুইজন সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, সহঃ সম্পাদক, লাই-ব্রেরীয়ান, দুইজন সহঃ লাইব্রেরীয়ান, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব পরীক্ষক ও আরো এগারো জন সদস্যকে নিয়ে লাইব্রেরীর বর্তমান কর্ম-পরিষদ গঠিত। লাই-ব্রেরীর বর্তমান সভাপতি শ্রীনলিনীনাথ মিত্র, সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ, আর লাইব্রেরীয়ান শ্রীসুবোধচন্দ্র চৌধুরী। লাইব্রেরীর আজীবন সদস্যদের আড়াইশো টাকা চাঁদা দিতে হয়, আর সাধারণ সদস্যদের দেয় চাঁদা ছয় আনা ও জমা পাঁচ টাকা। লাইব্রেরীর কিশোর-সদস্যদের মাসিক চাঁদা চার আনা, আর দুই টাকা জমা দিতে হয়। ভারতী পরিষদের বর্তমান পুস্তক-সংখ্যা সাধারণ বিভাগে ইংরেজী ও বাংলা মিলিয়ে ১২,৪০৬ খানা, আর কিশোর বিভাগে ১২১১ খানা। পাঠাগারে সাধারণের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুবন্দোবস্ত আছে। পাঠাগারে রক্ষিত ইংরেজী বাংলায় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যা তেইশখানা। কিশোর-পাঠ্য মৌচাক, শিশুসাথী ও শুকতারা পাঠাগারে রাখা হয়।

বর্তমানে ভারতী পরিষদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। লাইব্রেরীতে কলকাতা কর্পোরেশনের ২৪২৲ টাকা করে বার্ষিক অর্থ সাহায্য রয়েছে, আর ১০০৲ টাকা করে দিচ্ছেন ফুটবল এসোসিয়েশন।

[১৬-৩-৫২]

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের কথা মনে হলেই একসঙ্গে ভীড় করে আসে নামের রাশি, মনের সামনে এসে দাঁড়ায় প্রতিভা-দীপ্ত মূর্তি সব! কেন এমন হয় জানিনে, যেন ওঁদেরই আত্মা ইনষ্টিটিউটের ভেতর দিয়ে রূপ পেয়ে জেগে উঠেছে। ইনষ্টিটিউটের কথা ভাবলেই মনের দুয়ারে সবাই এসে মারেন, এক এক করে নয়, একসঙ্গে। দু' একজন বাদে তাঁদের কারুকেই উঁকি দেখবার সৌভাগ্য হয় নি ; কিন্তু মনের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে তাঁদের জানাজানি হয়ে গেছে। চোখের অচেনা মূর্তিগুলো মনের মোটেই অচেনা নয়, মনের পর্দায় তাঁদের জীবন্ত প্রতিকৃতি অতি স্পষ্ট আঁকা হয়ে গেছে নাম-না-জানা কোন্ এক মাহেন্দ্রক্ষণে। অতি-পরিচিত আত্মীয়তায় একসঙ্গে ভীড় করে এসে দাঁড়ান তাঁরা—সুরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, সার গুরুদাস, আনন্দমোহন, মহেন্দ্রলাল, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ, ভাই প্রতাপচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রেভাঃ কালীচরণ, রিজলে, উইলসন, কামিং, মার্টিন, উডবার্ণ, ফ্লেচার, বেকার, লিওন, লি, টোমারী, রবীন্দ্রনাথ, শিশির ভাদুড়ী—এক কথায় দেশী-বিদেশী শিক্ষাব্রতী আর প্রতিভাবান যাঁরাই উনবিংশ শতকের শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন, আর বিংশ শতকের প্রেরণা যুগিয়েছেন যাঁরা সবাই। আসল কথা, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের ভেতর একটা সাংস্কৃতিক সত্তা ফুটে উঠেছিল সেদিন, আর সেটা জনকতক মানুষরূপে ধরা পড়েছে, এ ছাড়া ইনষ্টিটিউটের আর কোন পৃথক সত্তা নেই। অর্থাৎ ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব সত্তা বলে যদি কিছু থেকে থাকে, এঁদের ভেতর দিয়েই তা রূপ পেয়ে ফুটে উঠেছে, এঁদের ভেতর দিয়েই হয়েছে সে সত্তার পূর্ণ প্রকাশ। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট বলতে একটা বাড়ী বোঝায় না, যাঁদের ভেতর দিয়ে এর সত্তা রূপ পেয়েছে, যে মানুষদের ভেতর ফুটে উঠেছে এর মর্মের বাণী, প্রকাশিত হয়েছে এর নিগূঢ় আত্মা, তাঁদেরকেই বোঝায়।

১৮৫৭ সাল থেকে কলকাতা ইউনিভার্সিটি চলছে। বাইরে থেকে দলে

দলে ছাত্রেরা এসে হারিয়ে যাচ্ছে কলকাতার জনসমুদ্রে, তলিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য প্রলোভনের পঙ্ক-পাপে,—দেশের যাঁরা চিন্তাশীল, তাঁদের এটা ভাবিয়ে তুললো। ওদের নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে সামাজিক পরিবেশের। স্কুলে নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তনের সরকারী চেষ্টা চলতে লাগলো। (ডিসেম্বর, ১৮৮৭ ও আগষ্ট, ১৮৮৯-এর প্রস্তাব)। এদিকে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৯০ সালে ছাত্রদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য চারটি বক্তৃতার আয়োজন করলেন, আর সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাই প্রতাপচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন। এটাকেই সূচনা বলে ধরা যায়। তারপর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছাত্রদের নৈতিক শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার কথা ভাবতে লাগলেন, আলাপ-আলোচনায় যোগ দিলেন ইউরোপীয় শিক্ষা-ব্রতীরাও। ১৮৯১ সালের ১৩ই আগষ্ট এ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম সভার অধিবেশন হয় সংস্কৃত কলেজে, তাতে বিভিন্ন কলেজের ৩১ জন ছাত্র প্রতিনিধি যোগ দিলেন, আর যোগ দিলেন সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এইচ লি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রেভাঃ জে এডওয়ার্ড, রেভাঃ এ পি বেগচ, রেভাঃ এইচ ষ্টিফেন, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ সুধীবৃন্দ। সে সভার সভাপতিত্ব করলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। যুবকদের নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য 'সোসাইটি ফর দি হাইয়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন' নামে প্রতিষ্ঠান গঠিত হল, আর তার নৈতিক বিভাগের ভার নিলেন প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার আর ব্যায়মে বিভাগের ভার মিঃ এইচ লি ও সাহিত্য বিভাগের ভার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হল।

আনুষ্ঠানিকভাবে সোসাইটির আরম্ভ হল ১৮৯১ সালের ৩১শে আগষ্ট। সভা ডাকা হল কলকাতা টাউন হলে আর সভাপতি হলেন বিচারপতি টোটেন হাম। সে সভায় কলকাতার ছাত্ররা এবং সমাজপতিরা উপস্থিত ছিলেন। সোসাইটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বক্তৃতা দিলেন টোটেন হাম, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ১৮৯১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সিনেট হলে এক সাধারণ অধিবেশনে সোসাইটির গঠনতন্ত্র রচিত হল। স্থায়ী সভাপতি হলেন মিঃ এইচ এইচ রিজলে, আর সম্পাদক

হলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ঠিক হল সভ্যদের বার্ষিক আট আনা করে চাঁদা দিতে হবে। কলকাতা ইউনিভার্সিটির ১৮৯২ সালের সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলার বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন সোসাইটির উল্লেখ করে বললেন, এর নিজস্ব বাড়ী চাই, আর লাইব্রেরী, পাঠাগার ও খেলার মাঠেরও প্রয়োজন। বড়লাট নিজে সোসাইটিকে কাজ আরম্ভ করবার জন্য ৫০০০৲ টাকা দিলেন। সে বৎসরই বাংলা সরকার হিন্দু স্কুলে একখানি ঘরের ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করলেন আর ১৮৯৩ সালের এপ্রিল থেকে সোসাইটির খরচ বাবদ মাসিক ১০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করলেন।

প্রথমে সার গুরুদাস নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে ছাত্রদের মেলা-মেশার সুযোগ করে দেন। তারপর ছোটলাট ইলিওটের আহ্বানে বেল-ভেডিয়ার প্রাসাদে মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের 'মরকত কুঞ্জ' উদ্যানে আর ছোট-লাটের আমন্ত্রণে ষ্টীমার পার্টিতে ছাত্ররা মেলামেশার সুযোগ পায়। দেখতে দেখতে সোসাইটির কাজ বেড়ে চলে, ১৮৯৩ সালে মনীষীদের দ্বারা অনেকগুলো বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এদিকে খেলাধূলারও প্রসার হতে থাকে। মার্কাস স্কোয়ারে সোসাইটির খেলার মাঠ তৈরী হয়, তাতে মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৫০০০৲ টাকা দান করেন। কাশীমবাজারের মহারাণী স্বর্ণকুমারীর বদান্যতায় টেনিস গ্রাউণ্ড তৈরী হয় কলেজ স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে। ব্যায়ামাগারের কাজ রীতিমতো চলতে থাকে ও ১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন নামে সোসাইটির মুখপত্র ইংরেজী মাসিক বের হতে আরম্ভ হয়।

সোসাইটির এতোবড় নাম অনেকেরই পছন্দ হয়নি। ১৮৯৬ সালের ১৫ই আগষ্ট এক সাধারণ সভায় সোসাইটির নাম বদলের প্রস্তাব আনা হ'ল। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের নাম-বদল প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন সার গুরুদাস। শেষ পর্যন্ত 'সোসাইটি ফর দি হাইয়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন' নামের বদলে এর নূতন নাম রাখা হ'ল—'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট।'

ইনষ্টিটিউটের কার্য চলতে থাকে প্রথমে সার গুরুদাস, ডাঃ উইলসন, রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার আশুতোষ, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের পরিচালনাধীনে। সাহিত্য ও

নাট্য বিভাগের কাজও আড়ম্বরের সঙ্গে চলতে থাকে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় ১৮৯১ সালে। রবীন্দ্রনাথ এখানে 'গান্ধারীর আবেদন', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' প্রভৃতি লেখা পাঠ করেন আর এখান থেকেই তাঁকে বুঝবার চেষ্টারও আরম্ভ হয়। ১৮৯৯ সালে ইনষ্টিটিউটে অভিনীত হয়—'মেঘনাদ বধ' ও 'জুলিয়াস সিজার'। পরবর্তীকালে এই ইনষ্টিটিউটই বাংলা দেশের মঞ্চশিল্পে যুগান্তর এনেছে, এখান থেকেই বেরিয়ে গেছেন শিশিরকুমার আর নরেশ মিত্রের মতো কুশলী নট। এ উপলক্ষে ইনষ্টিটিউটের নাট্য শিক্ষক অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর নাম করতে হয়। ইনষ্টিটিউটে অভিনীত অসংখ্য নাটকের সাফল্যে তাঁর অবদানের কথা ভোলা যায় না। 'মেঘনাদ বধে'র উদ্বোধনকালে রাজা প্যারীমোহন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'জাতীয় রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে ইনষ্টিটিউট'; হয়তো তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতো, কিন্তু স্বাধীন ভারতে 'জাতীয় রঙ্গালয়' কোথায় ?

১৯০৮ সালে 'ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডারে'র প্রতিষ্ঠা দুঃস্থ ছাত্রদের জন্যে ইনষ্টিটিউটের উল্লেখযোগ্য অবদান নিঃসন্দেহ। এর জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন অঘোরনাথ ঘোষ, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি অনেকেই। ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডারের তহবিল ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর চেষ্টায়ই গড়ে ওঠে, তহবিল সংগ্রহের চেষ্টার তাঁর বিরাম ছিল না। বর্তমানে সে তহবিলের ২২০০০৲ টাকা সরকারে লগ্নী রয়েছে, আর তার সুদ থেকে দরিদ্র ছাত্ররা সাহায্য পেয়ে আসছে।

প্রথম থেকেই ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব বাড়ীর প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের বর্তমান বাড়ীর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসরের চেষ্টার এক বিচিত্র ইতিহাস। ১৯১০ সালের এক বিকেলের কথা। অমূল্যরতন চক্রবর্তী, শিশির ভাদুড়ী, জ্ঞানপ্রিয় মিত্র, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ ঘোষ প্রভৃতি ইনষ্টিটিউট গৃহের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আসর জমিয়ে বসেছেন। এমন সময় বিদেশী পর্যটকের ছদ্মবেশে সেখানে এলেন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি ইনষ্টিটিউটের বিষয় জানতে চাইলেন, আর সবাই অতি-উৎসাহে তাঁকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখালেন। তাতে স্থানাভাবের কথা চাপা রইলো না, কারণ অল্প দিনের ভেতরই ছদ্মবেশের মুখোসও খসে

পড়লো লেডি হার্ডিঞ্জের দু' হাজার টাকার এক চেকে আর ছোটলাট লর্ড কারমাইকেলের আমন্ত্রণে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ৩,৩১,৭০৭৲ টাকায় ইনষ্টিটিউটের বর্তমান বাড়ী নির্মিত হয়েছে ১৯১৬ সালে। এই টাকা আদায় ব্যাপারে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তারপর দেশবাসীর বদান্যতায় বর্তমান বাড়ী সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। গৃহ-প্রবেশ উৎসবে দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল ১৯১৬ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে। ১৯৪১ সালে ইনষ্টিটিউটের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হবার কথা ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তা স্থগিত রাখা হয়। ১৯৫১ সালে ইনষ্টিটিউটের হীরক জয়ন্তী উৎসব সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশস্ত গৃহে ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরী আর পাঠাগারের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ৮,৮১১ খানা। তার ভেতর স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ১,৪৬৩ খানা বই লাইব্রেরীতে দান করেছেন। পাঠাগারে সমস্ত দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়, আর তা সকলেই ব্যবহার করতে পারেন; কিন্তু লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পারেন কেবলমাত্র ইনষ্টিটিউটের সদস্যেরা। ইনষ্টিটিউটের সদস্য হতে অন্ততঃ কলেজের ছাত্র হতে হয়, আর সদস্যদের চাঁদা বর্তমানে জুনিয়র সদস্যদের বার্ষিক তিন টাকা ও সিনিয়র সদস্যদের আট টাকা করে। এ ছাড়া বর্তমান কার্যকলাপের ভেতর সেণ্ট জন এম্বুলেন্স বিভাগ ও ব্যায়ামাগারের কাজ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৯ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইনষ্টিটিউটের সভাপতি। তাঁরই চেষ্টায় সমাজসেবা বিভাগের অধীনে পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা আন্দোলন প্রবর্তিত হয়। পাঁচশত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক বেড়িয়ে পড়েন গ্রামে গ্রামে। ২৩৬টি কেন্দ্রে (২৬টি জেলায়) প্রায় ৮০০০ লোককে তাঁরা শিক্ষিত করে তুলেন তিন মাসের ভেতর। তারপর যুদ্ধের সময় সে কাজে ঢিলে পড়ে। বর্তমানে বিভাগীয় সম্পাদক ননী দত্তের অধীনে সে কাজ চলছে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। বিজ্ঞান ভিক্ষুর পদ্ধতিতে শিক্ষা পেয়ে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকেরা কাজে নামছেন, আর ইতিমধ্যে পাড়াগাঁয়ে পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা দেবার জন্য ৩৮টি স্থায়ী কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইনষ্টিটিউটের কাজ

সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে বলা যায়।

অনেকদিন হ'ল কলকাতা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন ইনষ্টিটিউটের হাত হতে ইউনিভার্সিটির হাতে চলে গেছে আর প্রকাশিত হচ্ছে কলকাতা রিভিউ নামে ইউনিভার্সিটির মুখপত্র হিসাবে। এ বছর ৩১শে আগষ্ট ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবসে 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ম্যাগাজিন' নামে এর হবে পুনঃপ্রকাশ। এর জন্যে শ্রীকেশব গুপ্ত (সভাপতি) শ্রীরমেন মজুমদার, শ্রীধীরেন বিশী ও শ্রীননী দত্তকে নিয়ে সম্পাদকীয় মণ্ডলী গঠিত হয়েছে, আর ইনষ্টিটিউটের মুখপত্র হিসেবে এটা বের হবে।

বর্তমানে ইনষ্টিটিউটের সভাপতি হলেন বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক অধ্যক্ষ পি কে বসু, সহকারী সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক আর শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত হলেন ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরীয়ান।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো তুলে দিচ্ছি (১৯শে পৌষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) —"কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদে প্রাঙ্গণ রচনা করিয়াছে। বিদ্যায়তনের ভিতরের সহিত বাহিরের মিলন এইখানেই ; শাস্ত্রিক বিদ্যার সহিত কলাবিদ্যারও মিলন, অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের, নূতন ছাত্রের সহিত পুরাতন ছাত্রের মিলনের এই ক্ষেত্র। এই মিলনে চিত্ত সরল ও বিদ্যা প্রাণবান হইয়া উঠিবে, এই প্রত্যাশা আমার মনে রহিল।"

[১৫-৬-৫২]

সুহৃদ্ লাইব্রেরী

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বাংলা দেশে বিশেষ করে ছাত্রদের ভেতর একটা নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয়। দেশের নেতারা ও শিক্ষিত জনসাধারণ এর প্রতিকারের চিন্তা করতে থাকেন। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের (১৮৯১) ভেতর দিয়ে জাতির নৈতিক মান উন্নয়নের একটা ব্যাপক চেষ্টা চলতে থাকে। সুত্রীবাগান ও কলুটোলা অঞ্চলে "সুহৃদ্ লাইব্রেরী এণ্ড নীতিশিক্ষা প্রদায়িনী সভা" সেই চেষ্টার স্মৃতি হিসেবে আজো বেঁচে আছে আর ভালো-ভাবেই বেঁচে আছে। এরও উদ্দেশ্য ছিল সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও নীতি বিষয়ে জনগণের চরিত্রের উৎকর্ষের সাধন আর এইটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কলকাতা স্বদেশী বস্ত্রের প্রবর্তন করেন কুঞ্জবিহারী সেন, বোম্বে মিল থেকে ধুতি শাড়ী এনে তিনি স্বদেশী বস্ত্রের দোকান করেন। সুহৃদ্ লাইব্রেরী এণ্ড নীতিশিক্ষা প্রদায়িনী সভার উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি এবং ডাঃ এস কে বর্মণ (ডাবুর প্রোডাক্টস), সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ চন্দ্র, রামচন্দ্র সেন ও চণ্ডীচরণ পাল। ওঁরা সবাই তখন ছিলেন যুবক। নীতি-শিক্ষা প্রদায়িনী সভা নামে বিতর্ক সভার পত্তন করলেন ওঁরা কুঞ্জবিহারী সেনের বাড়ীর এক প্রকাণ্ড দালানে ২৮, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে। সঙ্গে সঙ্গেই লাইব্রেরী ও পাঠাগারের কাজও আরম্ভ হ'ল। এখান থেকেই আবার "সুবর্ণ-বণিক যুবক সমিতি"র সৃষ্টি, বর্তমানে যেটা "কলিকাতা সুবর্ণ-বণিক সমাজ" (গণেশচন্দ্র এভেন্যু) নামে পরিচিত হয়েছে।

সুহৃদ্ লাইব্রেরী এণ্ড নীতিশিক্ষা প্রদায়িনী সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন মাণিকলাল দত্ত, বার-এট-ল, প্রথম সম্পাদক ছিলেন কুঞ্জবিহারী সেন আর চণ্ডীচরণ পাল এর প্রথম লাইব্রেরীয়ান হন। সুহৃদ্ লাইব্রেরী দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত লাইব্রেরী ২৮, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে (বর্তমান ৩৩নং) কুঞ্জবিহারী সেনের বাড়ীতেই ছিল। লাইব্রেরীতে তখন বছরে ৮।১০টি সাহিত্য-সভার আয়োজন করা হ'ত, অবশ্য এ নিয়ম বর্তমানেও

চালু আছে। পোড়া সিগারেটের টুকরা টেবিলের ওপর রেখে যার আরম্ভ হয়েছিল, সেটাই আজ পরিণত হয়েছে কলকাতার এক প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরীতে। গোড়ায় অনেকেই বই পত্র দিয়ে লাইব্রেরীকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের ভেতর কুঞ্জবিহারী সেন, ডাঃ এস, কে বর্মণ, হেমলাল দত্ত, হীরালাল দত্ত, ডাঃ বসুদেব দে, আশুতোষ দে, বামাচরণ দত্ত, গগণচাঁদ রায়, মণিমোহন মল্লিক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রমে লাইব্রেরীর কার্যকলাপ বাড়তে থাকায় লাইব্রেরী স্থানান্তরের প্রয়োজন অনুভূত হয় ও ১৯২২ সালের মার্চ মাসে সুহৃদ্ লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয়, ১২, মুরলীধর সেন লেনের ভাড়াটে বাড়ীতে। সেখানে থাকা-কালীন লাইব্রেরীর সর্বপ্রকার অনিষ্টের আশঙ্কাকে প্রতিরোধ করবার জন্যে পাঁচজন সদস্য নিয়ে লাইব্রেরীর এডভাইসরি বোর্ড (উপদেষ্টা সমিতি) গঠিত হয়। তাঁদের হাতে দেওয়া হয়েছিল অসীম ক্ষমতা, তাঁদের সিদ্ধান্তই ছিল লাইব্রেরী ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত। সাত বছর পরে প্রয়োজন শেষ হ'তে এটা আপনা থেকেই উঠে গেছে। তারপর ১৯৩৩ সালের মে মাসে লাইব্রেরী সেখান থেকে উঠে আসে ৫নং চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর ভাড়াটে বাড়ীতে। এই সময় (১৯৩৫ সালে) সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সুহৃদ্ লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন। অসুবিধা হওয়ায় এখান থেকে লাইব্রেরী ১২১নং চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর বর্তমান ভাড়াটে বাড়ীতে উঠে আসে ১৯৪২ সালের ২৮শে নভেম্বর। সুহৃদ্ লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর জন্য 'গৃহ নির্মাণ তহবিল' নামে একটি তহবিল খোলা হয়েছে। সুহৃদ্ লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এম-এল-এ ও কবিবর রসময় লাহার নিঃস্বার্থ সেবা সত্যি প্রশংসা করবার মতো।

সুহৃদ্ লাইব্রেরীতে অনেকগুলো স্মৃতি সংগ্রহ রয়েছে। প্রিয়জনের স্মৃতি রক্ষার্থে এই সমস্ত মূল্যবান পুস্তক-সংগ্রহ লাইব্রেরীতে দান করেছেন তাঁদের আত্মীয়েরা। এর ভেতর (১) দয়াল মেমোরিয়েল বুকশেলফ—ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থের সংগ্রহ, (২) বটকৃষ্ণ মেমোরিয়াল বুকশেলফ—জাতীয় জীবনের উন্নতি বিষয়ে বইপত্র, (৩) স্বর্ণময়ী মেমোরিয়েল বুকশেলফ ও (৪) নন্দরাণী মেমোরিয়েল বুকশেলফ—ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ও (৫) নীলমাধব মেমোরিয়াল বুকশেলফ—গেজেটিয়ার্স

পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য পুস্তক ও দলিলপত্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লাইব্রেরী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দাঙ্গার আগে সুহৃদ্ লাইব্রেরীর সদস্য ছিলেন ৩৭০ জন, আজো লাইব্রেরীর সদস্য-সংখ্যা সেটায় পৌছায়নি। বর্তমানে লাইব্রেরীর মোট সদস্য-সংখ্যা ২৯৭। পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিলে লাইব্রেরীর আজীবন সদস্য হ'তে পারা যায়। সাধারণ সদস্যদের তিনটি শ্রেণী আছে। এক সঙ্গে ১ খানা বই নিতে পাঁচ আনা চাঁদা ও তিন টাকা জমা দিতে হয়। এক সঙ্গে ২ খানা বই নিতে মাসিক চাঁদা দশ আনা আর জমা পাঁচ টাকা। আর যাঁরা এক সঙ্গে তিনখানা বই নেন, তাঁদের মাসিক এক টাকা করে চাঁদা দিতে হয় আর জমা রাখতে হয় দশ টাকা। সুহৃদ্ লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি ডাঃ বিনয়কৃষ্ণ পাল. সম্পাদক শ্রীদীননাথ মল্লিক, সলিসিটর আর শ্রীগোপীনাথ নন্দী এম-এ, বি-এল হচ্ছেন লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান। একেবারে গোড়ার দিক থেকেই লাইব্রেরীতে 'শিশু বিভাগ' রয়েছে।

সুহৃদ্ লাইব্রেরীর পাঠাগারে সাধারণের পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পাঠের সুব্যবস্থা আছে, সেখানে দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা প্রায় সব কটাই রাখা হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ১০,৭৭৬ খানা। এ ছাড়া লাইব্রেরীতে অসংখ্য পুরাতন গেজেটিয়ার্স পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য, দলিলপত্র, ম্যাপ ও পুরাতন সাময়িক পত্রিকা রয়েছে। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে বঙ্গদর্শন (মূল), রহস্য সন্দর্ভ (সংবৎ ১৯১৯), ধর্মতত্ত্ব (শকাব্দা ১৭৬৩), তত্ত্ববোধিনী (শকাব্দা ১৭৯৪), বিবিধার্থ সংগ্রহ (শকাব্দা ১৭৭৯), বামাবোধিনী, জন্মভূমি, প্রদীপ, নবজীবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একেবারে আরম্ভের থেকে বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা লাইব্রেরীতে আছে। পত্র-পত্রিকার দিক দিয়া সুহৃদ লাইব্রেরী সত্যি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এ ছাড়া প্রচুর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আর ইংরেজী-বাংলা রেফারেন্সের বই আছে লাইব্রেরীতে। পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্রের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আর হাতে লেখা কবিরাজী পুঁথি, অন্নদামঙ্গল পুঁথি (অন্নপূর্ণা-মঙ্গল) প্রভৃতি অনেক পুঁথি এখানে রয়েছে। দুষ্প্রাপ্য বই-এর ভেতর (১) পপুলার এডুকেশন, ৮ খণ্ড, (২) ইন্টারন্যাশনাল লাইব্রেরী অব ফেমাস লিটারেচার ২০ খণ্ড, (৩) ইম্পিরিয়াল গেজেট অব

ইণ্ডিয়া ১৮ খণ্ড, (৪) বেঙ্গল গেজেটিয়ার্স ১৫ খণ্ড, (৫) দি আউট-লাইন অব নোলেজ ২০ খণ্ড, (৬) ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' (৭) রামাই পণ্ডিতের 'শিবায়ন', (৮) দুর্গাচরণের 'জীবনমুক্তি বিবেক', (৯) মহেশের 'বেদান্ত দর্শন', (১০) দুর্গাচরণের 'দিগদৃশ্য বিবেক' (১১) সর্বদানি সংগ্রহ, (১২) সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ, (১৩) শুক্রনীতি, (১৪) তুর্কীর ইতিহাস, (১৫) 'পাঁচালী'—দাশু রায়, রসিক রায়, (১৬) তোতা ইতিহাস, (১৭) 'পদকল্প লতিকা'—গোবিন্দ দাস, (১৮) বিদ্যাকল্পদ্রুম, (১৯) মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (২০) অক্ষয় দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ, (২১) মৃত্যুঞ্জয় শর্মার 'বাজাবলী', (২২) উমাচরণ মিত্রের গোল-বেকাঅলি' প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে এ লাইব্রেরীতে। গবেষণাকার্যে সুহৃদ্ লাইব্রেরী সত্যি অপরিহার্য। এতো অধিক সংখ্যক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একত্র সমাবেশ কচিৎ চোখে পড়ে।

সুহৃদ্ লাইব্রেরীতে একটি 'অধ্যয়নমণ্ডলী' বা 'ষ্টাডি-সারকল' আছে। তাঁদের চেষ্টায় লাইব্রেরীর বর্তমান সহঃ সভাপতি শ্রীগোপালচন্দ্র সেন, কাব্যবিনোদ প্রণীত 'দর্শন পরিচয়' নামক ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ওপর লেখা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই 'অধ্যয়নমণ্ডলী' প্রশংসাযোগ্য কাজ করে চলেছেন নিঃসন্দেহে।

[৩১-৮-৫২]

বেণেপুকুর লাইব্রেরী

১৮৯১ সালে ৩২নং জাননগর রোডের এক ভাড়াটে বাড়ীতে 'বেণেপুকুর লাইব্রেরী এণ্ড রিডিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন রমানাথ দে, গণপতি দে, বেচারাম পাল, বেচুলাল দাস, হরিপদ দে, অমূল্যচরণ ঘোষ, মোক্ষপদ দে ও মন্মথনাথ আঢ্য প্রভৃতি পাড়ার যুবকবৃন্দ। দেখতে দেখতে জনসাধারণের এককালীন দান ও চাঁদায় লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে পরিচালকদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় ও ১৮৯৫ সালের শেষের দিকে লাইব্রেরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রমানাথ দে লাইব্রেরীর আসবাব ও জিনিসপত্র ২৫।১, জাননগর রোডে নিজের বাড়ীর একখানা ঘরে বন্ধ করে রেখে দেন ও যাতে এসব নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। অবশ্য এমন ক্ষয়-ক্ষতি এ লাইব্রেরীকে বার বার সহ্য করতে হয়েছে, আর তাতে করেই গড়ে উঠেছে লাইব্রেরীর এক বিচিত্র ইতিহাস।

লাইব্রেরী বন্ধ হ'ল বটে, কিন্তু সভ্যদের মনের ভেতর ক্ষোভ বেড়ে চললো, কাঁহাতক আর তাস পিটে সময় কাটানো যায়। শ্রীবেচুলাল দাস, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র (এঁরা এখনো জীবিত), রাজকুমার দাস ও তিনকড়ি ঘোষ এক রবিবার তাস খেলে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা লাইব্রেরী পুনর্গঠনের প্রস্তাব করলেন ৩৬নং বেণেপুকুর রোডের নারায়ণচন্দ্র দত্তের নিকট। নারায়ণবাবু তাঁর বৈঠকখানার উত্তর দিকের ঘর বিনা ভাড়ায় দিয়ে দিলেন আবার লাইব্রেরী চালু করতে। এদিকে রমানাথ দে-ও গ্রন্থাগারের জিনিষপত্র ফিরিয়ে দিলেন খুসি মনে। ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের এক রবিবারে 'বেণেপুকুর লাইব্রেরী এণ্ড রিডিং ক্লাব'-এর কাজ আবার আরম্ভ হ'ল। এ সময় কলকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয় ও প্লেগ অফিসার ডাঃ হোসাক লাইব্রেরীতে তাঁর অফিস করেন; ফলে বেণেপুকুর লাইব্রেরীর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পাড়ার জমিদার জ্যোতিপ্রসাদ গাঙ্গুলী (চিত্রশিল্পী যামিনী গাঙ্গুলীর পিতা) ছিলেন এ লাইব্রেরীর প্রথম সম্পাদক, তারপর তাঁর ভাই ইন্দুপ্রকাশ গাঙ্গুলী

সম্পাদক হন। ইন্দুবাবু অল্পদিনের ভেতর মারা যাওয়ায় লাইব্রেরীর সম্পাদক হ'লেন শ্রী পি এন আঢ্য (রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য)। এ সময় লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন লেঃ গভর্ণর সার হেনরি কটন-এর পুত্র ব্যারিষ্টার এইচ ই এ কটন আর সহঃ সভাপতি ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এম, এন, সোম (প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের পারসোন্যাল এসিষ্ট্যান্ট)। এঁদের প্রভাবে লাইব্রেরীটির দ্রুত উন্নতি হ'তে থাকে। বিশেষ করে মিঃ কটন ও শ্রী আঢ্যের চেষ্টায় হায়দ্রাবাদের নিজাম, আর বর্ধমান, দ্বারভাঙ্গা, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির রাজা-মহারাজা-নবাবদের নিকট থেকে লাইব্রেরীতে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (নবপ্রকাশিত) কেনবার জন্য টাকার দরকার ছিল তখন, তা কেনা হ'ল। এসময়ে বেণেপুকুর লাইব্রেরী নানাভাবে উন্নত হয়ে ওঠে সকলের সমবেত চেষ্টায়।

শ্রী পি, এন, আঢ্যের পর লাইব্রেরীর সম্পাদক হন সুরেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্পাদক হিসেবে বহুদিন তিনি লাইব্রেরীর সেবা করে গেছেন। তাঁরই সময় ১৯৩০ সালের জুন মাসে লাইব্রেরীর শিশু-বিভাগ স্থাপিত হয়। লাইব্রেরীর শিশু-বিভাগ স্থাপনের ইতিহাসে এটা প্রাচীনতার দাবী করতে পারে। এই শিশু-বিভাগ লাইব্রেরী ঘরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ২৫নং জ্ঞাননগর রোডে পূর্ণচন্দ্র দে'র বাড়ীর পথের ধারের একখানা ঘরে আরম্ভ হয়। এর প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন গুণেন্দ্রকুমার রায়, পবিত্রকুমার দে ও সুশীলকুমার দে প্রভৃতি সভ্যবৃন্দ। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আরম্ভে এ বিভাগে একটি আলমারী দান করেন আর পৃথক বাড়ীতে কার্যকলাপ চলতে থাকায় এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৪ সালে শিশু-বিভাগ ২৫নং জ্ঞাননগর রোড থেকে ৫১ নং বেণেপুকুর রোডে বেণেপুকুর ইনষ্টিটিউটে উঠে আসে ও সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয় ২৪নং জ্ঞাননগর রোডে পবিত্রকুমার দে'র বাড়ীতে।

১৯৪৬ সালের ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এ লাইব্রেরীর সভাপতি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ বিনয়কুমার সরকার, জনাব হুমায়ুন কবীর, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, বেচুলাল দাস, কলকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান ডেপুটি মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

(বর্তমানে লাইব্রেরীর সভাপতি) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি থাকাকালে ১৯৩৮ সালের ১০ই মে লাই-ব্রেরী রেজেষ্টারী করা হয় আর লাইব্রেরীর অছি নির্বাচিত হন নলিন প্রকাশ গাঙ্গুলী, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জিতেন্দ্রনাথ দত্ত।

বহুদিন ধরে লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর অভাব অনুভূত হ'তে থাকে। ভলকান আয়রণ ওয়ার্কস কোঃ দেউলে হবার পর মাত্র দু' হাজার টাকায় ১৫নং বংশী দত্ত রোডে লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহের জন্য দু' কাঠার কিছু বেশী জায়গা কেনা হয় ১৯৩৮ সালের মে মাসে। এর এক হাজার টাকা দান করেন নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় আর বাকি ১০০০৲ টাকা সুরেন্দ্রনাথ দত্ত লাইব্রেরীকে ধার দেন। পরে অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁকে এ টাকা জনসাধারণের কাছ থেকে তুলতে হয়েছে। বিশেষভাবে সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্যদের চেষ্টায় এই জমিতে লাইব্রেরী গৃহের ভিত্তি পর্যন্ত তৈরী হয়। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে উঠে, জিনিষপত্রের অভাবে কাজ আর এগোতে পারেনি। বর্তমানে গৃহ-নির্মাণ তহবিলে প্রায় ৬০০০৲ টাকা জমা আছে, আরো টাকা সংগৃহীত না হ'লে গৃহ-নির্মাণ কার্যে হাত দেওয়া সম্ভব নয়।

কলকাতার ওপর দিয়েও বর্বরতার একটা তরঙ্গ বয়ে যায় ১৯৪৬ সালের ১৬ই আর ১৭ই আগষ্টের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। পর বৎসর বেণেপুকুর লাইব্রেরীর সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব, তারি তোড়জোড় চলছে তখন। পঞ্চাশ বৎসরের সমৃদ্ধ লাইব্রেরীর এই দু' দিনের বর্বরতায় সর্বনাশ হয়ে গেল, অসংখ্য মূল্যবান পুস্তক আর আসবাবপত্র লুণ্ঠিত হলো—হলো ভস্মসাৎ। অরাজকতার শেষ যখন হলো তখন লাইব্রেরীর চিহ্ন আর কোথাও রইলো না। পঞ্চাশ বৎসর ধরে তিলে তিলে সংগৃহীত রাশি রাশি সম্পদের সমাধি রচিত হ'ল বর্বরতার মহাশ্মশানে। এর ভেতর থেকে আশ্চর্যভাবে শিশু-বিভাগের ১২০০ বই আর তিনটে আলমারী বেঁচে গেছে। দুটো আলমারী পরে পাওয়া গেছে শিয়ালদায় কোলে মার্কেটের দ্বিতলে আর অপর আলমারী ও বই পাওয়া গেছে বালীগঞ্জে নির্মলকুমার দাঁর বাড়ীতে। নির্মলকুমার দাঁ ও দেবেন্দ্রনাথ দে ছাড়া আর কারা এই স্থানান্তরে সাহায্য করেছিলেন সে বিষয় চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারা যায় নি।

বেণেপুকুর লাইব্রেরী

দেশ বিভাগ হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর এ অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীরা ফিরে আসতে লাগলেন। ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারের ভূতপূর্ব সম্পাদক সুরেন্দ্রকুমার দত্তের মৃত্যু হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ৬ই জুনের সাধারণ সভায় শ্রীসুশীলকুমার দে'কে লাইব্রেরীর সম্পাদক নিযুক্ত করে তাঁর ওপর লাইব্রেরী পুনর্গঠনের ভার দেওয়া হ'ল। নির্মলকুমার দাঁ তাঁর ৭নং বেণেপুকুর রোডের বাড়ীর একখানি ঘর লাইব্রেরীকে দিলেন। লাইব্রেরী আবার আরম্ভ হ'ল, বিশেষভাবে শিশু-বিভাগ। অধুনালুপ্ত ২০ নং পল্লী-স্বাস্থ্য সমিতি তিনটে আলমারী ও তাঁদের সমুদয় আসবাবপত্র দিয়ে দুর্দিনে লাইব্রেরীকে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

১৯৫০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ২৩ নং ক্রিমোটোরিয়াম ষ্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ীতে আসবাবপত্র সহ বেণেপুকুর লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয়। সে সময় শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় একখানা বড় টেবিল লাইব্রেরীকে দান করেন আর আসবাবপত্র মেরামত ও পালিশ করবার খরচও বহন করেন তিনি নিজেই। এ ছাড়া তাঁর কয়েকজন বন্ধুর নিকট থেকে তিনি কয়েক শ' টাকার এককালীন দান সংগ্রহ করে দেন। পাড়ার সকলের সাহায্য এবং সহানুভূতিও পাওয়া যায় সেদিনে।

লাইব্রেরীর পাঠাগারে প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকাই রাখা হয়ে থাকে। এ ছাড়া ৪ খানি শিশু-পত্রিকা রাখা হয় শিশু-বিভাগের জন্যে। দৈনিক গড়ে ৬০ জন পাঠক বর্তমান পাঠাগারে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠ করে থাকেন। বর্তমানে লাইব্রেরীর সভ্য-সংখ্যা ১৬০ মাত্র। সাধারণ সভ্যদের প্রথম ও দ্বিতীয়—এই দুই শ্রেণী। শ্রেণী হিসাবে যথাক্রমে জমা ৫৲ টাকা ও ৩৲ টাকা, মাসিক চাঁদা এক টাকা ও আট আনা আর বই নেবার যোগ্যতা একসঙ্গে দুইখানা ও একখানা। শিশু-বিভাগের সভ্যদের জমা ১৲ টাকা ও মাসিক চাঁদা চারি আনা মাত্র। বেণেপুকুর লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার দে ও শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দে বর্তমানে লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান। পরিচালকমণ্ডলীর প্রত্যেকেই লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য চেষ্টা করে চলেছেন।

[১৪-৯-৫২)

আশুতোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী

১৯৩৫ সালে ভবানীপুর কটেজ লাইব্রেরী আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৫ সালে আশুতোষ লাইব্রেরীর রিপোর্টে দেখা যায়,—"১৯২৪ সালের মে মাসে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মারা যাওয়ার অব্যবহিত পরে দক্ষিণ কলকাতার নাগরিকবৃন্দ এক স্মৃতিসভার আয়োজন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সেই সভায় স্থির হয়. সার আশুতোষের স্মৃতিরক্ষার্থে আশুতোষ স্মৃতি-হল ও লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ-ব্যাপারে ভবানীপুর কটেজ লাইব্রেরী স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কটেজ লাইব্রেরীর পরিচালকবর্গ আশুতোষ লাইব্রেরীর সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ কটেজ লাইব্রেরীই আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে পরিণত হয়েছে। কটেজ লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ী ছিল না। নিজস্ব বাড়ীর জন্য গৃহ-নির্মাণ তহবিল নামে একটি তহবিল স্থাপিত হয়েছিল মাত্র। এদিকে আশুতোষ স্মৃতি-হল ও লাইব্রেরীর গৃহ-নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জায়গার সন্ধান চলতে থাকে। অবশেষে কলকাতা কর্পোরেশন এ জন্য চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সামনে রাস্তার অপর পারে ৯নং রসা রোডে ১০ কাঠা জায়গা দান করেন ও সেখানে বাড়ী নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। এই বাড়ীতেই আশুতোষ কলেজেরও প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে কর্পোরেশন জায়গার পরিমাণ আরো ২৪ কাঠা বাড়িয়ে দেন। লাইব্রেরী ১৯৩৫ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ৩৮।এ, আশুতোষ মুখার্জী রোডের বাড়ীতেই ছিল। ১৯৩৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ৯নং রসা রোডের আশুতোষ স্মৃতিসৌধের উত্তর দিকের ব্লকে লাইব্রেরী উঠে আসে। বর্তমানে এই বাড়ীতেই কলেজ, স্মৃতি-হল ও লাইব্রেরী অবস্থিত।"

কটেজ লাইব্রেরীর গোড়ার দিকের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়।

ভবানীপুর উন্নত এলাকা। প্রথম থেকেই এখানে অভিজাত বাঙালীদের বাস। আগে এটা কলকাতার বাইরে দক্ষিণ সীমায় পড়তো। তখনকার

দিনে সার্কুলার রোড় পর্যন্ত ছিল কলকাতার সীমানা। আজো যখন কেউ ভবানীপুর থেকে চৌরঙ্গী বা ধর্মতলায় আসে, বলে—"কলকাতায় যাচ্ছি।"

১৮৮০ সাল থেকেই 'কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর' পতন হতে থাকে আর উত্তর ও মধ্য কলকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে আরম্ভ হয়। 'কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী'ই তখন সহরের একমাত্র লাইব্রেরী ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র ছিল। ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে উত্তর কলকাতায় কয়েকটি বড় বড় সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। সেই লাইব্রেরী আন্দোলনের ঢেউ দক্ষিণ কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলেও পৌঁছেছিল। বাংলা দেশে তথা সমস্ত ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনও তখন একটা সুষ্ঠু রূপ পেয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। দিগ্বিদিক প্রবাহী জাতির কর্ম-প্রতিভা তখন জাগ্রত, নানা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করেছে। সুপ্ত জাতি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে তখন—তার নাড়ীতে রক্তের জোয়ার, চোখে গড়ে তোলবার স্বপ্ন। এ সেই ১৮৯১ সালের কথা।

১৮৯১ সালের ২৫শে মে, ১২৯৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ভবানীপুরে ৪।১, বলরাম বসু লেনে কটেজ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোট ঘরে ছোট লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছিল বলেই হয়তো এর নাম রাখা হয়েছিল কটেজ লাইব্রেরী। কটেজ লাইব্রেরী বলতে ছোট লাইব্রেরীও বোঝায় না, কুঁড়ে ঘরও বোঝায় না। আরম্ভে সব লাইব্রেরীই ছোট থাকে; একদিনেই কিছু কর্মপরিধি বেড়ে ওঠে না, কিংবা মস্ত বড় ঘরেও কিছু আরম্ভ হয় না। কাজেই ছোট বলেই বা কুঁড়ে ঘরে আরম্ভ হ'ল বলেই এর নাম 'কটেজ লাইব্রেরী' রাখা হয়েছিল, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, আর গোড়ায় এর পেছনে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি; কাজেই মনে হয় শুধু বিনয় প্রকাশই এ-নাম রাখার উদ্দেশ্য হতে পারে না। এই "কটেজ লাইব্রেরী" নামের পেছনে একটা ইতিহাস বা বিশেষ অর্থ এর একটা কিছু ছিল, যা আজ অনুমান করা ছাড়া আর বের করবার কোন উপায় নেই। হয়তো এইরূপ ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই একটা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন এর উদ্যোক্তারা দেখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত যা কার্যে পরিণত হয়নি কিংবা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য এ নামের অন্য

কোন কারণও থাকতে পারে।

যাহোক, এর উদ্যোক্তারা দেখেছিলেন দক্ষিণ কলকাতায় কোন লাইব্রেরী নেই। সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে লাইব্রেরী একটা গড়ে তুলতে হবে। লাইব্রেরী গড়ার ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যেমন পাড়ার বা অঞ্চলের ছেলেদের খেয়ালই উদ্যোগপর্বে দেখা যায়, এখানে কিন্তু তার ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া গেলো। কটেজ লাইব্রেরীর উদ্যোক্তাদের ভেতর প্রিয়নাথ মল্লিক (কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও লাইব্রেরীর সভাপতি), নগেন্দ্রনাথ মিত্র (লাইব্রেরীয়ান), রাজযোগেশ্বর মিত্র, নৃসিংহচন্দ্র মিত্র (সম্পাদক) প্রভৃতি পদস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিগণ ছিলেন। লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন। ভবানীপুর লিটারারী সোসাইটি নামে লাইব্রেরীর বিতর্ক সভারও চারদিকে বেশ নাম ছিল। এ ছাড়া লাইব্রেরীর নাট্যাভিনয় বিভাগ ও সমাজ সেবা বিভাগও ছিল। কটেজ লাইব্রেরীর সমাজ সেবা বিভাগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও সম্পাদকত্ব করে গেছেন। গোড়ার দিকে সার রমেশচন্দ্র মিত্র লাইব্রেরীকে যে দেওয়াল ঘড়ি দান করেছিলেন, গত বৎসর (১৯৫১) সেটি চুরি হয়ে গেছে। একেবারে আরম্ভের দিকে (কার্যবিবরণী, ১৮৯৪) কটেজ লাইব্রেরীর শুভানুধ্যায়ীদের ভেতর কোচবিহারের মহারাজা ভূপবাহাদুর, কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী, এইচ ই এ কটন, সার আশুতোষ, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ, আর ডি মেটা, আর এন রায়, বাবু কালীচরণ ব্যানার্জী, বহরমপুরের কুমার আশুতোষনাথ রায় প্রভৃতির নাম দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, ১৮৯১ সালের ২৫শে মে ৪।১, বলরাম বসুর লেনের এক কুঁড়েঘরে কটেজ লাইব্রেরীর আরম্ভ হতে পারে, কিন্তু গুরুত্ব তার সেদিন কম ছিল না। একেবারে আরম্ভেই কটেজ লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য কর্মপন্থা যেমন ছিল ব্যাপক, তেমনি তার পেছনে সহানুভূতি ছিল সমাজের উচ্চতম স্তরের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের। ১৮৯৪ সালে লাইব্রেরীতে বই-এর সংখ্যা ছিল বাংলা ১২৫৮ খানা আর ইংরেজী ১০৭৬ খানা। কোচবিহারের মহারাজা ১০০৲ ও মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০৲ টাকা এ সময়ে লাইব্রেরীতে দান করেছিলেন।

দেখতে দেখতে লাইব্রেরীর কাজ বাড়তে থাকে ও ১৮৯৬ সালে লাইব্রেরী ৭২, পদ্মপুকুর রোডে উঠে যায়। এখানে সকাল-বিকাল লাইব্রেরীর কাজ চলতে

থাকে ও সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে থাকাকালীন কটেজ লাইব্রেরীর উদ্যোগে ১৮৯৭ সালের ১৬ই এপ্রিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল। ১৮৯০ সালের কার্য-বিবরণীতে লাইব্রেরীর উপযুক্ত নিজস্ব বাড়ীর কথা ও একটি তহবিল স্থাপনের কথা দেখতে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে পদ্মপুকুরের বাড়ীতে বর্ধিত লাইব্রেরীর স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় লাইব্রেরী ৩০এ, রসা রোডে উঠে যায়; তারপর দেখতে পাওয়া যায় ৩৮।এ, আশুতোষ মুখার্জী রোডের বাড়ীতে। ১৯৩৫ সালে কটেজ লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তিত হয়ে আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯১৫ সালে 'ভবানীপুর ইনষ্টিটিউট' নামক প্রতিষ্ঠান এসে কটেজ লাইব্রেরীর সঙ্গে মিলিত হয় ও লাইব্রেরী "কটেজ লাইব্রেরী ও ভবানীপুর ইনষ্টিটিউট" এই নামে চলতে থাকে।

১৯১৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক (কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান) কটেজ লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন, আর তাঁরই চেষ্টায় সে সময় থেকে লাইব্রেরী কলকাতা কর্পোরেশন থেকে অর্থ-সাহায্য পেতে আরম্ভ করে। ১৯১৭-১৮-১৯ সালেও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককেই লাইব্রেরীর সভাপতি হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন—কটেজ লাইব্রেরীর বেশীর ভাগ রিপোর্টই হারিয়ে গেছে। এর ইতিহাস লিখতে হয়েছে যে দু'চার খানা রিপোর্ট আছে সেগুলোকে ভিত্তি করে আর যাঁরা বহু বৎসর লাইব্রেরীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা আছেন তাঁদের মুখে শুনে। কাজেই এ ইতিহাসকে এই লাইব্রেরীর সম্পূর্ণ সঠিক ইতিহাস বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

১৯১৭-১৮-১৯ সালের রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায়—লাইব্রেরীর গৃহ-নির্মাণ তহবিলে সাহায্যের জন্য ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে লাইব্রেরীর সদস্য-দের দ্বারা 'সরলা' নামক নাটকখানি অভিনীত হয়েছিল, আর তাতে লাভ হয়েছিল খরচপত্র বাদ দিয়ে ৩০০৲ টাকা। সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে গৃহ-নির্মাণ তহবিল গড়ে তোলার সূচনা করা হয়। আরো দেখতে পাওয়া যায় মহাযুদ্ধের অবসানে লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে বিজয়োৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল আর সে উৎসব অনুষ্ঠানে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা হয়েছিল বার শত দরিদ্রনারায়ণকে। এছাড়া

১৯১৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর বিখ্যাত কীর্তনীয়া পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্যের দ্বারা কীর্তনের আয়োজন করা হয়, আর সে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বয়ং। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে যাওয়ার এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়; তাতে প্রতিযোগিগণকে পদক ও পুস্তক উপহার প্রদত্ত হয়েছিল।

আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক সংখ্যা সাড়ে পনেরো হাজার, তাতে পুরাতন সাময়িক পত্রিকা যোগ করলে পুস্তকের সংখ্যা দাঁড়াবে কুড়ি হাজারের মতো। লাইব্রেরীর পাঠাগারে পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠের সুব্যবস্থা আছে আর সেখানে ইংরেজী ও বাংলা প্রায় সবক'টি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাই রাখা হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর সভ্যদের আট আনা করে প্রবেশ মূল্য দিতে হয়। এ ছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী হিসেবে সভ্যদের জমা যথাক্রমে ছয় টাকা ও পাঁচ টাকা, মাসিক চাঁদা বারো আনা ও ছয় আনা আর বই নেবার যোগ্যতা দুইখানা ও একখানা করে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আশুতোষ লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি, শ্রী জে এন মজুমদার বর্তমানের সম্পাদক আর বর্তমানে লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীপঞ্চানন মজুমদার। এ দু'জন গত পঁয়ত্রিশ বৎসর একটানা লাইব্রেরীর সেবা করে চলেছেন।

[২৭-৭-৫২]

মহাবোধি সোসাইটি

আড়াই হাজার বছর আগের কথা। ভারতবর্ষের এক রাণী স্বপ্নে দেখলেন শ্বেত হস্তী, তাঁর গর্ভে জন্মালেন এক কুমার। যৌবনে স্ত্রী-পুত্র আর রাজ্য ছেড়ে তিনি চলে গেলেন বুদ্ধত্ব লাভ করতে, বুদ্ধগয়ায় তপস্যা করে বুদ্ধত্ব লাভ করলেন, তারপর ভগবান তথাগত বুদ্ধ সারনাথে প্রচার করলেন বৌদ্ধধর্ম, সদাচার আর অহিংসায় প্রচার করলেন পরম মুক্তির বাণী। বন্যার মত তা প্লাবিত করলো দেশ-বিদেশ—সিংহল, বার্মা, শ্যাম, মালয়, চীন, জাপান, রাশিয়া, তুরস্ক, মঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া, কলম্বাসের আবিষ্কারের বহু শতাব্দী আগে আমেরিকার মেক্সিকো পর্যন্ত (মিউজিয়াম নিউজ, ওয়াশিংটন, মে, ১৯৪১)। তারপর ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম নির্বাসিত হ'ল। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল এর পর। সেই নির্বাসিত ধর্মকে নিজের দেশে এনে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছে মহাবোধি সোসাইটি।

গোলদীঘির পূর্বধার ঘেঁষে বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট সোজা চলে গেছে উত্তর মুখে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট পর্যন্ত, তারপর কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে পশ্চিমে ঘুরে গেছে। গোলদীঘির পূবে রাস্তার ডান ধারে শ্রেণীবদ্ধ বই-এর দোকান-গুলো দাঁড়িয়ে আছে, দোতলা তিনতলা একঘেয়ে বাড়ীগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে 'মহাবোধি সোসাইটি'—কলকাতার বৌদ্ধ-বিহার শ্রীধর্ম রাজিকা বিহার নাম এর। ছাঁচে ঢালা একঘেয়ে বাড়ীগুলোর সঙ্গে কোনখানেই এর খাপ খায় না। দেখলেই বোঝা যায় এ বাড়ীর গড়ন যান্ত্রিক নয়, শিল্পী-মনের প্রকাশ রয়েছে এর ভেতর; আর দশখানা বাড়ীর থেকে এখানা শুধু আলাদাই নয়, এর মুখে ফুটে রয়েছে গাম্ভীর্যভরা এক আশ্চর্য প্রশান্তি! মনের ওপর হয়তো যুগযুগান্তের সাধনার ছায়া এসে পড়ে, ইচ্ছা হয় একটু দাঁড়িয়ে দেখে নিই। এমনি বহুদিন দাঁড়িয়ে পড়েছি এর সামনে, কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখেছি দেশ-বিদেশের তীর্থ-যাত্রীদের অসংখ্য নূতন মুখ, শুনতে পেয়েছি অসংখ্য অচেনা ভাষার ঝঙ্কার। মনে হয়েছে যেন আমার

ভারতীয় আত্মার বহু পুরাতন স্মৃতি-বিজড়িত সঙ্গী ওরা, বহু জন্ম আগে যেন ওরাই ছিল আমার আপন আর অতি আত্মীয়! তারপর এ বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি অজানা এক আকর্ষণে। আজকালকার একখানা বাড়ী দেখলেই একশোখানা বাড়ী দেখা হয়ে যায় আর এর একশোখানা দেখলেও একখানাই দেখা হয় না; এতো শুধু চোখে দেখা নয়, চোখের সঙ্গে মনের দেখাও যে এখানে মিশে রয়েছে।

জগতের বৌদ্ধদিগের মিলন-তীর্থ—দেবমিত্ত ধর্মপালের এ এক অদ্ভুত কীর্তি। ১৮৯১ সালের সালের ৩১শে মে (বৈশাখ) সিংহলে (কলম্বো) 'মহাবোধি সোসাইটি' প্রথম স্থাপিত হয়েছিল আর কলকাতায় তা' স্থাপিত হয়েছিল তার পর বৎসর ইংরেজী ১৮৯২ সালের মে মাসে, ২২নং বেনিয়াপুকুর রোডে, আর সে সময় থেকেই মহাবোধি জার্ণেল নামে মাসিক পত্রিকাও বের হ'তে থাকে। বেনিয়াপুকুর রোডের ভাড়াটে বাড়ীতে আরম্ভ হলেও তখন ২০-এ, গঙ্গাধর বাবুর লেনে পত্রিকার অফিস ছিল। দেখতে দেখতে সমস্ত জগতে সোসাইটির শাখা স্থাপিত হয়েছে। আজো এর কোন ইতিহাস লেখা হয়নি, মহাবোধি সোসাইটির ইতিহাস এখনো লিখতে হবে।

মহাবোধি সোসাইটির ইতিহাসের সঙ্গে দেবমিত্ত ধর্মপালের জীবন আগাগোড়া জড়িয়ে আছে, আর জড়িয়ে আছে মেরী ফষ্টার নাম্নী হনলুলুর এক আমেরিকান মহিলার নাম। ১৮৬৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর কলম্বোর বিখ্যাত হিউয়াবতণি নামক বৌদ্ধ পরিবারে অনাগরিক ধর্মপালের জন্ম হয়। খুব ধনী আর নামকরা এ পরিবার—এঁরাই ১৮৭৩ সালে বিদ্যোদয় কলেজ স্থাপন করেছিলেন। ধর্মপালের পিতার নাম মুদালিয়ার হিউয়াবতণি আর মাতার নাম মল্লিকা উপাসিকা। সিংহলে তখন খৃষ্টধর্ম প্রচারের ধুম পড়ে গেছে। নিজেদের এতো বড় ধর্ম ছেড়ে লোক বিদেশের মার্কামারা ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ধর্মপালের কাছে এটা অসহ্য মনে হ'তে লাগলো। কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি সরকারী চাকুরী নিলেন, তাঁর মন তখন ধর্মের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কর্মক্ষেত্র যাঁর ব্যাপক, চাকুরী করা তাঁর পোষায় না। থিওসফিক্যাল সোসাইটির মেডাম ব্লাভাটস্‌কি আর কর্ণেল অলকট ১৮৮০ সালে সিংহল

এলেন। ধর্মপাল তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। অলকট সাহেব সমগ্র সিংহল ঘুরে সিংহলীদের বলতে লাগলে তাঁদের বিরাট অতীত আর বৌদ্ধধর্মের কথা, আর ধর্মপাল তাঁর সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন দেশের সর্বত্র। সুফল ফললো, সিংহলীরা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো। সেখান থেকে ধর্মপাল অলকট সাহেবের সঙ্গে মাদ্রাজে আধিয়ারে আসেন ১৮৮৪ সালে। এখানে— এই দ্রাবিড়-ভারতে তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে লেখাপড়া করে ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মের জন্য নিজেকে তৈরী করে নেন। এ চার বৎসর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানবার উপায় নেই।

দেবমিত্ত ধর্মপালের জীবন আশা-নিরাশার সংঘাতে পূর্ণ, তাঁর জীবন-কাহিনী উপন্যাসের মতোই উপভোগ্য। ঘটনাবহুল তাঁর জীবনের কাহিনী এখানে বলা সম্ভব নয়। ১৮৯১ সালে তিনি মহাবোধি সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮৯২ সালে বুদ্ধগয়ায় আসেন, জগতের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা যাতে এ জায়গার অধিকার ফিরে পেতে পারে এজন্য তিনি আন্দোলন সুরু করেন এখানে। সমস্ত বৌদ্ধ-জগতের প্রতিনিধিদের আহ্বান করে সেখানে তিনি বৌদ্ধ মহাসম্মেলন ডাকেন সে বছর। তাঁর এ আন্দোলনের যৌক্তিকতা যতই থাক, ১৮৯৬ সালে আইনতঃ সেটা অগ্রাহ্য হয়ে যায়। অবশ্য এ অধিকারবাদের আন্দোলন আজো চলছে। ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে যান, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় আর সে মহাসম্মেলনের সমস্ত কৃতিত্ব নিয়ে আসেন এশিয়ার এ দুই মহাপুরুষ। সেখান থেকে ফেরবার পথে চীন, জাপান, মালয়, হনলুলু হয়ে সিংহলে ফিরে আসেন। হনলুলুতে মিসেস মেরী ফষ্টারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়; মেরী ফষ্টারের তাপিত আত্মা বৌদ্ধধর্মে শান্তি খুঁজে পেল। সেদিন থেকে মেরী ফষ্টার মহাবোধি সোসাইটিকে মায়ের যত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমরণ। তাঁরি টাকায় ১৯০৮ সালে বেনিয়াপুকুরের বাড়ী কেনা হয়েছিল, সেখানে আজ অনাথ শিশুরা আশ্রয় পাচ্ছে। মেরী ফষ্টারের টাকায় স্কুল স্থাপিত হয়েছে, হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে, স্থাপিত হয়েছে সারনাথে মূলগন্ধাকুটিবিহার (১৯৩১)। তাঁরি টাকায় লণ্ডনে সোসাইটির কাজ চলেছে বছরের পর বছর, ছড়িয়ে পড়েছে সোসাইটির শাখা চীনে, জাপানে, লণ্ডনে, নিউ ইয়র্কে, চিকাগো আর স্যানফ্রান্সিস্কোয়।

কলকাতার শ্রীধর্মরাজিকা বিহার নির্মাণে তিনি দান করেছেন ৬৫১২৩৲ টাকা। মেরী কষ্টার মহাবোধি সোসাইটিকে দান করে গেছেন দশ লক্ষ টাকার ওপর, আর নিজে বলে গেছেন—"বৌদ্ধধর্ম আমাকে যে শান্তি দিয়েছে, দেখিয়ে দিয়েছে যে পথের দিশা, সর্বস্ব দেওয়া সে পাওয়ার তুলনায় কিছুই নয়। এটুকু পাওয়ার জন্য যে কেউ অবহেলায় তার সর্বস্ব দিতে পারে।"

৪নং কলেজ স্কোয়ারের (বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট) শ্রীধর্মরাজিকা বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯২০ সালের ২৬শে নভেম্বর শুক্রবার দিন। ১৯১৬ সালের জুন মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট (গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেমস্‌ফোর্ড) তক্ষশীলায় পাওয়া বুদ্ধদেবের দু'টি দেহাবশেষ স্মরণচিহ্ন মহাবোধি সোসাইটিকে দান করেন, সারনাথ আর কলকাতার বিহার দু'টিতে তা' রাখতে হবে, ধর্মপালের সঙ্গে একথা তখন স্থির হয়েছিল। শ্রীধর্মরাজিকা বিহারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন প্রতিষ্ঠা দিনে গভর্ণমেণ্ট হাউস থেকে শোভাযাত্রা করে এসে বাংলা দেশের তখনকার লাট লর্ড রোণাল্ডসে। সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী (এ বৌদ্ধ উপাধি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাবোধি সোসাইটির বিহার নির্মাণকার্যে ধর্মপালকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। কলকাতার বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণ পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন স্যার জন মার্শাল আর মনোমোহন গাঙ্গুলী বি,ই।

বৌদ্ধধর্মের উত্তরে আর দক্ষিণে প্রবাহিত দু'টি ধারা মহাবোধি সোসাইটি-সঙ্গমে এসে মিলিত হয়েছে আর কলকাতাকে কেন্দ্র করে ছুটে চলেছে এর কর্মপ্রচেষ্টা দেশ-বিদেশ অভিমুখে। কেবল ভারতবর্ষে সোসাইটির শাখা স্থাপিত হয়েছে সারনাথ, নয়াদিল্লী, বুদ্ধগয়া, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, কালিকট, নুতনওয়া, মাদ্রাজ প্রভৃতি বহু স্থানে। মহাবোধি সোসাইটির আজীবন সভ্যের চাঁদা আড়াই শো টাকা আর সাধারণ সভ্যের চাঁদা বৎসরে বারো টাকা ও জমা পাঁচ টাকা মাত্র।

মহাবোধি সোসাইটির লাইব্রেরীকে শ্যামের প্রজাধিপক শ্যামদেশীয় ভাষায় লিখিত ত্রিপিটক দিয়েছেন (১৯২৩) আর চীন দেশের বৌদ্ধেরা দিয়েছেন চীনা ভাষায় লিখিত ত্রিপিটক। এরই দু'খানা আমাদের লাইব্রেরীর রত্নবিশেষ। তা' ছাড়া লাইব্রেরীতে রয়েছে পাঁচ হাজারেরও উপর দামী গ্রন্থ-সংগ্রহ।

বাংলা, ইংরাজী, সিংহলী, চীনা ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার ধর্ম, সাহিত্য, কবিতা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থরাজি বিশটি বিভাগে এখানে সুসজ্জিত রয়েছে। সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার উন্মুক্ত থাকে সকাল ৮টা থেকে ১১টা ও বিকাল ৩টা থেকে পাঁচটা। বিকাল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য পাঠাগার উন্মুক্ত রাখা হয়। পাঠাগারে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী ও নেপালী ভাষায় অনেকগুলো দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। লাইব্রেরীতে বই পড়তে কোন চাঁদা লাগে না আর বাড়ীতে বই নিয়ে যেতে দেওয়া মহাবোধি সোসাইটি লাইব্রেরীর নিয়ম-বহির্ভূত। হয়তো এ হয়ে ভালই হয়েছে।

বর্তমানে মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক দেবপ্রিয় বলী সিংহ আর লাইব্রেরীয়ান ভিক্ষু ইউ, ধর্মরতন।

[১৩-৪-৫২]

সরস্বতী ইনষ্টিটিউট

রাস্তাটা উত্তরমুখে এসে ডানে বেঁকেচে। বাঁকের আগটায় বাঁ হাতে ৩২নং বাড়ী—সরস্বতী ইনষ্টিটিউট। আগে রাস্তাটার নাম ছিল শাঁখারীটোলা লেন, পদবী বেড়ে এখন হয়েছে শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট। খুব সম্ভব পদবী বাড়িয়েছে ইমারতগুলো। রাস্তার দু'ধারে মস্ত বড় বড় শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা, সন্ধ্যা হবার আগেই আঁধার নেমে আসে রাস্তায়।

পুরাণো চকমেলানো বাড়ী। লোহার পাতের বড় দরজা—গ্যারেজের দরজার মতো ভেতরে চৌকো চাতাল, তারি চারদিক ঘিরে দোতলা বাড়ীর নীচের তলায় লাইব্রেরী। উঠানের এপাশে-ওপাশে মুখোমুখী কোঠায় লাইব্রেরী আর পাঠাগার, সামনাসামনি দরজা—উঠানের এপারের পাঠাগারে বসে ওপারের লাইব্রেরীর অফিস দেখা যায়—দেখা যায় সদস্যদের আনাগোনা—কর্মব্যস্ত লাইব্রেরীয়ানদের মুখে গভীরতর ছাপ!

রাস্তায় দাঁড়ালে দেখা যায়, পুরাণো একতলা বাড়ী, রঙচটা দেয়াল, দেয়ালের গায়ে পাথর বসানো তার ওপর লেখা রয়েছে—সরস্বতী ইনষ্টিটিউট, ১৮৯৮। পাশে বন্ধ দরজায় চিঠির বাক্স, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়ে ছেঁড়া বইয়ের পাতা দেখা যাচ্ছে—লোহার জাল দেওয়া জানালা। পাশে সামনে আধুনিক অট্টালিকাশ্রেণী উদ্ধত শির আকাশে তুলে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে এ যেন অতীত ইতিহাসের এক টুকরো ছেঁড়া পাতা। ৩২নং বাড়ী, বাড়ীর দিকে তাকালেই কৌতূহল জাগে, মনে হয় এ বাড়ী আর দশখানা বাড়ীর মতো নয়, এর একটা বিশেষত্ব রয়েছে; আর দশখানা বাড়ীতে যা-নেই, সেটা রয়েছে এখানে। ইচ্ছা হয় খুঁজে দেখি, আশা জাগে খুঁজলে আশ্চর্য একটা কিছু মিলবে এখানে, এ যেন হবে রীতিমতো একটা আবিষ্কার। মনে হয় অতীতের রাশি রাশি সঞ্চিত সম্পদ গোপন রয়েছে এ বাড়ীর কোঠায় কোঠায়, একটু দেখবারই যা অপেক্ষা! কৌতূহলী চোখ নিয়ে যে এখানে ঢুকবে তারি সামনে সব বেরিয়ে পড়বে মুহূর্তে।

-কতো সত্য এ অনুভূতি।

আধুনিক পারিপার্শ্বিক। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলিয়ে এ বাড়ীর দিকে তাকালেই মনে হয় এখানে একটা সমন্বয়ের সুর রয়েছে, তালভঙ্গ হয়নি একটুও কোন জায়গায়, অতীতে বর্তমানে সমন্বয় ঘটেছে এখানে। অবশ্য লাইব্রেরীর মানেই তাই, অতীত ভাবধারা প্রবাহ বর্তমানের সঙ্গে এসে মিলেছে এ মহাসঙ্গমে, ঠেলছে ভবিষ্যতের দিকে। ভাবধারার এ ত্রিবেণী-সঙ্গম—মানুষের পরমতীর্থ এ। মানুষ এখানে অতীতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খুঁজে পাচ্ছে তার বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে।

সরস্বতী ইনষ্টিটিউট, ১৮৯৮, দেয়ালের গায়ে পাথরে লেখা। বাড়ীর প্রাচীনতার দিকে তাকালে মনে হ'বে এখানেই বুঝি এটা গোড়া থেকে আছে। আসলে কিন্তু তা ঠিক নয়, তারিখের সঙ্গে বাড়ীর চেহারাটা মিলে গেছে বলে তা মনে হয়। ১৮৯৮ সালের মে মাসে আরম্ভ হয়েছিল অন্য নামে। প্রথম এর নাম ছিল, ক্যালকাটা লিটারারী সোসাইটি', তুলসীচরণ ঘোষের ১৭নং শাঁখারীটোলা ইষ্ট লেনের বাড়ীতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে চলে যায় এ রাস্তার ৩৯নং বাড়ীতে, বাবু জটিলাল দের বাস-ভবনে আর কয়েক মাসের ভেতর নাম পালটে নূতন নাম রাখা হয় 'সরস্বতী ইনষ্টিটিউট।' ওখানেই চার থাক বই দেখতে দেখতে চার আলমারীতে পরিণত হয়েছিল। তখন সভাপতি ছিলেন গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী আর লাইব্রেরীর সম্পাদক ছিলেন হেমচন্দ্র রায়। সরস্বতী ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী ছিলেন একদল ছাত্র, তাঁদের কেউ কেউ আজো বেঁচে আছেন। তাঁদের নাম হল শ্রীশচন্দ্র সরকার (পরে উকিল), বসন্তকুমার দাস ঋষীন্দ্রনাথ সরকার (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজের সম্পাদক), ফকিরচন্দ্র ঘোষ, চারুচন্দ্র মুখার্জী ও রাসবিহারী ঘোষ (বর্তমানে সরস্বতী ইনষ্টিটিউটের সভাপতি)।

আলাপ হ'ল সরস্বতী ইনষ্টিটিউটের বর্তমান সম্পাদক শ্রীপ্রসাদদাস সরকার আর লাইব্রেরীয়ান শ্রীকানাই বসুর সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম প্রসাদদাস বাবুকে,—আচ্ছা ছাত্রদের মাথায় হঠাৎ এ লাইব্রেরী গড়বার সখ চাপলো কেন বলুন তো, সেটা কি অমনি—না কোন কারণ ছিল এর পেছনে? প্রসাদদাস

বাবু আমার কথাগুলো বুঝবার একটু চেষ্টা করলেন, তারপর উত্তর দিলেন— 'বুঝলেন কি-না, আজকালকার ছেলেদের মতো এত বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র ছিল না তো তখনকার দিনে ছেলেদের?' তখনকার দিনে ছেলেরা অবসর সময়ে একটা কিছু গড়ে তোলবার দিকেই ঝোঁক দিত। সে যুগটাই ছিল গড়ে তোলবার যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকটায় শুধু লাইব্রেরী নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের সব কিছুকেই আমরা গড়ে তুলছিলাম। আজকালকার বহু ব্যাপক আর বহু বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে আমরা কিছুই গড়ে তুলতে পারছি না। আসলে সেদিনের সঙ্গে আজকের দিনের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ হয়ে গেছে। আজ ভাঙন ধরছে গড়ে তোলা সব জিনিষের ভিত্তি-ভূমে। সেদিনের আদর্শবাদ আজ আর মনে সাড়া জাগাতে পারছে না।

সরস্বতী ইনষ্টিটিউটের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব এই ৩৯নং বাড়ীতেই হয়েছিল। সেটাতে উপস্থিত ছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি নামকরা সাহিত্যিক আর সাহিত্যরসিকবর্গ। ইনষ্টিটিউটের কাজ বেড়ে চলে, সেখান থেকে লাইব্রেরী উঠে যায় ৬৬নং নেবুতলায়। এই বাড়ীতেই প্রথম পাঠাগারের সূচনা হয়। তারপর আরো কয়েক জায়গা ঘুরে ইনষ্টিটিউট আসে ৫৩নং শাঁখারীটোলা লেনের বাড়ীতে। ত্রিশ টাকায় সে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। এখানে পৃথক কোঠায় পাঠাগারের ভাল ব্যবস্থা করা হ'ল, বই-এর সংখ্যা বহু গুণ বেড়ে গেল আর কলকাতা কর্পোরেশন ষাট টাকার অর্থসাহায্য বাড়িয়ে ইনষ্টিটিউটকে এবার পাঁচ শত টাকা করে অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন। এখানে ইনষ্টিটিউটের সভাপতি ছিলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়, বিশ বছর তিনিই ছিলেন একাদিক্রমে সরস্বতী ইনষ্টিটিউটের সভাপতি। আমরণ তিনি সেবা করে গেছেন ইনষ্টিটিউটের। ১৯২৯ সালে ইনষ্টিটিউটের কিশোর-বিভাগ খোলা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আর তাতে পৌরোহিত্য করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর মৃত্যুর পরে এ বিভাগের নামকরণ হয়েছে 'দেবপ্রসাদ কিশোর পাঠাগার'। এ বিভাগে বর্তমানে সাতশো বই রয়েছে, কিশোর-পত্রিকা মৌচাক আর শিশুসাথী রাখা হয় এখানে। এক টাকা জমা আর দুই আনা চাঁদা কিশোর সভ্যদের। ত্রিশ

টাকায় ৫৩নং বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। এখান থেকে পরে ইনষ্টিটিউট উঠে আসে ৩২নং-এর বর্তমান ভাড়াটে বাড়ীতে।

১৯৪৬ সালের ২৬শে মে। তিন দিনব্যাপী উৎসবের ভেতর দিয়ে উদ্‌যাপিত হ'ল ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবস। উৎসবের সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। আসতে পারলেন না তিনি, সভাপতি হ'লেন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রদর্শনী হ'ল, সাহিত্য সভায় পৌরোহিত্য করলেন সুসাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত। নৃত্য, গীত আর বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সমারোহে সম্পন্ন হ'ল প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব। এ উপলক্ষে অভিনীত হ'ল রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'। প্রতিষ্ঠা যাঁরা করেছিলেন তাঁদেরই বংশধরেরা সেদিন উদ্‌যাপন করলেন ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা-দিবস। মনে হয়, এর একটা গোপন অর্থ রয়েছে।

'বিজয়া সম্মিলনী' ইনষ্টিটিউটের সাম্বৎসরিক উৎসব। প্রতি বৎসর নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর নেতাজীর জন্মদিন আর সাধারণতন্ত্র দিবস লাইব্রেরীতে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। মনীষীদের দ্বারা লাইব্রেরীতে বছরে বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচ ছ'টা বক্তৃতার আয়োজনও করা হয়।

পঞ্চাশ টাকায় ইনষ্টিটিউটের আজীবন সভ্য হওয়া যায়, আজীবন সভ্যদের এতো কম চাঁদা বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণ সভ্য দুই শ্রেণীর—প্রথম শ্রেণীর আট আনা চাঁদা, দুই টাকা জমা, এক সঙ্গে ওরা দু'খানা বই নিতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর চাঁদা চার আনা, জমা এক টাকা, এক সঙ্গে মাত্র একখানা বই নিতে পারেন ওরা। লাইব্রেরীতে বর্তমানে সর্বমোট বই-এর সংখ্যা ১৪০৮৩ খানা, তার মধ্যে ইংরেজী ৫৫৮৯ খানা আর বাকি ৮৪৯৪ খানা বাংলা। 'জীবনীকোষ', 'বিশ্বকোষ' প্রভৃতি রেফারেন্সের বই লাইব্রেরীতে রয়েছে। পাঠাগারের মাসিকে-দৈনিকে পনের খানা পত্র-পত্রিকা রাখা হয়, পাঠাগারের ব্যবস্থা ভালই।

পুরাণো লাইব্রেরী, লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ থাকা উচিত। বাংলা দেশে এ সব ব্যাপারে দাতারা চিরদিনই মুক্তহস্ত। সরকারী সাহায্যপুষ্ট দু' একটা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানই বাঙালীর বদান্যতায় গড়ে উঠেছে।

লাইব্রেরী সভ্যতার বাহন। সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্য, মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করে গড়ে তুলবার জন্য বাঙালী কোনদিন কিছু দিতে কৃপণতা করেনি। বাংলা দেশ ছাড়া দানের ওপর একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে দাঁড় করাবার দুঃসাহস খুব কম জায়গায়ই হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, গৃহ নির্মাণ তহবিল গড়ে ইনষ্টিটিউটের কর্মকর্তারা যদি চেষ্টা করেন তা' হ'লে তাঁদের সে চেষ্টা বিফল হবে না। তবে চেষ্টা করতে হবে। সরস্বতী ইনষ্টিটিউটও একদিন স্বপ্নমাত্র ছিল, বহু ঝড়-ঝাপ্টা কাটিয়ে সে স্বপ্ন আজকের সরস্বতী ইনষ্টিটিউটে পরিণত হয়েছে। আজকের স্বপ্নও তেমনি আরেকদিন সার্থক হয়ে উঠবে, শুধু সে জন্য সত্যিকারের চেষ্টা চাই।

[২৩-৩-৫২]

নারিকেলডাঙ্গা গুরুদাস ইনষ্টিটিউট

নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট—স্যার গুরুদাসকে লোকে ভুলতে পারে না—ভুলতে পারবে না কোন দিন। তাঁর নাম ভাঙিয়ে রাজনীতির বেসাতি নাই বা চললো, সে হ'ত তাঁর অপমান। তিনি ছিলেন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের যুগ-গুরু, ভারতের শাশ্বত আত্মার মূর্ত বিগ্রহ! লোকে তাঁকে ভুলবে কি করে? উনবিংশ শতকের শেষপাদ থেকে বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত (মৃত্যু ২রা ডিসেম্বর, ১৯১৮) এমন কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কলকাতায় গড়ে ওঠেনি, যার সঙ্গে স্যার গুরুদাসের নাম জড়িত নেই আর যা বেড়ে ওঠেনি তাঁর চেষ্টায়, যত্নে, আগ্রহে আর উপদেশে। বহু দিন অবাক হয়ে ভেবেছি তাঁর কর্ম-প্রতিভার কথা। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে কয়েকটি কথা তুলে দিচ্ছি,—

"...শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এইখানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিবেন কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি। বুঝিতে পারিবেন নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার, মতামত, আচার বিচার লইয়া আমি লেশমাত্র আপত্তি তুলিতে চাহি না—আমি আমার সমস্ত দেশের অভাব, দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া নম্রভাবে নমস্কারের সহিত সমাজের শূন্য রাজভবনে এই দ্বিজোত্তমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি।" (স্বদেশী সমাজ, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১১) এরি থেকে বোঝা যায় তাঁর ভেতর দেশবাসীর সাধনা কতোখানি রূপ পেয়েছিল, কতোটুকু ছিল তাদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন।

তাঁরই স্মৃতিপূত স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০১ সালে। প্রথমে এর আরম্ভ হয় 'নারিকেলডাঙ্গা স্পোর্টিং ক্লাব' নামে। পশুপতি বসু প্রমুখ একদল যুবক ও ছাত্র মিলে এর সূচনা করেন,—উদ্দেশ্য ছিল ফুটবল ক্লাব গড়ে তোলা। স্যার গুরুদাস এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন একেবারে গোড়া

থেকেই তিনি জানতেন এ আরম্ভের শেষ এখানেই নয়—একদিন এর কর্মধারা হবে বহু ব্যাপক আর উদ্দেশ্য হবে সুদূরপ্রসারী। তিনি এদেরকে উৎসাহ দেন, অর্থ-সাহায্য করেন। অন্যান্যদের কাছেও অর্থ-সাহায্য পাওয়া যায়। চাঁদা দিতেন সভ্যেরা—পাড়ার বিবাহাদি উৎসবেও চাঁদা পাওয়া যেত। এমনি করে ক্লাব গড়ে ওঠে। বর্তমান মোগলবাগানের পূর্ব দিকে অবস্থিত ধোপার মাঠ ও চটকার মাঠ সভ্যেরা নিজেরাই পরিষ্কার করে নেন। লাঠিখেলা আরম্ভ হয় জগদীশ্বর মিত্র মহাশয়ের জমিতে। পরবর্তীকালে সেইখানেই 'নারিকেলডাঙ্গা এথলেটিক ক্লাব' ও সাধন সমিতির ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয়েছিল।

পশুপতিবাবু পল্লী ত্যাগ করায় প্রতিষ্ঠানের কাজে সাময়িক শৈথিল্য আসে। ১৯০২ সালের শেষ দিকে নগেন্দ্রনাথ মিত্র, নিরঞ্জন, ঘোষ প্রভৃতি ক্লাবে যোগ দেন ও ডন, বৈঠক, মুগুর, প্যারালাল বার প্রভৃতি ব্যায়ামের আরম্ভ হয়। সে সময়ে ক্লাবের নাম বদলে নাম রাখা হ'ল 'নারিকেলডাঙ্গা এথ্‌লেটিক ক্লাব' আর জগদীশ্বর মিত্রের জমি দরমার বেড়া দিয়ে হ'ল ক্লাবের ব্যায়ামা-গারের প্রতিষ্ঠা। অভিজ্ঞতা নিয়ে এ সময় এসে প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ মল্লিক। দেখতে দেখতে ব্যায়ামাগারের শ্রী ফিরে গেল। ১৯০৩ সালে এখানে মুষ্টিযুদ্ধের প্রবর্তন হ'ল আর ১৯'৪ সালে হ'ল ক্রিকেট আর কুস্তির প্রবর্তন—খেলা আরম্ভ হ'ল মোগলবাগান নামক যোগেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের বাগানে। দিনে দিনে বেড়ে চললো ক্লাবের কর্মধারা আর ছড়িয়ে পড়তে লাগলো নানা দিকে।

পরিবর্তন এলো। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এলো ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন, পরিবর্তন এলো ক্লাবেরও কর্মপন্থায়—বিদেশী খেলার প্রভাব কমলো। ক্লাবের কর্মকর্তারা স্যার গুরুদাসের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ঠিক হ'ল শারীরিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। নারিকেলডাঙ্গা এথ্‌লেটিক ক্লাবের সঙ্গে যুক্তভাবে 'নারিকেলডাঙ্গা লিটারারী ক্লাব' স্থাপিত হ'ল। এখানেই গ্রন্থাগারের প্রথম সূচনা। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে ব্যবস্থা হ'ল সাহিত্য ও নীতি বিষয়ে আলোচনা-সভার। লাইব্রেরী আর সভার কাজ চলতো জগদীশবাবুর জমির পশ্চিমে

যদুবাবুর কেনা পুরাণো এক ভাঙা বাড়ীতে। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে লাঠিখেলা প্রবর্তিত হয়, তারি সঙ্গে সভ্যেরা গ্রহণ করেন সেবাব্রত—দেশের সেবা, দেশের দুঃস্থ জনসাধারণের সেবা—ফেরি করে স্বদেশী জিনিষ বিক্রি প্রভৃতি। স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট ছোট আরম্ভের ইতিহাস সত্য,—বহু বিস্তৃত পরিণতিরও ইতিহাস।

১৯০৭ সালের প্রারম্ভে নারিকেলডাঙ্গা এথ্‌লেটিক ক্লাব ও নারিকেলডাঙ্গা লিটারারী ক্লাব দু'টোকে এক করে এর নাম রাখা হয় 'সাধন সমিতি'। সমিতির সম্পাদক হ'লেন পশুপতি বসু। কৃষ্ণপ্রসাদ মল্লিক আর পশুপতি-বাবু দু'জনে সমিতিকে গ'ড়ে তুলতে লাগলেন। সমিতির কাজ ব্যাপকতর হ'ল, বন্যায় সাহায্য, দুর্ভিক্ষে সেবা, মৃতদেহ সৎকার প্রভৃতি নানাদিকে ছড়িয়ে পড়লো কর্মপ্রবাহ। সেবাকার্য প্রবর্তনে কৃষ্ণবাবুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রোগীর সেবায় সে কি আন্তরিকতা সভ্যদের! প্রতি রবিবার প্রাতে ১০০ ভিক্ষুককে দেওয়া হ'ত মুষ্টিভিক্ষা, সাপ্তাহিক সাহায্য প্রেরিত হ'ত পল্লীর বিপন্ন দুঃস্থ ব্যক্তিদের বাড়ীতে। সেই ১৯০৭ থেকে আজ অবধি কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে মাসিক এক টাকা করে পাঠান হয়ে আসছে।

সমিতির গ্রন্থাগার দেখতে দেখতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৯০৭ সালে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল মিত্র সেবাকার্য ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হন, সেই থেকে আজ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। তিনিই লাইব্রেরীর বর্তমানের লাইব্রেরীয়ান। ১৯০৭ সালে গ্রন্থাগার ছিল যদুনাথ বসু মহাশয়ের গৃহে, সেখান থেকে হরিপদ মিত্রের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয় ও ১৯০৯ সালে আবার যদুনাথবাবুর বাড়ীতেই চলে আসে। সমিতির সভ্যগণ লাঠিখেলা, ছুরিখেলা ও এয়ার গানে যে নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন, যে দক্ষতা দেখিয়েছেন শারীরিক শক্তির ১৯০৮-০৯ সালের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানের প্রদর্শনীতে, প্রবাদের মতো আজো সে সকল কথার আলোচনা হয়ে থাকে। সে ছিল বাংলা দেশে বোমার যুগ—সভা-সমিতির ওপর পুলিশী অত্যাচার-উৎপীড়ন চলেছে তখন বেপরোয়া। স্যার গুরুদাসের পরামর্শে সমিতির কাজ সুষ্ঠুভাবে চললেও অভিভাবকেরা ভয় পেয়ে যান। খেলাধুলা, ব্যায়ামাগার বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১২ সাল পর্যন্ত সমিতির কাজ দিনে দিনে ঝিমিয়ে পড়তে থাকে।

১৯১৩ সালে অনিলেন্দ্রনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠানের আবার প্রাণসঞ্চার করেন, আবার খেলাধূলা ও গ্রন্থাগারের কাজ চলতে থাকে—নূতন বালক সভ্য নিয়ে অনিলবাবু কাজে নামেন। এই সময় সমিতির নাম বদলে 'ষষ্ঠীতলা এথ্‌লেটিক ক্লাব' নাম দেওয়া হয়। কৃষ্ণপ্রসাদ মল্লিকই সম্পাদক থাকেন আর ক্লাবের অধিকর্তার পদে নির্বাচিত হন শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু। এথ্‌লেটিক ক্লাব নাম থাকলেও ১৯১৪-১৫ সালের কার্য-বিবরণীতে ব্যায়াম ছাড়া সভ্যগণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানও উদ্দেশ্যরূপে বর্ণিত হয়েছে দেখা যায়। ১৯১৫ সালের বাৎসরিক সভায় স্যার গুরুদাস মত প্রকাশ করেন, প্রতিষ্ঠানের নাম উদ্দেশ্যের পরিচায়ক নয় আর এর গঠনতন্ত্রও রচিত হওয়া প্রয়োজন। ফলে ১৯১৫ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠানের নূতন নামকরণ হয় নারিকেলডাঙ্গা ইনষ্টিটিউট আর অক্টোবর মাসে উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নূতন গঠনতন্ত্র রচিত হয়। ১৯১৫-১৬ সালের কার্য-বিবরণীতে ব্যায়ামাগার ছাড়াও ছোট ছোট ছেলেদের শিক্ষা, পাঠাগার, সাহিত্য-সভা বিভিন্ন বিষয়ে রচনা ও আলোচনা-সভা, বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। স্যার গুরুদাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুণ্যস্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালের ১৬ই এপ্রিলের এক বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে ইনষ্টিটিউটের নাম বদলে নূতন নাম রাখা হয়েছে 'নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট'। সে সভাতেই ঘোষণা করা হয় যে, স্যার গুরুদাসের স্ত্রী, ছেলে ও জামাতাগণ ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব বাড়ী নির্মাণের জায়গা কেনার টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারপর তিন কাঠা জায়গা কেনা হয় ও জনসাধারণের বদান্যতায় ইনষ্টিটিউটের বর্তমান বাড়ী নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয় ১৯২২ সালে। ১৯২৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী আনুষ্ঠানিক-ভাবে গৃহ-প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে।

স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউটের বর্তমান কার্যকলাপের ভেতর প্রতি বৎসর ২রা ডিসেম্বর স্যার গুরুদাস স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া জন্মাষ্টমী ও নববর্ষ ইনষ্টিটিউটের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান বলে গণ্য। ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব ব্যায়ামাগারে আধুনিক সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক শরীরচর্চার ব্যবস্থা রয়েছে, খেলার মাঠে ব্যবস্থা রয়েছে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলাধূলার। ইনষ্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে স্যার গুরুদাস প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ ভালোভাবেই

চলেছে, বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বর্তমানে প্রায় আড়াইশো। ইনষ্টিটিউটের নীরোদ দাতব্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের কাজ চলেছে পল্লীর প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আর ডাক্তারের অভাবে ইনষ্টিটিউটের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের কাজ বর্তমানে বন্ধ রাখতে হয়েছে। এ ছাড়া এখানে আর্তের সেবা, দুঃস্থ পরিবারদের সাহায্য প্রভৃতি জনহিতকর কর্মপন্থা বহু দিন ধরে অনুসৃত হয়ে আসছে।

ইনষ্টিটিউটের আজীবন সভ্যের চাঁদা এক শত টাকা, আর প্রবীণ সভ্যদের আট আনা ও সাধারণ সভ্যদের চার আনা করে মাসিক চাঁদা দিতে হয়। লাইব্রেরীর জন্য প্রত্যেক সভ্যকে জমা রাখতে হয় দু'টাকা করে। ইনষ্টি-টিউটের পাঠাগারে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা রয়েছে আর সেখানে প্রায় সবগুলো দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর বর্তমান বই-এর সংখ্যা ১২০০০। তার ভেতর সোমপ্রকাশ (১২৬৬-৭২), জন্মভূমি (১২৯৮), বলাকা, প্রদীপ, তৃপ্তি (১৩০০), সাহিত্য (১৩০১), আর্যদর্শন (১৮৮২), ভারতভূমি প্রভৃতি পুরাতন পত্রিকা আর সামবেদ সংহিতা (ঐন্দ্র, আরণ্য, আগ্নেয়, পবমান পর্ব), শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তন্ত্রতত্ত্ব, বিশ্বকোষ, ভারতকোষ (৩ খণ্ড), সমর্থকোষ (১-৫), শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি অনেক দুষ্প্রাপ্য রেফারেন্সের গ্রন্থ রয়েছে। ইনষ্টিটিউটের বর্তমানের সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস, সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর বর্তমানের লাইব্রেরীয়ান হ'লেন শ্রীখগেন্দ্রলাল মিত্র।

গৌরমোহন মিত্র (ব্রহ্মচারী মাতৃকা চৈতন্য) স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউটের প্রাণস্বরূপ ছিলেন; আরম্ভ থেকেই তিনি ছিলেন ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত। তাঁরি আজীবন চেষ্টা ও নিঃস্বার্থ সেবায় পুষ্ট হয়েছে ইনষ্টিটিউট। ১৯৫০ সালে তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁরি প্রেরণা রূপায়িত হয়ে উঠেছে 'নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউটে'র কর্মপন্থার ভেতর দিয়ে।

[৮-৬-৫২]

মুসলিম ইনষ্টিটিউট

মিঃ এ এইচ হার্লি ইংরেজী ১৯১১ সালে মুসলিম ইনষ্টিটিউটের সভাপতি ছিলেন। প্রথমে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন, পরে ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হন। অধ্যক্ষ হার্লি মুসলিম ইনষ্টিটিউট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখে গেছেন,—"১৯০২ সালে মুসলিম ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। সব বিষয়ে মুসলমান সমাজের উন্নতি বিধানই ছিল এর উদ্দেশ্য। সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানদের ভেতর উন্নতি-সাধনের আন্দোলন এরি ফলে চ'লতে থাকে। প্রথম যাঁরা এ-আন্দোলনের কথা ভেবেছিলেন ডাঃ ই ডেনিসন রস (পরে স্যার) তাঁদের অন্যতম। মায়ের মতো যত্নে-স্নেহে তিনি এটাকে লালন করে বড় করে তুলেছেন—এর সমস্ত অগ্রগতির পেছনে তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি আর সক্রিয় হস্ত রয়েছে (জার্ণাল অব মুসলিম ইনষ্টিটিউট, ১ম, ১৯২৬)।

ভেদ-বুদ্ধিকে উস্কে দিয়ে দেশ শাসন ছিল যাদের নীতি, সেই ইংরেজের সক্রিয় হাত ছিল মুসলিম ইনষ্টিটিউট গড়ে তোলার পেছনে। ওরা যখন দরদ দেখিয়ে সম্প্রদায় বিশেষের উন্নতিবিধান করতে যায়, তখন রাজনীতির গূঢ় অভিসন্ধি তার পেছনে কাজ করতে থাকে, একথা বললে দোষের হ'বে বলে মনে করিনে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ এমনি করেই ওরা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। এতে করে একটা সম্প্রদায়ের লাভ যত বেশীই হোক, সমস্ত দেশের দিক থেকে দেখলে ক্ষতি যা হয়েছে সেটার তুলনা নেই। এদিক থেকে বিচার করলে মুসলিম ইনষ্টিটিউটকে গোড়ার দিকে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির দোষের থেকে মুক্ত বলতে পারিনে। এর সাধারণ সভ্য হবার অধিকার ছিল না কোন অমুসলমানের, অবশ্য রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তনের সঙ্গে সে বাধা আজ আর নেই। সরকারী সাহায্য-পুষ্ট এই মুসলিম ইনষ্টিটিউটের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে; শুধু বাংলা দেশের ওপর নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতের ওপর এর প্রভাব ঐতিহাসিক। মুসলিম ইনষ্টিটিউট পূর্ব ভারতের মুসলমান সমাজকে আত্ম-সচেতনতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মুসলিম ইনষ্টিটিউট

স্যার ডেনিসন রস আর মৌলানা কামালউদ্দীন আহম্মদকেই মুসলিম ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে, কর্মী হিসেবে মুসলমান যুবকরাও অবশ্য এর জন্য যথেষ্ট খেটেছিলেন। সেন্ট্রাল কলিকাতা কলেজের বর্তমান দর্শন-বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব বাকিসায়ের মুসলিম ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় দু'টো সমিতি ছিল, তার একটার নাম 'সোসাইটি ফর মিউচুয়েল ইমপ্রুভমেন্ট অব ইয়ং মেন' আর আরেকটা হ'ল 'মুসলিম ডিবেটিং সোসাইটি'। কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজ অধ্যক্ষের পরিচালনায় এ দু'টো চলতো, আসলে এটা ছিল মাদ্রাসার ঘরোয়া ব্যাপার। এ দু'টোকে একত্র করে ডাঃ ডেনিসন রস আর মৌলানা কামালউদ্দীন আহম্মদ সায়েও মুসলমানদের একটা বড় রকমের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন আর তারই ফলে ১৯০২ সালে মাদ্রাসার আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত একটা নূতন প্রতিষ্ঠানরূপে ইনষ্টিটিউট দেখা দিল। মুসলিম ইনষ্টিটিউটের প্রথম সভাপতি হলেন মিঃ এইচ এ ষ্টাক, আর ডাঃ ই ডেনিসন রস, আর প্রথম সম্পাদক হলেন মৌলানা কামালউদ্দীন আহম্মদ।

কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষরাই হ'তেন মুসলিম ইনষ্টিটিউটের সভাপতি। প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ১৯৩১ সাল অবধি ইনষ্টিটিউটের কার্যাদি কলিকাতা মাদ্রাসায়ই চলতে থাকে, দ্রুত বেড়ে চলে বিভিন্ন বিভাগে এর কার্যকলাপ। একেবারে আরম্ভ থেকেই মুসলিম ইনষ্টিটিউট বার্ষিক ১৬০০৲ টাকা করে সরকারী সাহায্য পেয়ে এসেছে, অবশ্য সেটা বন্ধ হ'য়ে গেছে গত দু'বছর ধরে। আর কলকাতা কর্পোরেশন ইনষ্টিটিউটকে ১৫০৲ টাকা করে অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছে, সেও প্রায় গোড়ার দিক থেকেই। ক্রমে ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব গৃহের অভাব অনুভূত হতে লাগলো। ১৯২৫-২৬ সালের কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মিঃ এ এইচ হার্লি। কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে নিজস্ব নূতন ইনষ্টিটিউট গৃহের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। মুসলিম ইনষ্টিটিউটের নূতন গৃহের পরিকল্পনাটি মিঃ হার্লি প্রমুখ কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ সরকারের নিকট পেশ করলেন ও এর জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে সরকারে আবেদন করলেন। অল্প দিনের ভেতরই সরকার থেকে গৃহ-নির্মাণের টাকা মঞ্জুর হ'ল। ১৯৩১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী নূতন ইনষ্টিটিউট গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

বাংলা দেশের তখনকার গভর্ণর স্যার ফ্রান্সিস ষ্ট্যানলি জ্যাকসন, আর সেই সালেই মুসলিম ইনষ্টিটিউট উঠে আসে বর্তমান বিরাট অট্টালিকায়। লাট সাহেবই গৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন।

১৯০৫ সালে মুসলিম ইনষ্টিটিউটের মুখপত্র হিসেবে 'জার্ণাল অব দি মুসলিম ইনষ্টিটিউট' নামে মাসিক পত্রিকা বের হ'তে থাকে। জার্ণালের সম্পাদক ছিলেন জনাব এ এফ এম আব্দুল আলি। তাতে মুসলমান সমাজের ঐতিহ্য বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। দেশ-বিদেশে এ-পত্রিকার সমাদর ছিল, তাতে থাকতো দেশ-বিদেশের মনীষীদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ সম্ভার। এ পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে রোপার লেথব্রিজ, ডেনিসন রস, ঢাকার নবাব সলিমুল্লা, এইচ এ ষ্টার্ক, হরিনাথ দে, স্যার যদুনাথ সরকার, অধ্যাপক ডাঃ ভাণ্ডারকর, ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ডি এস মার্গলিওথ, এস খোদাবক্স প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপে 'জার্ণাল অব দি মুসলিম ইনষ্টিটিউটে'র বেশ চাহিদা ছিল, এর এজেন্সী ছিল লণ্ডনে, প্যারিসে আর জার্মাণীতে। ১৯৩০ সালে এ-পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়, এমন একটা জিনিস বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্যি দুঃখের বিষয়।

মুসলিম ইনষ্টিটিউটের নীচের তলায় সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত হলঘর বা সভা-গৃহ রয়েছে, সেটা সাধারণকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। সভা-সমিতি আর নানা রকমের অনুষ্ঠানাদি এখানে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। ইনষ্টিটিউটের সাম্বৎসরিক বিশেস অনুষ্ঠানটির নাম 'মুশারা'। এটা একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 'মুশারা' মানে কবি-সভা। বিশেষভাবে এটা উর্দ্দু ভাষাভাষীদের উৎসব। উর্দ্দু ভাষায় লিখিত কবিতা আবৃত্তি ও গজল গান এ-উৎসবের বিশেষত্ব। কবিতা আবৃত্তির পর সামান্য জলযোগ এই সুন্দর উৎসবটিকে সুসম্পূর্ণ করে তোলে। বিখ্যাত কবি জুরম্ মোহাম্মেদাবাদীর পৌরোহিত্যে বর্তমান বৎসরে এ-উৎসবটি সম্পন্ন হয়েছে।

মিলাদ শরীফ এবং কুয়য়ালী ইনষ্টিটিউটের আরেকটি সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান। প্রতি বৎসর হজরত মোহম্মদের জন্মদিন উদ্‌যাপনের এ-উৎসব। বর্তমান বৎসরে এ- উৎসবের সভাপতি ছিলেন আব্দুল আজিজ আনসারী এম-এল-এ।

বাৎসারিক 'রিভার পিকনিক' বা নদী-উৎসব মুসলিম ইনষ্টিটিউটের

আরেকটি বিশেষত্ব। ষ্টীমার ভাড়া করে জলের ওপর ভ্রমণের ভেতর দিয়ে সদস্যরা এ-আনন্দ অভিযান চালিয়ে থাকেন। এতে করে নদী-মাতৃক বাংলা দেশের মধুর রূপটি চোখে-মনে আনন্দের স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। ১৯২৬ সালে নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী এই উৎসবটি প্রথম আরম্ভ করেন। সেই থেকে এটা চলে আসছে। বর্তমান বৎসরে এখনো উৎসব সম্পন্ন হয় নি, শীঘ্রই হবার কথা আছে। এ-রকম নদী-অভিযানে সত্যিকার বৈশিষ্ট্য আছে সন্দেহ নেই।

বর্তমানে মুসলিম ইনষ্টিটিউটে 'সাধারণতন্ত্র দিবস' আর 'নেতাজীর জন্মদিন' এই দু'টি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে।

মুসলিম ইন্‌ষ্টিটিউটের স্থায়ী সভ্যদের ১০০৲ টাকা চাঁদা দিতে হয়। সাধারণ সভ্যদের সিনিয়র, জুনিয়র ও ছাত্র—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। তাঁদের বার্ষিক দেয় চাঁদার পরিমাণ যথাক্রমে ১০৲ টাকা, ৫৲ টাকা ও ৩৲ টাকা। সমস্ত সভ্যই সমান সুবিধে পেয়ে থাকেন।

ইন্‌ষ্টিটিউট-লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান হ'লেন এস এম ইয়াসীন। এতো বড় একটা প্রতিষ্ঠানের প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকায় সুবিস্তৃত ঘর আর সুসজ্‌জিত পরিবেশে এই ক্ষুদ্র লাইব্রেরী একেবারেই বেমানান। কি করে এটা সম্ভব ভেবে পাওয়া যায় না। ইংরেজী-বাংলা-উর্দ্দুতে মিলিয়ে মাত্র হাজার তিনেক বই রয়েছে লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে চেষ্টা করা উচিত। তিনখানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এ লাইব্রেরীতে রয়েছে। আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন কবি আবুল ফজল পারশী ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। সে দু'খানার হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি এই ইন্‌ষ্টিটিউট-লাইব্রেরীতে রক্ষিত হয়েছে। আর আছে উর্দ্দু ভাষায় লেখা সৈয়দ আলি বিলগ্রামী-রচিত 'তামুদ্দিন-ই-আরব' নামক গ্রন্থ। বই তিনখানি কোথাও পাওয়া যায় বলে জানা নেই। মস্ত বড় পাঠাগারে সর্বসাধারণের পুস্তক-পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা চমৎকার। পাঠাগারে রাখা হয়েছে বাংলা, ইংরেজী ও উর্দ্দু পত্র-পত্রিকা—চারখানা দৈনিক, আটখানা সাপ্তাহিক আর ত্রিশখানা মাসিক।

খেলাধূলা বিভাগের বর্তমান সম্পাদক নিশার আহম্মদ খাঁ। মুসলিম

ইনষ্টিটিউটের কনট্রাক্ট ব্রিজ আর বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতা সুবিখ্যাত। প্রতি বৎসর এ-প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। ফুটবল, ক্রিকেট আর হকি খেলার জন্য এ বছর জাফর আলি সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন।

ব্যায়ামাগারের বর্তমান সম্পাদক সনাউল্লা। এই ব্যায়ামাগারটি মুসলিম ইনষ্টিটিউটের সম্পদ। এখানে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ব্যায়ামের সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা রয়েছে আর ব্যায়ামাগারের সভ্য-সংখ্যাও প্রচুর। আশুতোষ হলে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় আর রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতিতে অনুষ্ঠিত পূর্ব-ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ইনষ্টিটিউটের সভ্য জো এলেক, এস আলম ও এইচ ডি নেটো অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন (ষ্টেট্‌সম্যান, ১৯শে জানুয়ারী, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২)। মাদ্রাজে যে সর্ব-ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা হবে, তাতে এই তিন জনই বাংলা দেশের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। শীঘ্রই মাদ্রাজে এ-প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে যাচ্ছেন এঁরা।

মুসলিম ইনষ্টিটিউটের বিতর্ক বিভাগের বর্তমান সম্পাদক হবিবুর রহ্‌মান। প্রতিমাসে এ বিভাগে একটি করে অধিবেশন হয়ে থাকে, তাতে নানা গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। এ-বিভাগে বিশেষজ্ঞ ও মনীষীদের দ্বারা নানা বিষয়ে বিশেষ বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন হয়ে থাকে। বর্তমানে এই বিভাগে অবাঙ্গালীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার চেষ্টা চলছে।

মুসলিম ইনষ্টিটিউটের বর্তমান সভাপতি হ'লেন সৈয়দ বদরুদ্দোজা এম-এল-এ আর বর্তমান সম্পাদক মঞ্জুরুল হক।

[৯-৩-৫২]

বেহালা লাইব্রেরী

বর্তমানের বেহালা সহর, সহরতলী আর গ্রাম—এ তিনের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। ট্রাম-বাস চলছে, দু'চারটা বড় বড় রাস্তা হয়েছে, দু'চারটা বড় বড় বাড়ী হয়েছে সত্যি, কিন্তু এলাকার এমন কিছু উন্নতি হয়নি। বড় রাস্তা ছেড়ে পা বাড়ালেই কাদা, ডোবা নালায় পচা জলে বিশ্রী গন্ধ, মজা পুকুর, ভাঙা একতলা ভুতুড়ে বাড়ীর ছড়াছড়ি। আম জাম জামরুল আর নারকেলের গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে সত্যি, কিন্তু সেটা শ্যাম-শ্রী নিয়ে নয়, যুগের সঙ্গে তাল রাখতে না পারায় বিশ্রী এক ভাব সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে বিক্ষিপ্ত থাপছাড়াভাবে। ওদের দিকে তাকালে চোখ জুড়োয় না, চোখে বাধে। নগরীর সাজ-সজ্জার অপপ্রয়াসে গ্রামের শ্রী হারিয়ে গেছে, গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় যেন বুঝতে পেরেছে এখানে তারা বেমানান,—লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। গ্রাম্যবধূর সহুরে বিলাসিনী সাজবার চেষ্টার মতো এ এক হাস্যকর পরিস্থিতি। তাতে সহরেরও মান থাকে না, গ্রামেরও মান যায়। বর্তমানের বেহালা না-সহর, না-গ্রাম।

কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগের বেহালা এমন ছিল না। তখনো গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়-ডোবা-নালা সবই হয়তো ছিল, কিন্তু তা আজকের মতো এমন চোখে বাধতো না, তাতে সেদিন একটা সমতার শান্তশ্রী মাখানো ছিল। আজকের মতো সেদিনও হয়তো গ্রীষ্মে ধূলোর ঝড় উঠতো, কিন্তু তার মুখে এমন বিশ্রী লজ্জার কলঙ্ক মাখানো থাকতো না, তাতে সেদিন মিশে থাকতো দুরন্ত প্রাণ ঝড়ের দৃপ্তভঙ্গী বিজয়োদ্ধত উল্লাসের অপূর্ব শ্রী। বর্ষায় গলে যাওয়া পথের পাশে গাছের সারি পত্রভারে অবনত শাখা মাথায় ছুঁইয়ে সেদিন অন্য ভাষায় কথা কইতো—ঝরে পড়তো তা' ওপর হতে আশীর্বাদের মতো। চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুতালোক ভুতুড়ে বাড়ীগুলোকে বিশ্রীতরো করে তুলতো না সেদিন,—ঝিল্লী-মুখর স্তব্ধ সন্ধ্যায় ম্লান প্রদীপ শিখা শান্তির প্রলেপের মতো তাদের গায়ে ঈষৎ আলোর

কান্তি ফুটিয়ে তুলতো। সেদিন প্রাণের যোগ ছিল পরিবেশের দিকে দিকে—প্রাণের যোগ ছিল মানুষের সঙ্গে পরিবেশের।

সেই পঞ্চাশ বছর আগের কথা, তখন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে জোয়ার এসেছে। শিল্পে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে শিক্ষায়, তার ঢেউ দেশের সর্বত্র পৌঁছেছে, দেশের যারা তরুণ তাদের মনে জেগেছে কর্মচাঞ্চল্য—বড় রকমের একটা কিছু করা চাই। গড়বার যুগ, গড়ে তুলতে হবে—ছোট কিছু নয়, যার ভিত্তি হবে বিরাট স্ব:প্নর ব্যাপকতায় সার্থক। বেহালায় লাইব্রেরী নেই, জাতির প্রয়োজনে সেটাকে গড়ে তুলতে হবে। একদল তরুণ কাজে নামলেন আর তারই ফলে বেহালা লাইব্রেরীর সূচনা হল ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী।

বেহালা লাইব্রেরীর প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সরকার, ননীগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বেহালার এক দল শিক্ষিত যুবক। নিজেদের ভেতর আলাপ-আলোচনা করে নিজেরাই বই দিয়ে আর চাঁদা দিয়ে ও'রা লাইব্রেরী আরম্ভ করে দিলেন 'বেহালা লাইব্রেরী' নামে। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর ডায়মণ্ড হারবার রোডের ভাড়াটে বাড়ীর একখানা ঘর বিনা ভাড়ায় লাইব্রেরীকে ছেড়ে দিলেন, এদিকে ব্রজেনবাবু প্রভৃতির চেষ্টায় একেবারে আরম্ভেই কিছু চাঁদাও আদায় করা হ'ল। এই হলো বেহালা লাইব্রেরীর একেবারে গোড়ার দিকের কথা।

লাইব্রেরী আরম্ভ হ'বার পর এক সাধারণ সভায় লাইব্রেরীর কার্যকরী সমিতি গঠিত হলো। লাইব্রেরীর প্রথম সভাপতি হলেন মাননীয় সুরেন্দ্রকুমার রায়, সম্পাদক হলেন সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হলেন সহকারী সম্পাদক, আর লাইব্রেরীর প্রথম গ্রন্থাগারিক হলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। বই সংগ্রহ ও চাঁদা দিয়ে বই কেনা হতে লাগলো, লাইব্রেরী বেড়ে চললো দিনের পর দিন। ১৯০৯ সালে শুভানুধ্যায়ী সদস্য হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মারা গেলেন, লাইব্রেরী উঠে গেল অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাড়াটে বাড়ীতে। এখানে কিছুদিন লাইব্রেরী চলতে থাকে, তারপর ডায়মণ্ড হারবার রোডে রায় বাবুদের ভাড়াটে বাড়ীতে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৩ সালের

১৯শে জুন পর্যন্ত লাইব্রেরী এখানেই ছিল। ইতিমধ্যে লাইব্রেরী বড় হতে থাকে। প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের ভেতর ভবানীপুরের ভারবেনা লাইব্রেরীর বই কিনে নিয়ে কর্মকর্তাগণ বেহালা লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এ ছাড়া প্রতি বৎসরই বই কেনা হতে থাকে, ফলে বেহালা লাইব্রেরীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর জ্যোতিষচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে এক সাধারণ সভায় লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতানগণকে সম্মানিত করা হয় ও তাঁদের নিয়ে এক উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। তাতে স্থির হয় যে, লাইব্রেরী তাঁদের উপদেশে পরিচালিত হবে, আর যে কোন বিপর্যয়ে তাঁদের মধ্যস্থতাই হবে চূড়ান্ত সমাধান। তাঁদের সিদ্ধান্তের ওপর আর কারো কোন কথা খাটবে না।

লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহের অভাব গোড়া থেকেই অনুভূত হতে থাকে। ১৯২৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী সদস্যগণের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্রে গৃহ-নির্মাণ তহবিলে জনসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করা হয় আর তাতে দেশবাসীর কাছ থেকে আন্তরিক সাড়াও পাওয়া যায়। যাঁদের অকৃপণ দানে গৃহ-নির্মাণ তহবিল গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে রাজা আশুতোষনাথ রায় (কাশিমবাজার), হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (ভাগলপুর), সৌরীন্দ্রনাথ রায় (বেহালা), নীলমণি মান্না (বেহালা), রাধাচরণ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), গঙ্গাপ্রসাদ মজুমদার ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রিয়নাথ সরকার (বেহালা) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর লাইব্রেরীর বর্তমান বাড়ী কেনা হয় ১৯৩৮ সালে, একতলা পাকা কোঠাবাড়ীসহ পাঁচ কাঠা জমি। আইনের বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে রেজিষ্টারী করতে বিলম্ব হওয়ায় ১৯৪৩ সালের ২০শে জুনের আগে নিজস্ব গৃহে লাইব্রেরীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান লাইব্রেরী ঘরের দুইটি কোঠায় পাঠাগার ও গ্রন্থাগারের স্থান সঙ্কুলান হয় না, আলমারির মাথায় গাদা করে রাখা আর এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে পড়া মূল্যবান বহু বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্তমানের কর্তৃপক্ষ গৃহ-সম্প্রসারণ কার্যে মনোযোগী হয়েছেন। সামনের দিকে বাড়ানো নূতন কোঠাবাড়ীর কাজ বহু দূর এগিয়ে গেছে, আশা করা যায় দেশবাবাসীর সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্যে শীঘ্রই সেটা সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। ১৯৪৩ সালে বেহালার শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী তাঁর মৃত পুত্রের স্মৃতি রক্ষার জন্যে লাইব্রেরীকে চল্লিশখানি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেন। গত

বৎসর সরকারের সামাজিক শিক্ষা বিভাগ লাইব্রেরীকে ৮০০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক উপহার দিয়েছেন আর এ বছর দিয়েছেন পাঁচ শত টাকা মূল্যের পুস্তক। স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান বর্তমানে লাইব্রেরীকে বার্ষিক দেড়শো টাকা অর্থ সাহায্য করছেন আর তাঁদের তরফ থেকে লাইব্রেরী পরিচালনায় সাহায্য করবার জন্য নিযুক্ত আছেন দু'জন প্রতিনিধি। ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র লাইব্রেরীকে ২০১৲ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর ১০০৲ টাকা দিয়ে লাইব্রেরীর আজীবন সভ্য বলে গণ্য হয়েছেন। সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সহানুভূতি লাইব্রেরী চিরদিন পেয়ে এসেছে, এঁদের ভেতর শ্রীশঙ্কর হালদার, শ্রীনীরেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনন্তকুমার বাউর, শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবসন্তকুমার মণ্ডল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লাইব্রেরীর বিশেষ অনুষ্ঠানের ভেতর ১৯২৭ সালের অটোমেটিক থিয়েটার ও ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শতবার্ষিকী উৎসবের পৌরোহিত্য করেছেন ডাঃ কালিদাস নাগ। এ ছাড়া শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে লাইব্রেরীর আজীবন শুভানুধ্যায়ী সুসাহিত্যিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে শোকসভার আয়োজন করা হয়। বর্তমানে লাইব্রেরীর সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানের ভেতর নববর্ষ উৎসব, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, বিজয়া সম্মিলনী, সরস্বতী পূজা, নেতাজী জন্মোৎসব ও ভূতপূর্ব সম্পাদক মনোমোহন হালদারের স্মৃতিবার্ষিকী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালে লাইব্রেরীর এক বিশেষ সভায় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর আজীবন সেবার জন্যে সম্মানিত করা হয়। লাইব্রেরীর উৎসব পরিচালনায় ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক অমৃতলাল ঘোষালের কর্মনৈপুণ্য বেহালাবাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরীকে একটা সাময়িক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সে সময় সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, পীযূষ-কান্তি দত্ত, জহরলাল মুখোপাধ্যায় ও অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লাইব্রেরীকে ভাঙনের হাত হতে রক্ষা করেন। প্রথমোক্ত দু'জন কর্মী লাইব্রেরীর নানা-ভাবে সেবা করে চলেছেন। জনসাধারণের প্রাণের যোগে এ লাইব্রেরীর পুষ্টি —এ একটা কম কথা নয়।

বেহালা লাইব্রেরী

বর্তমানে ১৩ জন সদস্য নিয়ে বেহালা লাইব্রেরীর কর্ম-পরিষদ গঠিত। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লাইব্রেরীর বর্তমানের সভাপতি, শ্রীপীযূষকান্তি দত্ত সম্পাদক, শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক ও শ্রীদেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরীর বর্তমানের লাইব্রেরীয়ান। লাইব্রেরীর আজীবন সদস্যের চাঁদা ১০০৲ টাকা আর প্রথম ও সাধারণ শ্রেণীর সভ্যের চাঁদা যথা-ক্রমে বারো আনা ও ছয় আনা আর জমা আট টাকা ও চার টাকা। লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক সংখ্যা পাঁচ হাজারের ওপর, এ ছাড়া স্থানাভাবে বহু মূল্যবান পুরাতন পুস্তক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ পাঠাগারে পত্রিকা ও পুস্তক পাঠের সুব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে প্রায় সবগুলো সাময়িক ও তিনখানা দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে।

এ বছর (১৯৫২) ডিসেম্বর মাসে লাইব্রেরীর সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। বহু স্মৃতিবিজড়িত বেহালা লাইব্রেরীর সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের সর্বপ্রকার সাফল্য আমরা কামনা করি। আশা করছি, চিরকাল এ লাইব্রেরী এই এলাকার গৌরবের বস্তু হয়ে থাকবে—জনসাধারণের প্রাণের যোগে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, আর দেশবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে অব্যাহত থাকবে এর যোগসূত্র।

[২২-৬-৫২]

রামমোহন লাইব্রেরী

পূর্ব-কলকাতায় লাইব্রেরী ও সাধারণ পাঠাগারের অভাব অনুভূত হতে থাকায় ইংরেজী ১৯০৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর পূর্ব-কলকাতার সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট লোকেরা এক সভায় মিলিত হন। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তাতে লাইব্রেরী ও সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। আরো প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তক ও নবভারতের স্রষ্টা রাজা রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার্থে সেটার নাম হ'বে রামমোহন লাইব্রেরী আর তা' স্থাপিত হ'বে রামমোহনের বাড়ীর কাছাকাছি। সেটা হ'বে সুরুচিসম্মত এক সংস্কৃতি কেন্দ্র যেখানে ভালো, দামী আর দরকারী গ্রন্থগুলো থাকবে আর দুর্নীতিপূর্ণ রচনা বা বই-এর জায়গা সেখানে হ'বে না। সেদিনই এ প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্যে লাখুটিয়ার বাবু দেবকুমার রায় চৌধুরী, বাবু হারাধন নাগ, পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রী জে এন বসু, শ্রী ডি এল রায়, বাবু রাজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, শ্রী ডি এন পাল, বাবু বসন্তকুমার নাগ ও বাবু শরৎচন্দ্র মজুমদারকে নিয়ে এক অস্থায়ী কমিটি গঠিত হ'ল আর এঁদের কাজে নানাভাবে সাহায্য করতে লাগলেন কিশোরীমোহন মিত্র আর তারাপদ ব্যানার্জী। এ অস্থায়ী কমিটির সম্পাদক ছিলেন পান্নালাল বসু (ভাওয়াল মামলার সুবিখ্যাত)। এ কমিটির কয়েকটি অধিবেশন বসে ও পরে ইংরেজী ১৯০৫ সালের ১৮ই মার্চ ১০।১।১, আপার সার্কুলার রোডের ভাড়াটে বাড়ীতে লাইব্রেরী ও পাঠাগারের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

কিন্তু আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। তার আগের দু' একটা ঘটনার যেটুকু পরোক্ষ প্রভাব আর যোগ রয়েছে এ লাইব্রেরীর সঙ্গে, এ প্রসঙ্গে সেটুকু বলতে হয়। ইংরেজী ১৮৮৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর সোমবার বিকেল ৪টায় সিটি কলেজ হলে কলকাতার জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে রামমোহন স্মৃতি-বাসর উদ্‌যাপন করেন। সে বিরাট জনসভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে রামমোহনের উপযুক্ত স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় (দ্বিতীয় প্রস্তাব)। নামকরা দৈনিকে এসম্বন্ধে মন্তব্য বেরোয়,—পুস্তক আর সাহিত্যের মারফৎ রামমোহন তাঁর প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন, রামমোহনের নামে লাইব্রেরী স্থাপনই তাঁর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার যোগ্যতম ব্যবস্থা। সে সভায় রামমোহন লাইব্রেরীর কর্মকর্তাদের ভেতর নরেন্দ্রনাথ সেন, জে সি বসু প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

লাইব্রেরীর প্রথম সভাপতি হ'লেন রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর আর সম্পাদক ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গোড়ার দিকে অনেক সহৃদয় ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা লাইব্রেরীকে পুস্তক উপহার দিয়ে সাহায্য করেছেন আর সংবাদপত্রের মালিকগণ সাহায্য করেছেন বিনামূল্যে সংবাদপত্র দিয়ে। তা' ছাড়া সরকারী প্রকাশিত পুস্তকাবলীও বিনা মূল্যে লাইব্রেরীতে প্রদত্ত হয়েছে। লাইব্রেরী স্থাপনের অল্পদিনের ভেতরই কলকাতা কর্পোরেশন থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। প্রথম বৎসর লাইব্রেরীতে সর্বমোট বই-এর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৯৪ খানা, তার মধ্যে ইংরেজী বই-এর সংখ্যা ৭৮৩ আর বাকি ৫৯১ খানা বাংলা ও সংস্কৃত। প্রথম থেকে বহু ব্যক্তি লাইব্রেরীর বই কেনবার জন্য অর্থানুকূল্য করেছিলেন। প্রথম বৎসর এর জন্যে ১৩৯২৲ টাকা পাওয়া যায়, তার মধ্যে রাজকুমার হৃষীকেশ লাহা ৫১৫৲ টাকা দিয়েছিলেন।

রামমোহন লাইব্রেরী ১০।১।১, আপার সার্কুলার রোডের ভাড়াটে বাড়ীতে আরম্ভ হয়। সেখান থেকে ১৯০৯ সালে ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে (বর্তমানে যেখানে ডি রতন রয়েছে) উঠে যায়। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরী ওখানে ছিল, পরে ১৯১৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর স্থায়ীভাবে বর্তমান নিজস্ব বাড়ীতে লাইব্রেরী চলে আসে।

প্রথম থেকেই লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর অভাব অনুভূত হ'তে থাকে। ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে গৃহ নির্মাণ তহবিল খোলা হয় আর লাইব্রেরী কমিটি জনসাধারণকে সেই তহবিলে অর্থ সাহায্য করতে অনুরোধ করে এক আবেদন পত্র প্রচার করেন। জনসাধারণের কাছ থেকে প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে অভাবনীয় সাড়া পাওয়া যায়। এক বছর যেতে না যেতেই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে চাঁদা ওঠে ৮০০০৲ টাকা। এর জন্যে মোটা রকমের টাকা দান

করেছেন বহু ব্যক্তি, তার মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে করছি। বোম্বের দামোদর গোবর্ধন দাস দিয়েছেন ৫০০০৲, বাংলা দেশের তখনকার লাট লর্ড কারমাইকেল ২৫০০৲, বর্ধমানের মহারাজা ২০০০৲, বামরার রাজা ত্রিভুবন দেও ১০০০৲, রাজা হৃষীকেশ লাহা ১০০০৲, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ১০০০৲, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৫০০৲, এমনি বহু লোকের বদান্যতায়ই তবে লাইব্রেরীর বর্তমান বিরাট নিজস্ব বাড়ী নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে সুকিয়া ষ্ট্রীটের সামনে সার্কুলার রোডের ওপারে আপার সার্কুলার রোডের ওপর ৮৫ ফুট বিস্তৃত ছয় কাঠা জমি কলকাতা কর্পোরেশন লাইব্রেরীকে ৯৯ বৎসরের জন্য অর্থাৎ স্থায়ী বন্দোবস্ত দেন (৬ই এপ্রিল ১৯১১, কর্পোরেশনের চিঠি নং এ।এস ৩৪) ইংরেজী ১৯১২ সালের ১১ই মে লাইব্রেরী গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আর বিনা লাভে মার্টিন কোম্পানী লাইব্রেরীর বর্তমান বাড়ী তৈরী করে দেন। এমনি রামমোহন লাইব্রেরীর সর্বত্র সকলের সহানুভূতি আর বদান্যতা মিশে আছে।

ইংরেজী ১৯১৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীতে মহাসমা-রোহে গৃহ-প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হয়, তাতে পৌরোহিত্য করেন বাংলা দেশের তখনকার লাট লর্ড কারমাইকেল। সে উৎসব সভায় উপস্থিত ছিলেন হার এক্সেলেন্সি লেডী কারমাইকেল, অনারেবল পি সি লায়ন, বর্ধমানের মহারাজা-ধিরাজ, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, লেডী অবলা বসু, রাজা হৃষীকেশ লাহা, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ পি সর্বাধিকারী, ডাঃ জে, টি সণ্ডারল্যাণ্ড, কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি প্রমুখ সে সময়ের বিখ্যাত সুধিবৃন্দ। লর্ড ও লেডী কারমাইকেল, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী, রাজা হৃষীকেশ লাহা, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতির সারগর্ভ বক্তৃতায় সে উৎসব দিনটি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

রামমোহন রায়ের নিজস্ব নিদর্শন হিসেবে তাঁর পৈতে, একগুচ্ছ মাথার চুল আর রামমোহন রায়ের নিজের হাতে লেখা একখানা চিঠি একটি কাচের ঢাকনাওয়ালা বাক্সে লাইব্রেরীতে রক্ষিত হয়েছে। লাইব্রেরীর অফিসে রয়েছে

রামমোহন রায়ের লেখবার বড় গোল টেবিলটি। মেরি কার্পেন্টারের লেখা লাষ্ট ডেইজ অব রাজা রামমোহন রায়' বই-এর তৃতীয় সংস্করণ ১৯১৫ সালে লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

লাইব্রেরীতে রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-প্রমাণ তৈলচিত্র রাখ হয়েছে। এ ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি, এল, রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্যার আশুতোষ মুখার্জী ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈলচিত্র লাইব্রেরীতে আছে।

বই কেনবার টাকা ও অনেকের গ্রন্থ সংগ্রহের উপহার পেয়ে রামমোহন লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হয়েছে। বই কেনবার জন্য ১৫০০৲ টাকায় পোস্তার রাণী কস্তুরমঞ্জরী সংগ্রহ ও ১০০০৲ টাকার বই-এ বর্ধমান সংগ্রহ স্থাপিত হয়েছে। তা' ছাড়া ডাঃ হীরালাল হালদারের দর্শনের গ্রন্থ-সংগ্রহ ও বিজ্ঞানের বই বাদে আচার্য প্রফুল্ল রায়ের গ্রন্থ-সংগ্রহ লাইব্রেরীতে স্থান পেয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, ফরাসী, মারাঠি ও তিব্বতী এই ছয় ভাষার গ্রন্থ-সংগ্রহ এই লাইব্রেরীতে প্রদত্ত হয়েছে, এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আচার্য জগদীশ বসু তাঁর উইলে রামমোহন লাইব্রেরীকে ৩০০০৲ টাকা দিয়ে গেছেন, তার সুদ থেকে বিজ্ঞানের বই বছর বছর কেনা হবে বলে, এটা লাইব্রেরীর 'আচার্য জগদীশচন্দ্র এণ্ডোমেণ্ট তহবিল' নামে পরিচিত। বর্তমান বৎসরে অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর ৭০০ গ্রন্থের এক সংগ্রহ লাইব্রেরীকে দান করেছেন।

রামমোহন লাইব্রেরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত রয়েছে। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লাইব্রেরীর সহকারী সভাপতি। রবীন্দ্রনাথের "বিচিত্রা অনুষ্ঠান" প্রথমে রামমোহন লাইব্রেরীতেই আরম্ভ হয়। তাঁর "শিক্ষার বাহন" ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৪শে অগ্রহায়ণ আর "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" ৪ঠা আগষ্ট ১৯১৭ প্রথম রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত হয় (রবীন্দ্র রচনাবালী, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৫৮৮,৫৯০)। তাঁর "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী" গানটি সর্বপ্রথম রামমোহন লাইব্রেরীতে সাধারণ্যে গীত হয়েছিল (র, র, ১৮-৫৯১ পৃঃ)। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় সমস্ত পুস্তক নিয়ে 'রবীন্দ্র

বিভাগ' নামে লাইব্রেরীতে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয়েছে।

লাইব্রেরীর আরম্ভ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন রায় নরেন্দ্র-নাথ সেন বাহাদুর, ১৯১০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন লর্ড এস. পি, সিংহ, ১৯১৪ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, তাঁর পরে সভাপতি হন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আচার্য রায়ের মৃত্যুর পর থেকে ১৯৪৯ সাল অবধি ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জী লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন, ১৯৫০ সাল থেকে বর্তমান লাইব্রেরীর সভাপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

৩০ জন সদস্য ও ১৫ জন কর্মকর্তা নিয়ে লাইব্রেরীর কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত কর্মকর্তাদের ভেতর রয়েছেন সভাপতি, সহঃ সভাপতি, সম্পাদক, সহঃ সম্পাদক, সহকারীদের সহ লাইব্রেরীয়ান, কোষাধ্যক্ষ ও হিসাবরক্ষক। লাই-ব্রেরীর আজীবন সভ্যদের দেয় চাঁদা ১০০৲ টাকা ও ৫০৲ টাকা; একশত টাকায় দু' খানা ও পঞ্চাশ টাকায় একখানা বই নেবার যোগ্যতা থাকে। সাধারণ সভ্যদের চাঁদা মাসিক ছয় আনা, তাদের জমা দিতে হয় ৫৲ টাকা।

লাইব্রেরীতে বর্তমানে সর্বমোট বই-এর সংখ্যা ২০ ২৯৬ খানা। সাধারণ পাঠাগারে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। পাঠাগারে পত্রিকার সংখ্যা হ'ল ১০ খানা দৈনিক, ৯ খানা সাপ্তাহিক, ৪ খানা পাক্ষিক, আর ২২ খানা মাসিকপত্র। লাইব্রেরীর শিশু-বিভাগ রয়েছে, সে বিভাগে শিশু-পাঠ্য বই-এর সংখ্যা ৫ শত আর চাঁদা চারি আনা। শিশু-বিভাগ প্রত্যহই খোলা থাকে।

লাইব্রেরীতে নববর্ষ উৎসব, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, বর্ষা-মঙ্গল, শারদোৎসব ও বসন্ত উৎসব হয়ে থাকে আর প্রতি বৎসর ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহন স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় লাইব্রেরীর সংস্কৃতি বৈঠক বসে ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হয়ে থাকে।

বর্তমানে রামমোহন লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার আর লাইব্রেরীয়ান শ্রীরামদুলাল ভট্টাচার্য। যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষের স্মৃতি-ঘেরা এ লাইব্রেরী বাংলা দেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবেই।

[১৪-৪-৫২]

কমার্সিয়াল লাইব্রেরী

কলকাতা নগরীর মাঝামাঝি পশ্চিম সীমা ঘেঁষে লালদীঘি, চারপাশে কর্ম-ব্যস্ত লোকের ছুটাছুটি, আনাগোনা। যানবাহন অবিরাম চলছে, ঘুরপাক খাচ্ছে ট্রাম-বাস চারদিকে দিনরাত। দীঘির চার পাড় ছাড়িয়ে সুপ্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার পরপারে ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি প্রকাণ্ড ইমারত একের পর এক। সহরের ব্যবসা ও কর্মকেন্দ্র—রাইটার্স বিল্ডিং, জেনারেল পোষ্ট অফিস, সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সরকারী বেসরকারী বিরাট বিরাট অট্টালিকাশ্রেণী, দক্ষিণ-পশ্চিমে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের ওপারে হাইকোর্টের চূড়া দেখা যায়। অদূরে নগরীর পশ্চিম সীমা ঘেঁষে ভাগীরথী উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিতা—পোর্টে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় জাহাজগুলো মাল খালাসের প্রতীক্ষায়। লালদীঘির চারদিক ঘিরে সরকারী বেসরকারী অফিসের আর অন্ত নেই। সারাদিন লোকের ভীড়, ট্রাম-বাসের ভীড়—গম গম করছে। অফিস, আদালত, পোর্ট, ব্যবসা-কেন্দ্র।

লালদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিরাট লাল অট্টালিকা, ১নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের বাড়ী। এই বাড়ীতেই কমার্সিয়াল লাইব্রেরী অবস্থিত। এ লাইব্রেরী এখানে অবস্থিত হবে, এটাই আশা করা যায়। কমার্সিয়াল লাইব্রেরী সাধারণ শ্রেণীর গ্রন্থাগার নয়, বিশেষ শ্রেণীর গ্রন্থাগার। যন্ত্র-সভ্যতার সমস্ত অগ্রগতির হিসেব রয়েছে এখানে—সরকারী দলিলপত্র আর ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে এখানে। বিজ্ঞান নানা দিকে, নানা বিভাগে আমাদের ব্যবহারিক শিল্পশ্রেণীকে সমৃদ্ধ করে তুলছে প্রতিদিন—প্রতিদিন চলছে আমাদের যান্ত্রিক শিল্পের উন্নয়ন আর উদ্ভাবন। আর সেই সমস্তের দলিলপত্র, হিসেব ও গ্রন্থরাজি নিয়েই কমার্সিয়াল লাইব্রেরীর বিশেষত্ব। আজকের দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য, যন্ত্রশিল্প আর বিজ্ঞানের নূতন নূতন উদ্ভাবনের বিষয়ে তথ্যপূর্ণ বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারের সত্যিকারের প্রয়োজন আছে। কমার্সিয়াল লাইব্রেরীতে এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক

সরকারের দলিলপত্র আর হিসেবও রয়েছে। ভারতে এ রকমের আর কোন লাইব্রেরী তো নেই-ই, সমস্ত এশিয়া খণ্ডেও এ রকমের দ্বিতীয় একটি লাইব্রেরীর কথা জানা নেই। এদিক দিয়ে কমার্সিয়াল লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। শোনা যায়, 'ইন্টারনেশন্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এডুকেশন সেন্টার'এর (আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বিদ্যা-বিষয়ক শিক্ষা-কেন্দ্র) অন্যতম শাখা কেন কলকাতায় খোলা হবে, একদিন এ প্রশ্ন উঠেছিল আর তার উত্তর পাওয়া গিয়েছিল কলকাতায় 'কমার্সিয়াল লাইব্রেরী'র অবস্থিতিতে।

১৯০৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কমার্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ও ষ্ট্যাটিষ্টিকস বিভাগ খোলা হয়। বর্তমানের কমার্সিয়াল লাইব্রেরী ও রিডিং রুম গোড়ায় ছোট একটি বিভাগীয় লাইব্রেরী মাত্র ছিল। কয়েকখানা মাত্র বই ও সাময়িক পত্রিকা নিয়ে তার আরম্ভ হয় ডিরেক্টর জেনারেল অব কমার্সিয়াল ইনটেলি-জেন্স-এর অফিস ঘরে। গোড়ার দিকে এ লাইব্রেরী শুধু বিভাগীয় ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকতো।

তারপর ১৯১৬ সালে ভারতে যন্ত্র-শিল্পের উন্নতির সূচনা হ'তে থাকে। ফলে এ বিভাগে নানা বিষয়ে তথ্য জানবার জন্যে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। তাতে করে এখানে আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত বই-পত্রের প্রয়োজন অনুভূত হ'তে থাকে। ক্রমে যন্ত্র-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের চাহিদা বেড়ে চলে ও প্রয়োজন তীব্রতর হয়ে ওঠে। এদিকে অনেকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কলকাতায় বিজ্ঞান, যন্ত্র-শিল্প ও ব্যবসা বিষয়ক আধুনিক বই-পত্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা জোরের সঙ্গে বলতে থাকেন। ফলে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

১৯১৯ সালে ডিরেক্টর জেনারেল অব কমার্সিয়াল ইনটেলিজেন্স বিভাগীয় লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করে কলকাতায় সাধারণ কমার্সিয়াল লাইব্রেরী ও পাঠাগার গড়ে তুলবার প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উপস্থিত হন। পরিশেষে ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন ও কমার্সিয়াল লাইব্রেরী সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হ'ল। ঠিক হ'ল কমার্সিয়াল লাইব্রেরী বিভাগীয় ডিরেক্টর জেনারেলের পরিচালনাধীনে চলতে থাকবে, পাঠাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, গ্রন্থাগার

থেকে জনসাধারণ বই নিয়ে যেতে পারবেন ও এটা আসলে হ'বে ব্যবসা-বাণিজ্য যন্ত্র-শিল্প ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন বিষয়ের আধুনিক রেফারেন্স গ্রন্থাগার। কেবলমাত্র এই সমস্ত বিশেষ বিষয়ের বইপত্রই এখানে রাখা হবে।

তারপর থেকে কমার্সিয়াল লাইব্রেরী ও পাঠাগারের দ্রুত উন্নতি হ'তে থাকে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও জনসাধারণ রেফারেন্সের জন্য এ লাইব্রেরী ব্যবহার করে আসছেন। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক লাইব্রেরীর জনপ্রিয়তাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। এর জনপ্রিয়তার নিদর্শন হিসেবে এটুকু বলা চলে যে, এ লাইব্রেরীতে যেখানে ১৯২০ সালে এসেছিলেন ৬,৪৪১ জন মাত্র পাঠক, সেখানে ১৯৫১ সালে পাঠকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৪,৪৯১ জন।

বর্তমানে কমার্সিয়াল লাইব্রেরীর বইয়ের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজারের মতো আর পাঠাগারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আসে, তার সংখ্যাও পাঁচশতের মতো হবে। এই লাইব্রেরীতে ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, যন্ত্র-শিল্প, কৃষি, বুক কিপিং, ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং, ধাতব ও খনিজ বিষয়ক, স্থাপত্য, রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারিং, পেইন্ট, তৈল, পাত্রস্থ করা ও রক্ষা, সাবান, তুলা, প্লাষ্টিক প্রভৃতি বিষয়ের অসংখ্য পুস্তক রয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ, সরকারী দলিলপত্র, গেজেট, গেজেটিয়ার্স, প্রাদেশিক সরকারের দলিল দস্তাবেজ, দৈনিক আমদানী রপ্তানীর হিসাব, সিভিল লিষ্ট, ম্যাপ এটলাস, দেশ-বিদেশের ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাবপত্র, পরিসংখ্যাবিজ্ঞান, সামুদ্রিক ও বৈমানিক ব্যবসায় বিষয়ক বইপত্র, আইন, এডভারটাইজিং ও শাসন সংক্রান্ত দলিলপত্র, ট্রেড ডিরেক্টারি ও ইয়ারবুক কৃষি ও জীবজন্তু বিষয়ক হিসাবপত্র প্রভৃতি অসংখ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের মূল্যবান বইপত্র এখানে সুরক্ষিত আছে। এ সব তথ্যপূর্ণ বিষয়ের গবেষণাকার্যে কমার্সিয়াল লাইব্রেরী সত্যি একান্ত অপরিহার্য।

কমার্সিয়াল লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে যেতে হয় বইয়ের দাম জমা দিয়ে, আর দরকার হয় দায়িত্বশীল ব্যক্তির বা গেজেটেড অফিসারের অনুমোদনপত্র। অবশ্য সরকারী চাকুরেদের টাকা জমা দেবার দরকার হয় না। শুধু বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তার কাছে লিখিয়ে নিতে হয় মাত্র। ভারতের সর্বত্র ডাকে বই

পাঠাবার ব্যবস্থা লাইব্রেরীতে রয়েছে। কলকাতা বা তার আশেপাশের লোকে সাত দিনের বেশী বই রাখতে পারে না, আর বাইরের লোকে বই রাখতে পারে একুশ দিন পর্যন্ত। সাত দিনের বেশী এই সময়কে ডাকে যাতায়াতের সময় বলে ধরা হয়ে থাকে। লাইব্রেরী থেকে কাহাকেও এক সঙ্গে তিনখানার অধিক বই নিতে দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ। এই লাইব্রেরীর পাঠকদের ভেতর বিশেষ করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতিগণ আর অধ্যাপক ও ছাত্রদেরই দেখা যায়। এ ছাড়া গবেষণা কার্যে অনেকেই এ লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন। কমার্সিয়াল লাইব্রেরীর পাঠাগারে গড়ে মাসিক ৬৫০০ বই পাঠকদের পাঠের জন্যে দেওয়া হয়।

কমার্সিয়াল লাইব্রেরী কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ডিরেক্টর জেনারেল অব কমার্সিয়াল ইনটেলিজেন্স এণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্স-এর তত্ত্বাবধানে এই লাইব্রেরীকে রাখা হয়েছে।

কমার্সিয়াল লাইব্রেরীর বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীফণীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় আর শ্রীফণিভূষণ রায় বর্তমানে লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান।

[১৫-৭-৫২]

হেমচন্দ্র পাঠাগার

খিদিরপুরে হেমচন্দ্র পাঠাগারে হেমচন্দ্র স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে প্রতি বৎসর ১০ই জ্যৈষ্ঠ। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ৯ই, ১০ই ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ কবি সম্মেলন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, স্মৃতিসভা ও সংকীর্তনের ভিতর দিয়ে স্মৃতি-বার্ষিকী ও কবিবর হেমচন্দ্রের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন উৎসব সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। সে উৎসবে সভাপতি ছিলেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন শ্রীসজনীকান্ত দাস। শ্রীদাস আবরণ উন্মোচন করতে উঠে সেদিন তাঁর বক্তৃতায় এ কথাগুলো বলেছিলেন,—

"বাংলা দেশের ভাব-জগতে কবিবর হেমচন্দ্র, মধুসূদন আর রঙ্গলাল এখান থেকেই বিপ্লবের সূচনা করেন। যে বিপ্লবের ভাব-বন্যা সমস্ত দেশ-প্লাবিত করে আজ উদ্দাম বেগে বয়ে চলেছে। তারি ধারা বেয়ে হেমচন্দ্র পাঠাগারের সৃষ্টি আর এরি ভেতর দিয়ে অবিরাম বয়ে চলা এ ধারা একদিন সার্থক হয়ে উঠবেই উঠবে।"

কেন তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন জানিনে, কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে সত্য এ কথাগুলো। সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রয়েছে দেশের জনসাধারণের, সাহিত্য সৃষ্টি করছে দেশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। সাহিত্যের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের ভেতর বৈপ্লবিক চেতনা আর তারপর এক একটা বিপ্লব প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে-চুরে গুঁড়ো করে দিয়েছে বাধার অচলায়তন, দেশ-বিদেশের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর নজির রয়েছে। যে বৈপ্লবিক চেতনা হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে ভাবধারা বাংলা দেশে, সেটা ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের ভেতর দিয়ে আর ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ও তারপরে যুগান্তর অনুশীলন প্রভৃতি বৈপ্লবিক দলের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

এই বৈপ্লবিক দলগুলো—যাদের আজকাল 'টেররিষ্ট' আখ্যায় অভিহিত করা হয়ে থাকে, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশকে বিদেশী শাসনের নাগপাশ

থেকে মুক্ত করা আর সঙ্গে সঙ্গে সেজন্য মানুষ তৈরী করাও ছিল তাদের একটা প্রধান কাজ। সে সময়ের ওই দলগুলোর কার্যকলাপের মধ্যে দেহ ও মনের সুসঙ্গত পুষ্টিসাধনের জন্যে সর্বত্র ব্যায়ামাগার ও লাইব্রেরী স্থাপনের নজির দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য বিদেশী শাসনের পুলিসী অত্যাচারের ঝাপটা কাটিয়ে ওঠা সেগুলোর পক্ষে অসম্ভব ছিল। হেমচন্দ্র পাঠাগার বহু ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করে সেই অগ্নিযুগের সাক্ষী হিসেবে আজো টি*ঁকে আছে, ভালোভাবেই টি*ঁকে আছে, এটা আনন্দের কথা।

দক্ষিণ কলকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্যগণ খিদিরপুরে মনসাতলায় ব্যায়ামাগার স্থাপন করলেন। সেটা ১৩১৪ বঙ্গাব্দের কথা, সমিতির সম্পাদক শ্রীপান্নালাল দে মনসাতলাস্থ অনুশীলন সমিতির সেই ব্যায়ামাগারের এক সামান্য পর্ণ-কুটীরে মাত্র ৮৫ খানি পুস্তক নিয়ে হেমচন্দ্র পাঠাগারের সূত্রপাত করলেন। কবি হেমচন্দ্র খিদিরপুরেই বাস করতেন, তাঁর স্মৃতি জাগ্রত রাখতে গোড়া থেকেই লাইব্রেরীর নামকরণ হয় হেমচন্দ্র পাঠাগার। হেমচন্দ্র পাঠাগার স্থাপনে সম্পাদকের সঙ্গে সে সময় সহযোগিতা করেছিলেন হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমহিমচন্দ্র দে, মাখনলাল দাস, বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরাও অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। বর্তমানে শ্রীপান্নালাল দে ও শ্রীমহিমচন্দ্র দে ছাড়া প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর আর কেহই বেঁচে নেই।

অল্পদিনের ভেতর অনুশীলন সমিতি রাজরোষে পতিত হ'ল, সদস্যদের ভেতর সকলেই পুলিসের সন্দেহে পড়লেন। পুলিসের হাত থেকে পাঠাগারকে বাঁচাতে হবে। পাঠাগার সরিয়ে নেওয়া হ'ল মনসাতলার ছোট এক বাড়ীতে। তারপর সেখান থেকেও রাতারাতি অপর একটি বাড়ীতে পাঠাগার সরিয়ে নিতে হ'ল। এতে করে পুলিশের হাত থেকে পাঠাগার বাঁচলো বটে, অনুশীলন সমিতির সঙ্গেও পাঠাগারের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল, আর উপরোক্ত সদস্যদের চেষ্টায় সমিতি নিরপেক্ষ হেমচন্দ্র পাঠাগার গড়ে উঠতে লাগলো। সেখান থেকে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাল্যের বাসভবন এ্যাণ্টিক হাউস নামক বিখ্যাত বাড়ীতে রায় বাহাদুর মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস-ভবনে পাঠাগার স্থানান্তরিত হয়। তখন পাঠাগারের তৃতীয় বৎসর চলছে।

এখানে পাঠাগার থাকাকালীন খিদিরপুরের প্রগ্রেসিভ সোসাইটি লাইব্রেরীর পুস্তকগুলো নগেন্দ্রনাথ মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও নিবারণচন্দ্র সরকার কর্তৃক পাঠাগারে প্রদত্ত হয়। তাতে করে শুধু যে পাঠাগারের কলেবর বৃদ্ধিই হ'ল তা' নয়, পাঠাগারের কাজও অনেক বেড়ে গেল। কিছুদিনের ভেতরেই উক্ত নগেন্দ্রনাথ মল্লিকের সঙ্গে পাঠাগারের সদস্যদের মতান্তর ও মনান্তর হ'ল আর নগেন্দ্রনাথ মল্লিক পুস্তকগুলো ফিরিয়ে পাবার জন্যে পুস্তক-গ্রহণকারী শ্রীপান্না-লাল দে'র নামে আলিপুর কোর্টে এক মামলা রুজু করলেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের একান্ত চেষ্টায় পরে এ মামলা আপোষে নিষ্পত্তি হয়েছিল।

এখানে স্থানাভাব হওয়ায় পাঠাগার স্থানান্তরিত হ'ল রামকমল ষ্ট্রীটের এক ভাড়াটে বাড়ীতে। এ বাড়ীতে থাকাকালীন গার্ডেন রীচ সি এম এস হাইস্কুলের হেডমাষ্টার ডাঃ এইচ ডব্লু বি মোরিস্নো তাঁর ১০০০ মূল্যবান ইংরেজী বই-এর সংগ্রহ পাঠাগারে দান করেন। এ সময় পাঠাগারের সম্পাদক ছিলেন ডাঃ মৃগাঙ্কভূষণ মুখোপাধ্যায়। দু' বছর পর মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীটে আরো বড় ভাড়াটে বাড়ীতে পাঠাগার স্থানান্তরিত হয় ও সেখান থেকে ওই রাস্তার ওপর অবস্থিত খিদিরপুর একাডেমি ভবনে উঠে যায়। এ সময়ে পাঠাগার পরিচালনা করেন শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আর ডাঃ অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়, জীবনহরি মুখোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠাগারের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। এই একাডেমি ভবনে পাঠাগারের উদ্যোগে প্রখ্যাত সারস্বত সম্মেলন হয়েছিল। এ সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন সুকুমার হালদার আই-সি-এস মহাশয় (শিল্পী অসিত হালদারের পিতা)। সম্মেলনে পঠিত পান্নালাল বাবুর 'চিত্তবিকাশে হেমচন্দ্র' প্রবন্ধটি 'মানসী' ও 'মর্মবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে পাঠাগারের কার্যকলাপ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। একাডেমি থেকে পাঠাগার ওঠে যায় রামকমল ষ্ট্রীটস্থ দোতলা বৃহৎ বাড়ীতে। সেখানে থাকাকালীন পান্নালাল দে, ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল জীবনহরি মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠাগারের নিজস্ব বাড়ী নির্মাণের উদ্যোগ-আয়োজন করতে থাকেন আর বিশেষভাবে সেজন্য অর্থ সাহায্য করেন অতুলচন্দ্র চৌধুরী

মহাশয়। অবশেষে তারাপদ ঘোষ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ব্যক্তির বদান্যতায় করপোরেশন প্রদত্ত জমির (স্থায়ী বন্দোবস্ত) ওপর পাঠাগারের নিজস্ব বাড়ী নির্মিত হল। ১৯২৩ সালে পাঠাগার ১১।১, মোহনচাঁদ রোডে নিজস্ব বাড়ীতে চলে আসে।

এখানেই হেমচন্দ্র পাঠাগারের উদ্যোগে সাতদিনব্যাপী কর্মসূচীর ভেতর দিয়ে মহা সমারোহে হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন কবি হেমচন্দ্রের বাড়ীর সামনে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব। দ্বিতীয় দিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে সভা হয়েছিল। তার পরদিন কবির জন্মভিটায় হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রামে কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচীর সভাপতিত্বে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে অনুরূপা দেবী, অধ্যাপক মন্মথ বসু, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। চতুর্থদিন তালতলা লাইব্রেরীতে সভাপতি ছিলেন সন্তোষকুমার বসু আর পঞ্চম দিনে বেহালা লাইব্রেরীর সহযোগিতায় বেহালা মিউনিসিপ্যাল হলে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ কালিদাস নাগ। এইরূপে সপ্তাহব্যাপী হেমচন্দ্র শত বার্ষিকী উৎসব আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

গত ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় পাঠাগার অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দুর্বৃত্তরা পাঠাগার লুটপাট করে ও আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর থেকে পাঠাগারের কর্মকর্তাদের চেষ্টায় দ্রুত পাঠাগারের উন্নতি হয়েছে। শ্রীমতী শচী দেবী তাঁর স্বামী মেজর এস সি চ্যাটার্জীর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে পাঠাগারে পুস্তকাধার সমেত ৪৩০ খানি ইংরেজী ও ৬০ খানি বাংলা মূল্যবান গ্রন্থ দান করেছেন। বর্তমানে পাঠাগারের পুস্তকের সংখ্যা এগারো হাজারেরও বেশী, আর দৈনিক মাসিকে গোটা কুড়ি পত্রিকা পাঠাগারে রাখা হয়েছে।

পাঠাগারের স্থায়ী সভ্যের চাঁদা আগে ৩০৲ টাকা ছিল বর্তমানে সেটা হয়েছে ১০০৲ শত টাকা ; সাধারণ সভ্যের চাঁদা বার আনা ও ছয় আনা। প্রথম শ্রেণী এক সঙ্গে দু' খানা বই নিতে পারেন আর দ্বিতীয় শ্রেণী নিতে পারেন মাত্র একখানা। সাধারণ সভ্যদের তিন টাকা করে জমা দিতে হয়।

পাঠাগারের কিশোর বিভাগ রয়েছে। সপ্তাহে চারদিন এই কিশোর বিভাগের কাজ হয়। কিশোর বিভাগে সভ্যদের এক টাকা জমা আর দু' আনা

করে মাসিক চাঁদা। এই কিশোর বিভাগে বর্তমানে ১ হাজারের মতো কিশোর পাঠ্য বই রয়েছে। এই বিভাগে সভ্যসংখ্যা বর্তমানে ১১৫ জন।

পাঠাগারের বর্তমান সভাপতি শ্রীসীতাপতি মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ ও লাইব্রেরীয়ান শ্রীমদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ঊনিশ বৎসর ধরে পাঠাগারের উন্নতির জন্য সুশীলচাঁদ চন্দ্রের নিঃস্বার্থ সেবা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই।

[২৬-২-৫২]

বান্ধব লাইব্রেরী

ছোট গলির ভেতর নাম করা প্রকাণ্ড বাড়ী। ভুজঙ্গভূষণ ধরের বাড়ী বললে আশে পাশের সবাই দেখিয়ে দেয়। ৬নং জেলেপাড়া লেনের এ বাড়ীর সদর দরজার ডান দিকের ছোট বৈঠকখানা ঘরে ১৯০৮ সালে বান্ধব লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছিল।

বান্ধব লাইব্রেরীর আরম্ভের ইতিহাস বিচিত্র।

৺ভুজঙ্গভূষণ ধর আর বলাই চাঁদ দে দুই বন্ধু। বলাইচাঁদ বাবুর বর্তমানে বয়স হয়েছে। ভুজঙ্গ ধর তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। দুই বন্ধুতে মিলে যুক্তি ঠিক হল, পাড়ায় লাইব্রেরী স্থাপন করতে হবে। কিন্তু শুধু হাতে তো আর আরম্ভ করা চলে না? ভুজঙ্গবাবু মায়ের কাছে গিয়ে পঁচিশটা টাকা চাইলেন। মাকে বোঝালেন, এ পঁচিশ টাকা তো তোমার পুঁজি মা, এ রইল। একবার লাইব্রেরী আরম্ভ হোক, তারপর সভ্যদের চাঁদায় দেখো না তোমার কত আয় হয়। অকাট্য যুক্তি, লাভের ব্যবসা—মাকে রাজী হতেই হ'ল। আয়ের কথাটা হয়তো তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না, কিন্তু ছেলের খেয়ালের কথা বুঝলেন ঠিকই। ভুজঙ্গ ধর মায়ের কাছ থেকে একটি আলমারী আদায় করে নিলেন। সে আলমারী আজো বান্ধব লাইব্রেরীতে রয়েছে। বলাইচাঁদ বাবুকেও একটি কাঁচের ঢাকনাওয়ালা আলমারী দিতে হল। এইরূপে নিজেদের চেয়ে আনা কয়েকখানা মাত্র বই নিয়ে সেদিন গোড়াপত্তন হয়েছিল বান্ধব লাইব্রেরীর। ভুজঙ্গ ধরের পিতা বঙ্কুবিহারী ধর পুত্রের এই সমস্ত কাজে অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন। ভুজঙ্গবাবুর দেহচর্চা ও সভাসমিতি করে বেড়ানো ব্যাপারেও তাঁর পিতার বরাবরই উৎসাহ ছিল। ইতিমধ্যে লাইব্রেরীর সঙ্গে এসে যুক্ত হ'লেন কুলচন্দ্র দত্ত, সতীশচন্দ্র বসু, জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস, রাধিকারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, যামিনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও গোষ্ঠবিহারী শীল প্রভৃতি যুবকবৃন্দ। অর্থ সাহায্যে ও বইপত্র দানে এঁরা লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এঁদেরকেই বান্ধব লাইব্রেরীর প্রথম উদ্যোক্তা বলা চলে।

লাইব্রেরী ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলো।

বান্ধব লাইব্রেরী নামটাই বিশেষভাবে অর্থদ্যোতক, নামের ভেতর গোপন রয়েছে একটা ভ্রাতৃত্বের ভাব। সে সময়ের ইতিহাস না জানলে এ লাইব্রেরীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ রইবে। বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে তখন বাংলার জাগ্রত জনমত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, স্বদেশী আন্দোলনের 'রাখীবন্ধন' সৌখ্যের ডোরে একপ্রাণ আর একতার বাণী পৌঁছে দিয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে। সে মাত্র অল্প দিন আগের কথা। বিলাতী বর্জন চলছে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে। বাঙালীর জাতীয় জীবনে তখন চলছে একটা আত্মসমীক্ষার যুগ—জীবন-মরণ সমস্যা উত্তীর্ণ হতে হবে যোগ্যতার সাধনায়। ভেতরে ভেতরে বিপ্লবের বহ্নি-শিখা ধিকি ধিকি জ্বলছে সারা দেশের বুক জুড়ে। বৌবাজারের 'আত্মোন্নতি সমিতি' বিপ্লবী দলগুলোকে যোগান দিয়ে চলেছে আগ্নেয়াস্ত্রের। আত্মোন্নতি সমিতির সঙ্গে বান্ধব লাইব্রেরীর সাক্ষাৎ যোগ কতটুকু ছিল বলা শক্ত। কিন্তু পরোক্ষ যোগ যে ছিল সে বোঝা যায়। লাইব্রেরীর পরিচালকদের অনেকেই ছিলেন সমিতির বিশিষ্ট কর্মী, এমন কি ভুজঙ্গ ধর বাবুও সমিতির সদস্য ছিলেন। রড্‌ডা কোম্পানীর পিস্তল লুটের মামলায়ই হোক বা আত্মোন্নতি সমিতির ফোর্ট উইলিয়াম দখলের চেষ্টার জন্যেই হোক ভুজঙ্গভূষণ ধর ও আরো অনেককেই জেলে যেতে হয়েছিল। বান্ধব লাইব্রেরীর নামের ওপর সমিতির আর আন্দোলনের প্রভাব কতটুকু বর্তেছিল আজ বলা শক্ত।

যা হোক, ১৯০৮ সালে ৩নং জেলেপাড়া লেনের ছোট ঘরে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় ও সদস্যদের চেষ্টায় দিন দিন বাড়তে থাকে। বান্ধব লাইব্রেরী তখন ঠিক সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল না, পঁচিশ-ত্রিশ জন সভ্যের ভেতর অনেকটা ঘরোয়া লাইব্রেরীর মতোই চলতে থাকে। প্রথমে লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য ছিল সভ্যদের ভেতর ভ্রাতৃত্বের ভাব বৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন, সমাজসেবা প্রভৃতি। ক্রমে বেড়ে ওঠা লাইব্রেরীর কর্মপন্থা ব্যাপকভাবে জনসাধারণের দিকে প্রসারিত হ'তে থাকে ও জনসাধারণের মধ্যে ভাল ভাল বই-এর প্রচার, বিতর্ক সভা, সাহিত্য সভা প্রভৃতি লাইব্রেরীর মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সমাজসেবা বিভাগ ও নাট্যাভিনয় বিভাগ একেবারে গোড়ার দিক থেকেই বান্ধব লাইব্রেরীর কর্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাট্যাভিনয় বিভাগের প্রধান উদ্যোক্তা

ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস ও জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় (মামা) আর ৫নং জেলে পাড়া লেনে ৺শ্রীদামচন্দ্র দে'র মাঠে কর্মফল, রাণাপ্রতাপ, শাস্তি কি শান্তি— এই তিনখানা নাটক বান্ধব লাইব্রেরীর সভ্যদের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে সে সময়ে অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়। এই ৩নং জেলে পাড়া লেনেই লাইব্রেরী রীতিমতো বেড়ে ওঠে আর সামান্য ঘরোয়া ব্যাপার থেকে একেবারে প্রথম শ্রেণীর সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। এ সময় গগনচাঁদ বড়ালের চেষ্টায় লাইব্রেরী কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সাহায্য পেতে আরম্ভ করে। এতো ছোট ঘরে লাইব্রেরীর স্থান সঙ্কুলান ও বর্ধিত কার্যকলাপ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠে। ফলে ১৯১১ সালে বান্ধব লাইব্রেরী ১৮৬নং বৌবাজার ষ্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ীতে উঠে যায়। এ সময়ে সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় নৃসিংহপদ দত্ত, উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক, শিশিরকুমার রায়, চারুচন্দ্র নন্দী, দুর্গেশরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জহরলাল মল্লিক, গোকুলচাঁদ বড়াল প্রভৃতি লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগ দিয়ে লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। অবশ্য ভুজঙ্গভূষণ ধর বান্ধব লাইব্রেরীর সঙ্গে সব সময়ই যুক্ত ছিলেন। এ সময়কার লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সালে বান্ধব লাইব্রেরী ১৮৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীটের বর্তমান ভাড়াটে বাড়ীতে উঠে আসে। ১৯১২-১৩ সালে বান্ধব লাইব্রেরীর সমাজসেবা বিভাগ ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার বিভাগে কাজ খুব ভাল চলতে থাকে। ১৯৩০-৩১ সালে বিভূতিভূষণ মিত্র লাইব্রেরীর সম্পাদক ছিলেন। লাইব্রেরীর জন্য তাঁর অর্থ সাহায্য ও নিঃস্বার্থ সেবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বান্ধব লাইব্রেরীর বর্তমান কার্যকলাপের ভেতর তেমনভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু আছে বলে মনে হয় না। বই লেন-দেন, নাট্যাভিনয় বিভাগ প্রভৃতির কাজ চলেছে অনেকটা গতানুগতিকভাবে। লাইব্রেরীতে গেলে অনুভব করা যায় নূতন কর্মপন্থা অনুসরণে এখানে আজ নূতন প্রাণ সঞ্চারের একান্ত প্রয়োজন। লাইব্রেরীর বাৎসরিক অনুষ্ঠানের ভেতর নেতাজী-জন্মোৎসব, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, বিজয়া সম্মিলনী ও সরস্বতী পূজা উল্লেখযোগ্য। লাইব্রেরীর পুস্তক নির্বাচন উপ-সমিতি সেক্রেটারী, লাইব্রেরীয়ান ও তিনজন সাধারণ সদস্য নিয়ে গঠিত।

বান্ধব লাইব্রেরী

বান্ধব লাইব্রেরী সকাল ৭টা থেকে ৮টা ও বিকেল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানকার আজীবন সদস্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। লাইব্রেরীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর আজীবন সদস্যদের চাঁদা যথাক্রমে আড়াই শো টাকা, দু'শো টাকা ও দেড়শো টাকা। শ্রেণী হিসাবে ওঁরা ৩ খানা, ২ খানা ও একখানা বই নিতে পারেন। এ-ছাড়া লাইব্রেরীর সাধারণ সদস্যদের ভর্তি ফিস এক টাকা, জমা তিন টাকা ও মাসিক চাঁদা আট আনা করে। একখানা করে বই নেবার ওদের যোগ্যতা আছে। জমা ও চাঁদা যাঁদের দ্বিগুণ তাঁরা দু'খানা করে বই নিতে পারেন।

বান্ধব লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক সংখ্যা বারো হাজারেরও ওপর। এনসাই-ক্লোপিডিয়া, বিশ্বকোষ প্রভৃতি অভিধান ছাড়া এখানে বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য ইতিহাসের বই আছে। মরিসের হিষ্ট্রী অব হিন্দুস্থান, রেণেলের মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অব হিন্দুস্থান অব মোগল এম্পায়ার, বোম্বে গেজেটিয়ার ১ম ও ২য় খণ্ড, হিষ্ট্রী অব কঙ্কন ডেকান এণ্ড সাউথ মারহাট্টা, আর্থার এডোয়ার্ড উয়েইট প্রণীত দি হারমেটিক এণ্ড এলকেমিকেল রাইটিং অব পেরাসেলসাস দি গ্রেট, অস-বোর্ণের কোর্ট এণ্ড কেম্প অব রঞ্জিৎ সিং, জন ব্রিগ-এর রাইজ অব মোহামেডান পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া (১৫১২), কর্ণেল মেলিসন্সের ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি ১৮৫৭-৫৮, এস, সি হিলের ইণ্ডিয়ান রেকর্ড সিরিজ, বেভারিজ-এর ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ কম্প্রিহেনসিভ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি অসংখ্য ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য পুস্তক রয়েছে বান্ধব লাইব্রেরীতে। এদিক দিয়ে এই গ্রন্থাগার সত্যি সমৃদ্ধ। লাইব্রেরীর পাঠাগারে পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে সেখানে তিনখানা দৈনিক পত্রিকা, পাঁচখানা বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা সর্বসাধারণের পাঠের জন্য রাখা হয়ে থাকে।

শ্রীজানকীনাথ ঘোষ বান্ধব লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান, শ্রীধনঞ্জয় রায় সম্পাদক আর বর্তমানে লাইব্রেরীর সভাপতি হচ্ছেন কুমার কার্তিকচন্দ্র মল্লিক।

[৮-৩-৫২]

জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী

পশ্চিমমুখী দরজা। দরজার ঠিক ওপরটায় টাঙ্গানো হয়েছে 'কাঙালী-ভোজনের' ফটো। কাঙালীরা পাত পেড়ে বসেছে রাস্তার দু'ধারে, পরিবেশন করে চলেছেন কর্মীবৃন্দ আর পাড়ার গণ্যমান্য মুরুব্বিরা সেটা দাঁড়িয়ে দেখছেন। সেদিন জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী আজকের অবস্থায় ছিল না, এক-একটা উৎসব অনুষ্ঠানে হাজার দু' হাজার টাকা খরচ হয়ে যেতো। শুধু খরচ নয়—সেটা সার্থক হয়ে উঠতো সেবার ভেতর দিয়ে। জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরীর সরস্বতী পূজো,—এর নাম-ডাক ছিল বাইরে। পাড়ার বৃদ্ধদের মুখে এর আনন্দোজ্জ্বল বর্ণনা এই টাঙানো ফটোর চেয়েও সুন্দর। বলতে বলতে তাঁদের চোখ দু'টো চিক চিক করতে থাকে, যেন তারা অতীতের এক সার্থক সুখ-স্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। শীর্ণ মুখের উপর সেদিনের আনন্দের অভিব্যক্তি দেখতে দেখতে আশেপাশে সংক্রমিত হয়। এখানে হুবহু তাঁদের মুখের কথা-গুলো তুলে দেবার চেষ্টা করছি,—

—পূজোর দিন বিকেলবেলায় 'কাঙালীভোজন' হতো। কাশী বোস লেনের মুখ থেকে সুরু করে হরি ঘোষ ষ্ট্রীটের দু'ধারে পাতা পেতে সব বসেছে আর প্রসাদ খাচ্ছে। সে কি আজ কালকার মতো দু'টুকরো কলা আর এক টুকরো শশার খুরী ? পরমান্ন, খিচুড়ী, লুচি, নানারকম তরকারী, দই, দরবেশ, মায় নকুড়ের কড়া পাকের সন্দেশ পর্যন্ত পরিবেশন করা হচ্ছে। যতীনবাবু (যতীন্দ্রনাথ পাল), সুপ্রসন্নবাবু, কবিরাজ মশাই (কবিরাজ বিষ্ণুচরণ রায়) প্রভৃতি সকলে পরিবেশন ঠিক হচ্ছে কি না দেখছেন—

এর থেকে পূজোর আড়ম্বরের একটা অনুমান ক'রে নেওয়া যায়। এর চেয়েও আড়ম্বরে সম্পন্ন হ'তো লাইব্রেরীর 'বিজয়া-সম্মিলনী'। 'বিজয়া-সম্মিলনী' ছিল প্রধানতম উৎসব জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরীর। সেদিন যে পরিমাণ টাকা তাতে খরচ হ'ত, আজকের দিনে সেটা অপব্যয় আর উপকথা বলে মনে হয়, অবশ্য

উৎসবের একটা বে-হিসেবী দিকও আছে। 'বিজয়া-সম্মিলনী' ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট বা সঙ্গীত-সমাজে অনুষ্ঠিত হ'ত। তাতে সভাপতিত্ব করেছেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, নাটোরের জগদীন্দ্রনাথ রায়, রায় বাহাদুর জলধর সেন প্রভৃতি। লাইব্রেরীর সেদিন আজ আর নেই।

জ্ঞানদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর 'বিকাশ-সমিতি' এ নাম দুটোকে একত্র জড়িয়ে নিয়ে লাইব্রেরীর নামকরণ হ'ল জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী। জ্ঞানদাসবাবুর বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ, লেখাপড়া শেষ করে চাকুরিতে মাত্র ঢুকেছেন, তাঁর নিজস্ব চার-পাঁচশ বই নিয়ে লাইব্রেরীর আরম্ভ হয়। আর বিপ্লববাদী 'বিকাশ সমিতি'র এটা ছিল একটা সাংস্কৃতিক মুখোস;—উদ্দেশ্য পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া। অনুশীলন সমিতির স্থানীয় শাখা প্রশাখা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করতো, বিকাশ-সমিতিও ছিল তারি একটা। লাঠি খেলা, ছুরি খেলা আর বিপ্লবী কার্যকলাপ ছাড়াও এ সমস্ত বিপ্লবী সঙ্ঘের সমাজসেবার ব্যাপক সুব্যবস্থা থাকতো—আর বিকাশ-সমিতিরও সেটাই ছিল আদর্শ। পুলিসী জুলুম আর রাজরোষের প্রচণ্ড ধাক্কায় 'বিকাশ-সমিতি' ভেঙে যায়, কিন্তু তারি জের টেনে আজো জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী টিকে আছে।

১৯০৯ সালে দর্জিপাড়ার ছেলেদের চেষ্টায় জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন জ্ঞানদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মটিবাবু', বনোয়ারীলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। জগদীশনাথ রায় লেনের একটি ছোট ঘরে লাইব্রেরীর কাজ চলতে থাকে। লাইব্রেরীর প্রথম সভাপতি ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক আর সম্পাদক ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরী এখানেই ছিল। ইতিমধ্যে লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা আর কার্যকলাপ বেড়েই চলে। ফলে লাইব্রেরী এখান থেকে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট আর সাহিত্য-পরিষদ ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলের বাড়ীতে উঠে যায়। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরী এখানেই ছিল। এই সালেই লাইব্রেরী এখান থেকে আরো দু'এক জায়গায় ঘুরে ৩৭নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীটের বর্তমান বাড়ীতে একতলার দু'খানা ঘরে উঠে আসে। লাইব্রেরীতে তখন বই এর সংখ্যা আট-নয় হাজার, সভ্য-সংখ্যাও যথেষ্ট।

দশ বছর ভালো ভাবেই কাটলো। ১৯৩৬-৩৭ সালে কাশীকিঙ্কর রায়

চৌধুরী সেক্রেটারী হলেন, হাত বদলে কার্য-নির্বাহক সমিতি গেল অন্য লোকের হাতে তখন। লাইব্রেরীর অবনতি এইখানেই সুরু। জনসাধারণের সঙ্গে লাইব্রেরী যোগসূত্র হারাতে আরম্ভ করে এখান থেকেই। মানুষের প্রাণের স্পর্শেই মানুষের প্রতিষ্ঠানগুলোর দাম। সে সম্পর্ক যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন প্রাণহীন প্রতিষ্ঠানের মরা কাঠামোটাই মাত্র খাড়া থাকে, দূর থেকে সব কিছু ঠিক চলছে মনে হলেও ঠিক আর চলে না।

পাড়ার লোকেরা গা-ঢিলে দিলে, বই দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক ছাড়া লাইব্রেরীর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রইলো না। ক্রমে সভ্যসংখ্যা কমতে লাগলো, আর নিয়মে দাঁড়ালো বই নিয়ে তা আর ফেরৎ না দেওয়াটাই। সব চেয়ে লজ্জার কথা, পুরানো বই-এর দোকানে জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরীর বই দেখা যেতে লাগলো। আমরা যে এতো ছোট হয়ে যেতে পারি—একথা ভাবতে সত্যি বাধে। শুধু বাধে নয়, এমন কাজের জন্যে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারিনে, করা উচিত নয়। এদিকে ভেতরের অব্যবস্থার ফলে আলমারির বই উইপোকা কাটতে লাগলো। এমনি চললো বছরের পর বছর। একদিন দেখা গেল লাইব্রেরী ঘরে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের কোচিং ক্লাস খোলা হয়েছে। সেটা ১৯৫০-৫১ সালের কথা।

এমন অব্যবস্থা যাদের লাইব্রেরী তারা সহ্য করতে পারে না, তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলো। এবার এগিয়ে এলেন পাড়ার সবাই, এমনটা চলতে দেওয়া যায় না, প্রতিকার এর করতেই হবে। এগিয়ে এলেন 'দর্জিপাড়া মিলন-সঙ্ঘ', আর 'জাতীয় কল্যাণ-সঙ্ঘে'র কর্মিবৃন্দ। নূতন কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হল, সভাপতি হ'লেন শ্রীসতীশচন্দ্র পালিত, সম্পাদক শ্রীতারক বন্দ্যোপাধ্যায়, আর শ্রীকৃষ্ণদাস গুপ্ত হলেন বর্তমান লাইব্রেরীয়ান। গোড়া থেকে না হোক গড়ার কাজ আবার সুরু হ'ল।

লাইব্রেরী বর্তমানে বই-এর সংখ্যা হাজার পাঁচেক হবে, আর পাঠাগারে বর্তমানে রাখা হয়েছে দৈনিকে-মাসিকে মিলিয়ে উনিশখানি পত্র-পত্রিকা। ধর্মবন্ধু (১২৯৪), ভারতী (১৩০৮), পন্থা (১৩১০) প্রভৃতি অনেকগুলে পুরানো মাসিক পত্রিকা লাইব্রেরীকে আছে আর আছে দেশ-বিদেশের অনেক নাটক আর নাট্যশালা বিষয়ক পত্রিকা যা দিয়ে অনায়াসে লাইব্রেরীর একটা বিভাগ

খোলা যেতে পারে।

জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরীকে খোয়াতে বসে এবার এর সত্যিকার মূল্য সবাই বুঝতে পেরেছেন। লাইব্রেরীর এবার নবজন্ম হ'ল বলা চলে। চেষ্টা যেভাবে চলছে, তাতে করে লাইব্রেরী অল্পদিনের ভেতরই তার খ্যাতি আর ঐতিহ্যের সম্মান রেখে চলতে পারবে। এবার আর জ্ঞানদাসবাবুও নয়, বিকাশ সমিতিও নয়, জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী এবার নিজের নামেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। মানুষের সম্পর্কে থেকে মানুষের কাজে লাগাতেই মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের সার্থকতা। মানুষের সঙ্গে প্রাণের যোগসূত্র হারালে যত বড় প্রতিষ্ঠানই হোক সেটা টিকবে না—সেটা টিকে থাকতে পারে না।

[৩০-৩-৫২]

হিরণ লাইব্রেরী

১১নং বিডন ষ্ট্রীটের এক ভাড়াটে বাড়ীতে হিরণ লাইব্রেরী বর্তমানে অবস্থিত। নামকরা বড় লাইব্রেরী, প্রাচীনতাও তার কম নয়। ১৯০৯ সালের ১৩ই মার্চ হিরণ লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে। এ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান, অবশ্য যে লাইব্রেরীকে সম্পূর্ণভাবে তার সভ্যদের ওপরেই নির্ভর করে চলতে হয়, জনপ্রিয় না হয়ে তার উপায় নেই। হিরণ লাইব্রেরীর ব্যাপারে বোধ হয় তার ঠিক উল্টোটাই সত্য, সকলের প্রিয় বলেই তা শুধু সভ্যদের ওপর নির্ভর করে চলতে পারছে।

হিরণ লাইব্রেরী নিজস্বতায় একক। এ লাইব্রেরীর কোন জমা-তহবিল নেই, আর এ লাইব্রেরী এই দীর্ঘদিনের ভেতর কারো কাছে এক পয়সা সাহায্যও নেয়নি। এক হিরণ লাইব্রেরী ছাড়া সম্ভবতঃ এমন উদাহরণ দ্বিতীয় আর একটা মিলবে না। যেখানে পেছনে অর্থ রয়েছে, অনর্থও সেখানেই দানা বেঁধে উঠেছে। অবশ্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জনসাধারণ নিজেদের জড়িত করবে, তার ভালমন্দের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেবে এটা এমন অস্বাভাবিক একটা কিছু নয়, কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যেখানে অর্থ রয়েছে, সেখানেই দলাদলি আর ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব। হিরণ লাইব্রেরীর কে'ন জমা-তহবিল নেই, চাঁদার টাকা বইপত্র কেনা ও বাঁধাই ইত্যাদিতে নিঃশেষে খরচ হয়ে যায়। এ দিকে লাইব্রেরী চলছে ভালোভাবেই।

লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীহিরণকুমার ঘোষের নামেই লাইব্রেরীর নাম হিরণ লাইব্রেরী। হিরণকুমার ঘোষ গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত অলিখিত অনির্বাচিত অথচ সর্বজন-স্বীকৃত সভাপতি ও সম্পাদক। পাড়ার কয়েকজন উৎসাহী যুবক তাঁকে সাহায্য করেছেন আর হিরণবাবুই লাইব্রেরীয়ানের কাজও করেছেন ১৯০৯ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত। তারপর ক্রমে তিনি অন্য দিকে (চাকুরি ইত্যাদিতে) জড়িত হয়ে পড়লেন আর অতি স্বাভাবিকভাবেই লাইব্রেরীয়ানের দায়িত্ব বর্তালো কর্মী যুবকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ীর ওপর। দ্বিজেন্দ্রলাল

ভাদুড়ী, তাঁর ভাই জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী ও পাড়ার কয়েকজন উৎসাহী যুবক লাইব্রেরীর কাজ চালাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ভিন্ন পাড়ার ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এসে লাইব্রেরীতে যোগ দিলেন। ধীরেনবাবু গোড়ায় সভ্যই ছিলেন না, অপর এক সভ্যের বই নিতে লাইব্রেরীতে আসতেন অথচ ১৯২২ সালে দেখা গেল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি হিরণ লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হয়ে গেছেন আর লাইব্রেরী পরিচালনার দায়িত্ব এসে তাঁর ওপরেই বর্তেছে। হিরণ লাইব্রেরীর উন্নতির মূলে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের নিঃস্বার্থ সেবা রয়েছে অনেকখানি। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অন্যান্য লাইব্রেরীয়ানদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা হিরণবাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ ১৯৩৬ সালে এসে যোগ দেন। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ হিরণ লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ছিলেন আমৃত্যু ১৯৫০ সাল অবধি। তাঁর মৃত্যুর পর বর্তমানে লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হয়েছেন শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ আর তাঁর সঙ্গে কাজ করে চলেছেন শ্রীগোপালচন্দ্র দে, শ্রীনিমাইচাঁদ দে, শ্রীবিমলকুমার ঘোষ (ধীরেনবাবুর পুত্র), শ্রীশ্যামসুন্দর দত্ত ও শ্রীভাগবৎচন্দ্র প্রধান। এঁদের ভেতর থেকেই পরবর্তী লাইব্রেরীয়ান একজন হবেন নিজের নিঃস্বার্থ কর্মক্ষমতায় যোগ্যতায়। গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত লাইব্রেরী চলছে অবৈতনিক সেবাকার্যের ভেতর দিয়ে। সুবিধের মাপকাঠিতে লাইব্রেরীর যে নিয়ম নির্ধারণ করেন লাইব্রেরীয়ানরা এ লাইব্রেরীর সভ্যদের সে নিয়ম মেনেই চলতে হয়।

শ্রীহিরণকুমার ঘোষকে কেন্দ্র করে বিমলকৃষ্ণ ঘোষ, মাণিকলাল বসাক, সুরেন্দ্রনাথ দেব প্রভৃতি তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা 'হিরণ-নাট্য সমাজ' নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, আসলে হিরণবাবুর বাড়ীর ছোট এক ঘরে সে ছিল পাড়ার যুবকদের ক্লাব। সেখানে সকলে এসে জড় হতেন। হিরণবাবুর অভিনয়ে ঝোঁক ছিল, নিজেও তিনি ভাল অভিনয় করতে পারতেন (হিরণবাবু এ জি বেঙ্গল-এ কাজ করতেন, সেখানেও তিনি ছিলেন ড্রামাটিক ডিরেক্টার। লাইব্রেরী স্থাপনের দিকে হিরণবাবুদের পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ঝোঁক ছিল। তাঁর পিতামহ ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের ('হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, পরবর্তীকালে 'বেঙ্গলী' সুরেন্দ্রনাথের হাতে আসে) নিজস্ব লাইব্রেরী ছিল, লাইব্রেরী ছিল হিরণবাবুর পিতা ৺অবিনাশচন্দ্র ঘোষেরও। সে লাইব্রেরী আজো তাঁদের বাড়ীতে রয়েছে।

ক্লাবের সভ্যেরা হিরণবাবুর কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে পড়তেন, ক্রমে তাঁরা হিরণবাবুকে ধরে বসলেন নিজস্ব লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য। সহজেই হিরণবাবু এ প্রস্তাবে সাড়া দিলেন। ফলে ১৯০৯ সালের ১৩ই মার্চ ৮।১, কাশী ঘোষের লেনে হিরণবাবুর বাড়ীর সেই ছোট ক্লাব ঘরে ১৭ খানা বই ও একটা আলমারি নিয়ে হিরণ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হলো।

গোড়ার দিকে নাট্যসমাজের সভ্যরাই ছিলেন লাইব্রেরীরও সভ্য। হিরণবাবুর টাকায় বই-এর সংখ্যা বেড়ে চললো, আর লাইব্রেরীকে সাধারণ গ্রন্থাগারের রূপ দেবার জন্য সদস্যদের মাসিক চাঁদা করা হল দু'আনা করে। সাধারণ পাঠাগারের একটা ব্যবস্থা লাইব্রেরীর সঙ্গে রইল। বই কেনবার টাকা যুগিয়ে চললেন হিরণকুমার ঘোষ আর লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য খেটে চললেন পাড়ার দু'চার জন উৎসাহী যুবক। হিরণ লাইব্রেরী সাধারণ গ্রন্থাগার হলেও ১৯০৯ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এ লাইব্রেরী হিরণবাবুর বাড়ীতেই ছিল। লাইব্রেরী বেড়ে একখানা থেকে দু'খানা কোঠায় ও তারপর একখানা নূতন ঘরে স্থানান্তরিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ীর আমলে ইংরেজী বই-এর বিভাগ খোলা হয় প্রথম। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরীর যাবতীয় খরচ যুগিয়েছেন হিরণকুমার ঘোষ, এ সময়ের মধ্যে হিরণ লাইব্রেরীর বইপত্র কেনবার জন্য তিনি কমপক্ষে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা খরচ করেছেন। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ১৯৩৭ সালে হিরণ লাইব্রেরী হিরণবাবুর বাড়ী থেকে ওঠে যায় নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ীতে। সেই থেকে লাইব্রেরী শুধু সভ্যদের চাঁদার ওপর নির্ভর করেই চলছে। সেখানেও স্থানাভাব হওয়ায় লাইব্রেরী ১১, বিডন ষ্ট্রীটের বর্তমান ভাড়াটে বাড়ীতে ওঠে আসে।

হিরণ লাইব্রেরীর আজীবন সভ্য বা বিশেষ সদস্য বলে কিছু নেই, এ ব্যাপারে লাইব্রেরী সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। এর সদস্যদের একই শ্রেণী আর সেটা সাধারণ শ্রেণী। সভ্যদের ছয় টাকা জমা আর মাসিক আট আনা করে চাঁদা দিতে হয়। একখানার বেশী বই নিতে হলে চাঁদার হার বেড়ে চলে, জমাও বাড়ে প্রত্যেক বই-এ চার টাকা করে। এছাড়া দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বই নিতে হলে সদস্যদের পৃথক জমা দিয়ে বই নিতে হয়। বাঁধানো

সাময়িক পত্রিকার জন্য ১০৲ জমা দিতে হয় আর চাঁদা দিতে হয় মাসিক এক টাকা করে।

হিরণ লাইব্রেরীর পাঠাগারে তিনখানা দৈনিক ও সবকটা বাংলা সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। সামনের বারান্দায় ছোট পাঠাগার সদস্যদের জন্য সকালবেলা খোলা থাকে। হিরণ লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক সংখ্যা বাংলা ১৩,৭৬০ ও ইংরেজী ৩২০০ খানা অর্থাৎ প্রায় আঠার হাজারের মতো। দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রিকার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের 'চরিতাবলী,' অরবিন্দের 'কারা-কাহিনী', উল্লাসকর দত্তের 'আমার কারাজীবন', এস ইউ আম্মদের 'গাজীমিয়ার বস্তানী', অবনীমোহনের 'উত্তরপাড়া বিবরণ', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'সরল কবিতা', ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', মতিলাল রায়ের 'শত বর্ষের বাসনা', মার্শম্যানের 'বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত', 'আর্যদর্শন' (১২৮২), 'জন্ম-ভূমি' (১২৯৭-১৩২১), 'দাসী' (১৮৯৫-১৯০৩), 'ধর্মবন্ধু' (১২৯২-৯৩-৯৫), 'নবজীবন' (১২৯১-৯২), 'প্রচার' (১২৯২-৯৩-৯৫), 'প্রদীপ', 'বঙ্গদর্শন' (বঙ্কিম-সঞ্জীব ও রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত) 'সবুজপত্র' প্রভৃতি এই লাইব্রেরীতে রয়েছে।

[৩-৮-৫২]

বয়েজ ওউন লাইব্রেরী

কৃষ্ণপ্রসন্ন ঘোষ, প্রদ্যোৎকুমার রুদ্র আর জীবনকৃষ্ণ দে 'বয়েজ ওউন স্কুল এণ্ড কিণ্ডারগার্টেন'-এর ছাত্র। তিনজনে খুব ভাব। কৃষ্ণপ্রসন্ন ঘোষের মাথায় এলো লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করবার চিন্তা। তিন বন্ধুতে পরামর্শ ক'রে ঠিক হয়ে গেল সব। নিজেদের নীচের ক্লাসের বইগুলো জড করে সব সমেত কুড়িখানা বই হ'ল। পাঠ্য বই ছাড়া ছেলেদের রামায়ণ ও ছেলেদের মহাভারত মাত্র এই দু'খানা বই লাইব্রেরীতে স্থান পেলে। নিজেদের স্কুলের নামে ওঁরা লাইব্রেরীর নাম রাখলেন "বয়েজ ওউন লাইব্রেরী।" এইরূপে ১৯০৯ সালের ১লা মে ১২নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেনে ডাঃ গিরীশচন্দ্র দত্তের বাড়ীর ছোট এক কোঠায় 'বয়েজ ওউন লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হল।

সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি-এ (বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস) কৃষ্ণপ্রসন্ন ঘোষের মেসোমশায়। তিনি প্রায়ই ওঁদেরকে লাইব্রেরী নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতেন। দু'বছরেও যখন ওঁদের খেয়াল ছুটলোনা দেখলেন, তখন ১৯১১ সালে তিনি নিজে থেকেই এসে হ'লেন লাইব্রেরীর সভাপতি। তাঁকে যোগ দিতে দেখে পাড়ার লোকেরাও এবার লাইব্রেরীতে যোগ দিলে। দেখতে দেখতে লাইব্রেরীর চেহারা বদলে গেল। লিলি বিস্কুট কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী প্রতাপচন্দ্র শেঠ ও তাঁর ভ্রাতা বিনয়কৃষ্ণ শেঠ নিজেদের প্রেসে লাইব্রেরীর কাগজপত্র বিনামূল্যে ছেপে দিতেন, একেবারে গোড়ার দিক থেকে আজ পর্যন্ত লাইব্রেরীকে তাঁরা নানাভাবে সাহায্য করে চলেছেন। সুরেন্দ্র বাবুর সভাপতি থাকার সময়ে সতীশচন্দ্র ঘোষ ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য অক্লান্তভাবে খাটতে থাকেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু সে সময় দুই বৎসর বয়েজ ওউন লাইব্রেরীর সম্পাদক ছিলেন। তিনি লাইব্রেরীকে বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন আর লাইব্রেরীতে নিয়ে এসেছেন স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু কে-টি, মিঃ পি সি দত্ত, আই-সি-এস, মিঃ জে এন রায়, ও-বি-ই প্রভৃতির মতো ব্যক্তিদের আজীবন সদস্য করে। চাকুরীর স্থান পরিবর্তনে সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ যখন কলকাতা ছেড়ে চলে যান তখন সতীশচন্দ্র রায়কে (উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে) তিনি লাইব্রেরীর সভাপতি

করে রেখে গেলেন। সতীশচন্দ্র রায় ১৯২০ সাল পর্যন্ত ছয় বৎসর (আমৃত্যু) বয়েজ ওউন লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন।

এই সতীশচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় লাইব্রেরীর দ্রুত উন্নতি হ'তে থাকে। তিনি লাইব্রেরীতে 'বিতর্ক সভার' পত্তন করেন। এ ছাড়া এ সময় লাইব্রেরী থেকে 'বাল্যপ্রতিভা' নামক হাতে লেখা ছোটদের একখানি মাসিক পত্রিকা বের হয়েছিল। তাতে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ছেলেদের আঁকা ছবি প্রভৃতি থাকতো। ১৯১৭ সালে কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্য লাইব্রেরীর নাম রাখা হ'ল 'বয়েজ ওউন লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ংমেনস ইনষ্টিটিউট'। তারপর আর্টিকলস্ অব মেমোরেণ্ডাম তৈরী করে ১৯১৭ সালের ২৮শে আগষ্ট লাইব্রেরী 'বয়েজ ওউন লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ংমেন্স্ ইনষ্টিটিউট' এই সম্পূর্ণ নামে আইনতঃ রেজিষ্টারী করা হল আর রেজিষ্টারী করার সমস্ত খরচ বহন করলেন কুমুদবিহারী বসু। স্থানাভাবের জন্য ১৯১৭ সালে লাইব্রেরী ৭।৩, বিডন ষ্ট্রীটে সুবলচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। সুবলবাবুর বালক পুত্র পুলিন চাঁদ লাইব্রেরীর সভ্য ছিল। তিনি বিনা ভাড়ায় লাইব্রেরীকে ঘর দিয়েছিলেন। সেখান থেকে ১৯১৯ সালে লাইব্রেরী ৭৩, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটের দু'খানা ভাড়াটে ঘরে ওঠে যায়। প্রকৃতপক্ষে সেখানেই প্রথম পাঠাগারের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯২২ সালে লাইব্রেরী পুনর্বার ১২নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেনের বাড়ীতে একখানা বড় ঘরে ওঠে আসে। সেখান থেকে ১৯৩৭ সালে লাইব্রেরী ওঠে এসেছে বর্তমানের ৭৬।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে।

১৯২০ সালে সতীশবাবুর মৃত্যুর পর সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ আবার লাইব্রেরীর সভাপতি হন। তারপর ১৯২১ সালে সভাপতি হন রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ১৯২৯ সালে জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র লাইব্রেরীর সভাপতি হন। তাঁর কার্যকালে লাইব্রেরীর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তিনি ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু দীর্ঘ বিশ বছর লাইব্রেরীর সেবা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি মেজর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ১৯৪৯ সালে লাইব্রেরীর সভাপতি হয়েছেন।

১৯২৪ সাল থেকে লাইব্রেরীর উন্নতিতে ভাঙন ধরে, চাঁদা বাকী পড়ে, ৪০০৲ টাকার ওয়ার বণ্ড ১২০৲ টাকায় নেমে আসে। ক্রমে লাইব্রেরীর অবস্থা এমন হয়ে পড়ে যে. লাইব্রেরীকে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে দেবার প্রস্তাব

আনা হয়। সে সময় লাইব্রেরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জীবনকৃষ্ণ দে এক মাসের সময় চেয়ে নেন এবং কোষাধ্যক্ষ করে দেবীপ্রসন্ন মিত্রকে লাইব্রেরীর কর্মপরিষদে নিয়ে আসেন। দেবীপ্রসন্নবাবুর চেষ্টায় লাইব্রেরী আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি লাইব্রেরীব উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

বয়েজ ওউন লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ংমেনস্ ইনষ্টিটিউটের ৭৬।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বর্তমান বাড়ী ৺কালীশঙ্কর মিত্র অতি অল্প ভাড়ায় লাইব্রেরীকে দেওয়ায় তাঁর পিতা ৺নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মৃতিকল্পে পাঠাগারের নামকরণ করা হয়েছে "নরেন্দ্র পাঠাগার" (১৯৩৭)। লাইব্রেরীর "শিশু বিভাগের" প্রতিষ্ঠাতা পশুপতিনাথ দেব। বর্তমানে এই বিভাগে পুস্তকসংখ্যা দেড় হাজার ও সভ্য সংখ্যা আশী। এ বিভাগের মাসিক চাঁদা আট আনা ও জমা এক টাকা।

বর্তমানে লাইব্রেরীতে পুস্তক, উপ-সমিতি, প্রীতি উৎসব উপ-সমিতি, ভবন উপ-সমিতি ও লাইব্রেরীর ইতিহাস উপ-সমিতি নামে চারটি উপ-সমিতি রয়েছে। গবেষণা কার্যের জন্য লাইব্রেরীর এক বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে। গবেষণা-কার্যের জন্য সর্বসাধারণকে সেখানে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। স্থানাভাবের জন্য বর্তমানে লাইব্রেরীর শরীরচর্চা বিভাগের কাজ বন্ধ আছে। লাইব্রেরী কলকাতা কর্পোরেশন থেকে ২৩১৲ টাকা ও আই-এফ-এ (ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন) থেকে ১০০৲ টাকা করে বাৎসরিক অর্থসাহায্য পেযে আসছে। তা' ছাড়া সরকারী সামাজিক শিক্ষা বিভাগ এ বছর লাইব্রেরীকে ৮০০৲ টাকার পুস্তক দিয়েছেন।

লাইব্রেরীর আজীবন সভ্যের চাঁদা ১০০৲ টাকা। সাধারণ সভ্যদের চাঁদা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী হিসেবে যথাক্রমে মাসিক বার আনা ও ছয় আনা আর জমা ৬৲ টাকা ও ৩৲ টাকা আর শ্রেণী হিসেবে বই নেবার যোগ্যতা দু'খানা ও একখানা করে। বর্তমানে এই লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ১৮,২৭০ খানা, এর ভেতর বহু পুরাতন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আছে। পাঠাগারে ছয়খানা সংবাদপত্র ও সাতাশ-খানা সাময়িকপত্র রাখা হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর বর্তমান সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্র-মোহন রক্ষিত আর লাইব্রেরীয়ান হলেন শ্রীঅসিতকুমার সেন।

[১০-৮-৫২]

রজনীকান্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী

আজীবন বাংলা ভাষার সেবা করে গেছেন রজনীকান্ত। রজনীকান্ত গুপ্ত ছিলেন ঐতিহাসিক। বাংলা ভাষায় বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করে ভাষাকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর লেখা 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' শুধু বাংলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে সেদিন আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ভারতে বৃটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সশস্ত্র অভ্যুত্থান এই সিপাহী-বিদ্রোহ। ইংরেজ জাতিকে ভারতের মাটি হ'তে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা এ। এটা বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবের চেষ্টা। ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়ছে যে বিদেশী সরকার, তার থেকে নিজের দেশকে বাঁচাবার ন্যায্য দাবীর ওপর এর প্রতিষ্ঠা। সার্থক হয়নি বলেই এটা বিদ্রোহ, নইলে এরি নাম হ'ত 'স্বাধীনতার সংগ্রাম'। সেদিন থেকে আরম্ভ করে নানাভাবে এ-সংগ্রাম আমরা প্রায় একশো বছর চালিয়ে গেছি, আর আজকের স্বাধীন ভারতে আমাদের কাছে এ-বিদ্রোহের স্বরূপটাও সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেছে। সেই প্রথম চেষ্টারই ধারাবাহী আমরা আরেকদিন ইংরেজদের ভারতের মাটি থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি,—সেই 'বিদ্রোহী'দের বীরত্বের উত্তরাধিকারী আমরা। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে' তারি সঠিক খবর দিলেন আমাদের রজনীকান্ত গুপ্ত। অখিল মিস্ত্রী লেনের উল্টো দিকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ওপর রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী। নামটা দেখলেই মনে হয়, এ হ'ল লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকের স্মৃতিপূজা, রজনীকান্তের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখবার সুযোগ্য চেষ্টা এ তাঁর দেশবাসীর।

আসলে স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই এর আরম্ভ হয়েছিল এটা ঠিক নয়, প্রথম আরম্ভের ইতিহাস একটু অন্য ধরণের। লোকচক্ষুর অন্তরালে সূচনার কাজ চলছিল, দুশো বই নিয়ে এর আরম্ভ হয়েছিল এক বৈঠকখানা ঘরে। তারপর যেদিন তা' আত্মপ্রকাশ করলে, সাধারণ্যে সেদিন 'রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী' রূপেই তা' আত্মপ্রকাশ করলে।

১৯১০ সালের কথা। বাঙালীর জাতীয় জীবনে ভাব-বন্যার জোয়ার চলেছে।

স্বদেশীযুগের রাখী-পরা বাংলাদেশের ভাই-বোনেদের চোখে তখন ভাবীযুগের স্বপ্ন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সার্থক হয়ে উঠছে ত্যাগের মহিমায়। একটা কিছু করবার, একটা কিছু গড়ে তোলবার ইচ্ছা তরুণদের রক্তস্রোতে দাপাদাপি করে ফিরছে। একটা উত্তেজনাময় মুহূর্তের ভেতর দিয়ে চলছে জাতির অগ্রগতি। সে এমন দিন যখন কেউ বসে থাকতে পারে না, স্বপ্নের স্পর্শ লেগে তুচ্ছ জিনিষ বড় হয়ে দেখা দেয়, মোহনীয় হয়ে ওঠে ছোট জিনিষ ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ সম্ভাব্যতায়। তেমনি একদিনে এ-লাইব্রেরীর আরম্ভ হয় পঞ্চানন দত্তের বৈঠকখানায় অখিল মিস্ত্রী লেনে। পঞ্চানন দত্ত আর ভূষণলাল ঘোষ তখন কৈশোরের সীমায়, সামনে তাঁদের কৈশোরের রঙে রাঙা ভবিষ্যৎ—তাঁদের কিশোর বন্ধুদের নিয়ে এ-লাইব্রেরীর গোড়া পত্তন করলেন। এ-এমন বয়স যা' কোন বাধাকেই বাধা বলে গ্রাহ্য করে না, যে বয়সের পরাজয় নেই। দেখতে দেখতে দু'শো বই জড়ো করা হ'ল। লাইব্রেরী গড়ার প্রথম পর্ব শেষ হ'ল দু'-এক দিনের ভেতরেই, ১৯১০ সালের একেবারে শেষ ভাগে।

লাইব্রেরী গড়া হবার পর এলো লাইব্রেরীর নামের কথা। এক সন্ধ্যায় সবাই এক বৈঠকে বসলেন। সেখানে জড় হলেন শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোলোকেন্দ্রনাথ দে, ভূষণলাল ঘোষ, আর পঞ্চানন দত্ত প্রভৃতি পাড়ার সব কিশোর কর্মীরা। সে স্মরণীয় বৈঠকের অধিবেশন বসে রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে, রজনীকান্তের কিশোর বয়স্ক পুত্র মোহিনীকান্ত গুপ্তও ছিলেন সভ্যদেরই একজন। অনেক তর্ক-বিতর্ক আর পরামর্শ হ'ল, যেমন হয়ে থাকে আজকালকার সভা-সমিতিতে। স্থির হ'ল রজনীকান্তের স্মৃতিরক্ষার্থে লাইব্রেরীর নাম হবে রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী আর লাইব্রেরীর সভাপতি হবার জন্য ধরতে হবে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিশিরকুমারকে পাড়ার যুবকেরা গিয়ে ধরলেন, সভাপতি হতে তাঁর মত করাতে হবে। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যুবকদের আগ্রহ দেখে আর অমত করতে পারলেন না, লাইব্রেরীর সভাপতির পদ তিনি গ্রহণ করলেন।

এর আর একটু কারণ আছে, চৈতন্য লাইব্রেরীর তখন খুব নাম-ডাক।

গোলোকেন্দ্রনাথ দে চৈতন্য লাইব্রেরীর একজন সদস্য ছিলেন। গৌরহরি সেন তখন চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক, শুধু সম্পাদক নন, তাঁরি সাধনায় গড়ে উঠেছে চৈতন্য লাইব্রেরী। গৌরহরি সেনের সঙ্গে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল হৃদ্যতা। ফলে রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে গৌরহরি সেন এসে উৎসাহ আর উপদেশ দিয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণে বার বার। লাইব্রেরীর পক্ষে এটা কম লাভের কথা নয়, গোড়ার দিকে এটুকুরও প্রয়োজন ছিল।

রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম সম্পাদক হলেন গজেন্দ্রনাথ দে বি-এল, কোষাধ্যক্ষ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিসাব-রক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ চন্দ্র, সম্পাদক সাহিত্য শাখার অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর প্রথম লাইব্রেরীয়ান হ'লেন গোলোকেন্দ্রনাথ দে ও ভূষণচন্দ্র ঘোষ। গোলোকেন্দ্রনাথ দে ৬২নং (বর্তমানে ১০৭ সি) অখিল মিস্ত্রী লেনে নিজ বাড়ীর একখানি সম্পূর্ণ পৃথক ঘর বিনা ভাড়ায় লাইব্রেরীর জন্যে ছেড়ে দেন। ১৯১১ সালের গোড়ার দিকে লাইব্রেরী সেখানে ওঠে যায় আর দু'বেলা লাইব্রেরীর নিয়মিত কাজ চলতে থাকে। লাইব্রেরীর গোড়ার দিকের ইতিহাসে গোলোকেন্দ্রনাথের সেবার সত্যি তুলনা হয় না। লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য তিনি দিন রাত পরিশ্রম করে চলেছেন পনের বৎসরের ওপর। প্রথম দু'বছর আলো ইত্যাদির ব্যয়ভার বহন করেছেন তিনি নিজে। ইংলিশম্যান কাগজের লাইনো অপারেটার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহায্যে হাত-প্রেস স্থাপন করে তাতে ছেপে নিয়েছেন বই লেন-দেনের স্লিপ আর সেটা সদস্যদের দিয়েছেন বিনামূল্যে। এমনি গোলোকেন্দ্রনাথ নানাভাবে নিঃস্বার্থ সেবায় লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। কয়েক মাস পরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় লাইব্রেরী ওঠে আসে ৬০নং (বর্তমানে ১০৫) অখিল মিস্ত্রী লেনের একটি ভাড়াটে ঘরে, ভাড়া ছিল চার টাকা। শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় এসময় লাইব্রেরীতে যোগ দেন ও কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণে সম্মত হন। তাঁর চেষ্টায় আর সতীশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের ব্যয়ে লাইব্রেরীর কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়। তাতে জনসাধারণের সহানুভূতি চাওয়া হয়েছিল। এ সময় অন্নদাচরণ নন্দী একটি বড় আলমারী, অশ্বিনী পাল একটি বেঞ্চ আর সুরেন্দ্রনাথ পাল লাইব্রেরীকে একটি বড় টেবিল দান করেন। বৎসরখানেক পরে ২৮।১৬, অখিল মিস্ত্রী লেনে 'রজনী কুটীরে' রজনীকান্তের বাড়ীতে ছয় টাকা

ভাড়ার একখানি ঘরে লাইব্রেরী ওঠে যায় আর নয় টাকা ভাড়ায় পাশের আরেকখানা ঘর পাঠাগারের জন্ম ভাড়া নেওয়া হয়। এ-সময় লাইব্রেরীতে মহারাজা মণীন্দ্রকুমার নন্দীর ত্রিশ টাকা ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক-কালীন দশ টাকা দান বিশেষভাবে উল্লেখযেগ্যে। তা'ছাড়া কাশীপতি চট্টো-পাধ্যায় মাসিক এক টাকা আর পশুপতি চট্টোপাধ্যায় মাসিক দু'টাকা করে লাইব্রেরীকে বরাবর সাহায্য করে এসেছেন।

হিতৈষীদের ভেতর অনেকেই লাইব্রেরীকে মাসিক এক টাকা করে সাহায্য করতেন। তাঁদের 'এ' শ্রেণীর সভ্য বলে গণ্য করা হ'ত। আজো লাই-ব্রেরীতে সে নিয়ম চলে আসছে, 'এ' ও 'বি' শ্রেণীর অনুরূপ সভ্য আজো আছেন। এতে করে যা আয় হ'ত, সে টাকায় কেনা হ'ত লাইব্রেরীর নূতন বই। কে জেড হ্লা (K. Z. HLA) নামক একজন ব্রহ্মদেশীয় ব্যবসায়ী বহুদিন লাইব্রেরীকে দু'টাকা করে মাসিক অর্থ সাহায্য করেছেন, আর শৈলপতি বাবুর চেষ্টায় লাইব্রেরীকে ৭৫৲ টাকা করে বার্ষিক অর্থ সাহায্য করতে আরম্ভ করেন কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান। ক্রমে বর্ধিত হয়ে সেটা ৬০০৲ টাকায় পৌঁছে। বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরীর বরাদ্দ পাঁচশত টাকা করে কর্পোরেশন-সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। ১৯১৪ সালের শেষ ভাগে ১২৮।২, আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে দু'খানা ভাড়াটে ঘরে লাইব্রেরী ওঠে আসে। বিজলী আলোর জন্য পশুপতি চট্টো-পাধ্যায় এখানে থাকাকালীন লাইব্রেরীকে পাঁচশত টাকা দান করেন। সেখান থেকে লাইব্রেরী ১৯৩৫ সালে ওঠে আসে বর্তমান ভাড়াটে বাড়ীতে ১৩৩বি, আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে। ১৯২৬-২৭ সালে লাইব্রেরীর সম্পাদক ছিলেন মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সে সময় থেকে একদল যুবক লাইব্রেরীর উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নবান হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিবেকানন্দ পাল, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র বাগচী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি যুবকবৃন্দ। তাঁদের সে চেষ্টা এ-লাইব্রেরীর ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-লাইব্রেরীতে সভাপতিত্ব করে গেছেন সুসাহিত্যিক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়, সনৎকুমার রায়-চৌধুরী, সতীনাথ রায় প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষেরা। বর্তমানে লাইব্রেরীর সভাপতি হচ্ছেন শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়

আর শ্রীশশাঙ্ককুমার সেন বর্তমানে লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান। এ ছাড়া বর্তমানে আরো চারজন লাইব্রেরীয়ান আছেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর সঙ্গে অনেক ছোট ছোট লাইব্রেরী মিলিত হয়েছে। তার মধ্যে সুরতী বাগানের সুহৃৎ লাইব্রেরী আর পটলডাঙ্গার নিউ সরস্বতী লাইব্রেরীর নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অনেকে গ্রন্থ সমেত গ্রন্থাগার দান করেছেন প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার্থে। লাইব্রেরীর সাহিত্য শাখার আলোচনা সভা বসতো মাসে দু'বার করে, প্রবন্ধ পাঠ হ'ত, তাতে যোগ দিতেন সহরের মনীষিবৃন্দ। এর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান হতো ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বা মহাবোধি হলে। এমন সব সভায় যোগ দিয়েছেন মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পদক ও নগদ টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বহুবার। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, বর্ধমান, যশোহর, বাঁকিপুর প্রভৃতি স্থানে 'সাহিত্য সম্মেলনে'র অনুষ্ঠানে লাইব্রেরীর প্রতিনিধিরা প্রেরিত হতেন। বর্তমানে লাইব্রেরীর সাহিত্য শাখার কাজ বন্ধ আছে। প্রতি বৎসর ৩০শে জ্যৈষ্ঠ রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যুতিথি লাইব্রেরীতে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

লাইব্রেরীর 'শিশু-বিভাগ' স্থাপিত হয় ১৯৩৫ সালে অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায়। বর্তমানে এ বিভাগের সভ্য-সংখ্যা ৭৭ ও পুস্তক-সংখ্যা ১১৭৯। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী হিসাবে এ বিভাগের চাঁদা ছয় আনা ও তিন আনা আর জমা দু'টাকা ও এক টাকা। সাধারণ বিভাগে 'এ' ও 'বি' শ্রেণী ছাড়া দ্বিতীয় ও সাধারণ শ্রেণীর চাঁদা যথাক্রমে বার আনা ও ছয় আনা আর জমা আট টাকা ও চার টাকা।

পাঠাগারে সাধারণের পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের সুবিধা আছে, তবে জায়গা বড় কম। এখানে পনের খানা পত্র-পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। বর্তমানে লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা ১৪,১৫৪। সুন্দর বাঁধাই ৮৩৪ খানা পুরাতন পত্রিকা লাইব্রেরীতে অতি যত্নের সহিত রাখা হয়েছে। পুরাতন পত্রিকাগুলোর মধ্যে তত্ত্ববোধিনী, নব্য ভারত (১২৯৭), অর্চনা, অর্ঘ্য, ভারতী, জগজ্জ্যোতি, মালঞ্চ, আর্যাবর্ত, বঙ্গদর্শন (১২৭৯), নারায়ণ, বিকাশ, সাহিত্য, বামাবোধিনী

পত্রিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও রিপোর্ট রয়েছে অনেকগুলো। তার ভেতর বেঙ্গল ডিস্ট্রীক্ট গেজেটিয়ার্স, বেঙ্গল আণ্ডার লেপ্টে-নান্ট গভর্ণর্স, ন্যায়রত্নের রামরত্নের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, এন-সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, জীবনীকোষ, বিশ্বকোষ ডাঃ উইলিয়ামের ২৫ ভল্যুম হিষ্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড, মনুসংহিতা (মূল সংস্কৃত), প্লস এণ্ড বার্টেলস-এর ৩ ভল্যুম উওম্যান (Woman), এ ইউসুফ আলির হোলি কোরাণ, রামায়ণ (মূল সংস্কৃত) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

[৪-৫-৫২]

নর্থ ইণ্টালী কমলা লাইব্রেরী

ট্যাংরা (উত্তর ইণ্টালী) ছিল অনুন্নত এলাকা। আজো এ অঞ্চলকে উন্নত বলা চলে না। আজকের অবস্থা থেকে চল্লিশ বছর আগে এ এলাকার রূপ যে কি ছিল সেটা সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া চলে। বস্তি এলাকা, বেশীর ভাগ লোকই অশিক্ষিত দিনমজুর। নাগরিক জীবনযাপনের কর্তব্য ও দায়িত্ব-বোধ তাদের ছিল না, ছিলনা কোন প্রকার সুস্থ আনন্দ লাভের উপায়। অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ এ অব্যবস্থার প্রতিকারের কথা ভাবতে থাকেন। ফলে সমাজ সেবা ও শিক্ষা বিস্তারের আদর্শ নিয়ে 'নর্থ ইণ্টালী কমলা লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠা হয়। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মনোমোহন চক্রবর্তী, হরেন্দ্রনাথ রায়, অপূর্বকৃষ্ণ দেব ও প্রমথনাথ চন্দ্রের চেষ্টায় ১৯১১ সালের ১লা জুন ১৭নং পামারবাজার রোডের এক ভাড়াটে বাড়ীতে লাইব্রেরী স্থাপিত হ'ল। ওপরের চারজন ও এ জেড খান (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), ভূষণচন্দ্র ঘোষ, অনাথনাথ চন্দ—এ সাত জনকে নিয়ে লাইব্রেরীর প্রথম কর্মপরিষদ গঠিত হয়েছিল।

লাইব্রেরী প্রথম স্থাপিত হয় ১৭ জন সদস্য আর ১০০ বই নিয়ে। একেবারে গোড়া থেকেই লাইব্রেরীর পাঠাগারে সাধারণের পত্র পত্রিকা ও পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। বই ও আসবাব পত্র বিভিন্ন ব্যক্তি লাইব্রেরীকে দান করেছিলেন। লাইব্রেরীর পেছনে প্রভাবশালী লোক থাকাতে দ্রুত লাইব্রেরীর উন্নতি হ'তে থাকে আর প্রায় আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশন ৭৫৲ টাকা করে অর্থ সাহায্য করতে থাকেন। এই অর্থ সাহায্য বেড়ে ৬৫০৲ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। বর্তমানে কলকাতা কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ অর্থ সাহায্য ৫০০৲ টাকা এ লাইব্রেরী পেয়ে আসছে।

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার প্রসার আর সমাজসেবা। ১৯১১ সালের ২৪শে জুলাই লাইব্রেরী-সংলগ্ন দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় ও দেখতে দেখতে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। আর পর বৎসর স্থাপিত হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শীঘ্রই সেটা সরকারী সাহায্য পেতে

আরম্ভ করে। লাইব্রেরীর বই-এর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে জনসাধারণের পাঠস্পৃহাও। লোকশিক্ষার জন্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ ত্রৈমাসিক সভা ডেকে বক্তৃতার আয়োজন করতে থাকেন। এ ছাড়া লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ব্যবস্থা করেন স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক পুরস্কার দেবার। দেখতে দেখতে নর্থ ইণ্টালী কমলা লাইব্রেরী এ অঞ্চলের জনগণের ভেতর একটা রীতিমতো সারা জাগিয়ে তোলে। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ঘূর্ণিবাত্যায় পূর্ববঙ্গ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে সময় লাইব্রেরীতে একটি রিলিফ তহবিল খোলা হয়েছিল। আর ১৯২২-২৩-এর বন্যায় যখন উত্তর বাঙলায় হাহাকার পড়েছিল সে সময় লাইব্রেরীর তরফ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট। এর থেকেই বোঝা যায় লাইব্রেরীর কাজ চলছিল তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই। ১৯১৮ সালের ২৯শে অক্টোবর লাইব্রেরী ঘরে অস্থায়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা চিকিৎসাকেন্দ্র খুলে অসংখ্য রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ডাঃ এইচ এম ক্রেইক (হেলথ অফিসার), ডাঃ জে, চক্রবর্তী, মাননীয় সি এফ্ পাইন ও 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার কর্মচারিবৃন্দ এই চিকিৎসাকেন্দ্র পরিদর্শন করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

১৯২২ সালে লাইব্রেরী ১৭নং বাড়ী থেকে ২।১ নং পামারবাজার রোডের বাড়ীতে ওঠে আসে ও লাইব্রেরীর অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। মিঃ এ জেড খান (প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট) সে সময় লাইব্রেরীর সভাপতি। ১৯২১-২২-এর বাৎসরিক সাধারণ সভায় তিনি গৃহ নির্মাণ তহবিলে দানের জন্য আবেদন জানান, আর তাতে জনসাধারণের কাছ থেকেও অকুণ্ঠ সাড়া পাওয়া যায়। আপাততঃ চাঁদা আদায় মুলতুবী রেখে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরী গৃহের জন্য উপযুক্ত জায়গার সন্ধান করতে থাকেন। শ্রী এস এন মল্লিক, সি-আই-ই তখন কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরীর জায়গার জন্য গিয়ে তাঁকে ধরলেন। লাইব্রেরীর কার্যকলাপ দেখে তবে তিনি কথা দিলেন জায়গা দেওয়া হবে। তারপর লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য ৬নং পামারবাজার রোডের ৪ কাঠা ২৫ বর্গফুট জায়গা দেওয়া হল (সেপ্টেম্বর ১৯২৪)। সেই কর্পোরেশন প্রদত্ত জায়গার ওপর লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্মিত হ'ল জনসাধারণের অকুণ্ঠ বদান্যতায়। ১৯২৬ সালে

লাইব্রেরী তার নিজস্ব বাড়ীতে চলে আসে।

এরপর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরীর কার্য-কলাপ চলতে থাকে মামুলী গতানুগতিক ভাবে। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন ডাঃ এইচ সি মুখার্জী (বর্তমান রাজ্যপাল), আর ১৯৪২—৪৫ পর্যন্ত ডাঃ এস চৌধুরী ছিলেন লাইব্রেরীর সভাপতি। এঁদের আমলে লাইব্রেরীর কর্মপন্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এ সময় থেকে সভ্যদের নিকট পুস্তকা-ধারগুলি উন্মুক্ত করে দেওয়া হল ও নিয়ম করা হল, যে-কোন সভ্য তার মনোমতো বই নিজে বেছে নিতে পারেন। এর আগে সভ্যেরা বই-এর ধার-ঘেঁষতেও পারতেন না, আর আর দশটা লাইব্রেরীর মতোই এখানেও সভ্যদের আর বই-এর মাঝখানে লাইব্রেরীয়ান প্রভৃতি থাকতেন অতিজাগ্রত চোখ নিয়ে। এই নিয়মের ফলে সভ্যদের দায়িত্বজ্ঞান বাড়লো, দেখা গেল এতে আতঙ্কগ্রস্ত হবার সত্যিকারের কোন কারণ নেই। বিস্তীর্ণ এলাকায় বই লেনদেনের জন্যে কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হল (ডেলিভারী সেণ্টার), আর ১৯৪২ সালে খোলা হল লাইব্রেরীর 'শিশু-বিভাগ'। কার্যকলাপ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন ঘর তৈরী করে নিতে হল। এই শিশু বিভাগের বর্তমান সভ্যসংখ্যা ৮২ জন, পুস্তক সংখ্যা ৫০০ খানা আর চাঁদা মাসিক দু' আনা করে। কিন্তু বিভাগে 'মৌচাক' ও 'শিশুসাথী' এই দু'খানা শিশু মাসিক রাখা হয়ে থাকে।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় লাইব্রেরী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সমগ্র অঞ্চলকেই দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল বলা চলে। দাঙ্গার সময় বহু পরিবারকে লাইব্রেরী গৃহে আশ্রয় দিতে হয়েছিল। তাতে করে সমাজসেবা করা হলেও বইপত্রের ক্ষতি হয়েছে যথেষ্ট। অবশ্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় বর্তমানে লাইব্রেরী সে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছে বলা চলে। ১৯৪৮ সালে লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানে পল্লী সংগঠন সমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়েছে। লাইব্রেরী ঘরেই তা অবস্থিত হলেও সমিতির পরিচালকবর্গ লাইব্রেরীর পরিচালকবর্গ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

দশ বছরের চাঁদা একসঙ্গে দিলে বা সেই পরিমাণ টাকার বই লাইব্রেরীতে দান করলে লাইব্রেরীর আজীবন সদস্য হওয়া যায়। লাইব্রেরীর বর্তমান সভ্য সংখ্যা ৩৫০ জন। সাধারণ সভ্যের 'ক' 'খ' ও 'গ' এই তিন শ্রেণী।

'ক' শ্রেণীর জমা ২৲, মাসিক চাঁদা ।৶০ ও বই নেবার যোগ্যতা একসঙ্গে একখানা করে। 'খ' শ্রেণীর জমা ৪৲, চাঁদা দশ আনা, আর বই নেবার যোগ্যতা একসঙ্গে দুখানা। 'গ' শ্রেণীর সভ্যেরা ছয়খানা পর্যন্ত বই একসঙ্গে নিতে পারেন; তাঁদের জমা ১২৲ টাকা, আর মাসিক চাঁদা এক টাকা দু' আনা।

নর্থ ইণ্টালী কমলা লাইব্রেরীর ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকের সর্বমোট সংখ্যা বর্তমানে ১০,৯৬০ খানা। তার মধ্যে ২২৩০ খানা ইংরেজী, আর বাকি ৮৭৩০ খানা বাংলা ও সংস্কৃত। ধর্ম সম্বন্ধীয় বই-এর বিশেষ সংগ্রহ রয়েছে এ লাইব্রেরীতে। এই লাইব্রেরীর পাঠাগারের ব্যবস্থা খুবই ভালো, সমস্ত পত্র-পত্রিকা এখানে রাখা হয় আর দৈনিক গড়ে ৫০ জন পাঠক এই পাঠাগারে পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ করে থাকেন। শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি, শ্রীকিরণ গুপ্ত বর্তমান সম্পাদক, আর লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান হলেন শ্রীগণপতি সেনগুপ্ত। সহঃ লাইব্রেরীয়ান শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্তমানে দায়িত্বের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

[২৬-১-৫২]

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী

সাহিত্যিকদের নিকট খিদিরপুর 'কবি-তীর্থ' বলে পরিচিত। তার কারণ আছে। এখানে সমাবেশ হয়েছিল বহু কবির। এই খিদিরপুর থেকে নানা কবির কবিতা একটা যুগকে অজস্র রসধারায় অভিষিক্ত করেছিল। এখান থেকে কবিতা প্রবাহ ঢেউএর পর ঢেউএ ছুটে গিয়ে সমস্ত বাংলা দেশকে ভাসিয়েছে। হেমচন্দ্র, মধুসূদন আর রঙ্গলালের অমর কবিতাবলী বৃষ্টিধারার মতো বর্ষিত হয়েছে নিত্য নূতন রস-সম্ভারে,—নূতন জীবন এনেছে সাহিত্যে সমাজে আর চিন্তাধারায়। ভাব-সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন অক্ষয়কুমার দত্ত এখানে বহু দিন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ আর ভূ-কৈলাসের সাধক কবি জয়নারায়ণ ঘোষালের কবিতা আর গান পরমা ভক্তির অমৃত নিষ্যন্দী প্রবাহিনী। খিদিরপুর 'কবি-তীর্থ'। 'মধুমিলন' উৎসবের ভেতর দিয়ে খিদিরপুরের অধিবাসী এই কবিবৃন্দের পুণ্য অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে থাকে প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমী তিথিতে। মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর কর্মকর্তাদের উদ্যোগে লাইব্রেরী গৃহে মধুমিলন উৎসব হয়ে আসছে আজ তেত্রিশ বৎসর।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব প্রসঙ্গে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে সম্বোধন করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাণী বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। "মধুসূদন বিশেষ কালের বা স্থানের নন—তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সর্বকালের গৌরব, এই সত্য বাঙ্গালী যেন না ভোলেন"—মধুসূদনকে বাঙ্গালী ভোলেনি, মধুসূদনকে যেদিন বাঙ্গালী ভুলবে, বাঙ্গালী বলে সেদিন আর কিছু থাকবে না।

খিদিরপুরবাসী মাইকেলের যোগ্য স্মৃতি রক্ষার কথা অনেক দিন ধরে ভেবে আসছে। মনসাতলা পল্লীস্থ যুবকদের ভেতর গ্রন্থাগার স্থাপনের আন্দোলন চলছে কিছুকাল ধরে। আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়ালেন ফকিরচন্দ্র ঘোষ, চণ্ডীচরণ পাঠক, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ-কুমার দত্ত, শচীন্দ্রকৃষ্ণ দে, রাজকৃষ্ণ গোস্বামী, পান্নালাল দে, রামকালীনাথ

ঘোষে, মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ স্থানীয় যুবক আর ভদ্রমণ্ডলী। তাঁদের উদ্যোগে ১৯১৫ খৃঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী কবিবর মধুসূদনের নামে লাইব্রেরী স্থাপিত হল ৪৬।২নং মনসাতলা লেনস্থ রাজকৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়ীতে—লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য হল মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষা, সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষার সম্প্রসারণ, লাইব্রেরীর প্রথম সভাপতি হলেন পণ্ডিত চণ্ডীচরণ পাঠক, সম্পাদক রাজকৃষ্ণ গোস্বামী আর অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হলেন প্রথম লাইব্রেরীয়ান। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরী ৪৬।২নং মনসাতলা লেনের বাড়ীতে ছিল।

ক্রমে লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঠিকানা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। নিজস্ব বাড়ী তৈরী হবার আগ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক লাইব্রেরীকেই কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। ৪৬।২নং মনসাতলা লেন থেকে মাইকেল লাইব্রেরী উঠে যায় ১১।১ ডেণ্ট মিশন রোডের বাড়ীতে, এ বাড়ীতে লাইব্রেরী ছিল ১৯১৭-২৫ সাল পর্যন্ত। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরী ছিল ৭নং মনসাতলা লেনে। সেখান থেকে ওঠে এসে পি ২৯।১৬বি, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোডের বাড়ীতে লাইব্রেরী ছিল ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল অবধি। সেখান থেকে লাইব্রেরী উঠে যায় ১নং মণিলাল ব্যানার্জী রোডের বাড়ীতে। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত লাইব্রেরী ওখানেই ছিল। তারপর ১৯৪৮ সালের ২০শে জুন লাইব্রেরী ১৭।১।২নং মনসাতলা লেনের নিজস্ব নূতন বাড়ীতে চলে আসে।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর অভাব অনুভূত হতে থাকে একেবারে গোড়ার দিক থেকেই। তারপর নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে লাইব্রেরী চলতে থাকে বহুদিন। অবশেষে স্থায়ী বন্দোবস্তে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ী নির্মাণের জন্য পাঁচ কাঠা জমি পাওয়া যায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আশীর্বাণী নিয়ে লাইব্রেরীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হয় ১৯৪০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। তারপর রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য রায়ের বাণী সম্মিলিত এক আবেদনপত্রে গৃহ-নির্মাণ তহবিলে দেশবাসীর নিকট অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়। সে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু

দেবী, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, সন্তোষকুমার বসু (সভাপতি), বটুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (গৃহ-নির্মাণ সভাপতি) ও শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক)। ১৯৪৫ সালের ১৬ই অক্টোবর কর্পোরেশন প্রদত্ত জমির পর লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা, লালব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ও বিমলাপতি মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, ইন্দুভূষণ বসু, সন্তোষকুমার বসু, হরিহর মুখোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীচরণ সেন, কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মুক্তহস্ত বদান্যতায় লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ২০শে জুন লাইব্রেরী নিজস্ব বাড়ীতে চলে আসে। আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহ-প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হয় ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই; লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত আর সে উৎসব-সভার সভাপতি ছিলেন বিচারপতি সুধীররঞ্জন দাশ। গৃহ-প্রবেশ উৎসব সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল সেদিন।

প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমী দিনে মধু-মিলন উৎসব মাইকেল লাইব্রেরীতে সমারোহে সম্পন্ন হয়ে থাকে, আসলে এটা হেমচন্দ্র, মধুসূদন, রঙ্গলাল প্রভৃতি কবির স্মৃতিপূজা। এ উৎসবে পৌরোহিত্য করেছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথনাথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অনুরূপা দেবী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস নাগ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ। এই উৎসবে প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা, চিত্রাঙ্কণ, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যাপক আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং প্রতি-যোগীদের স্মৃতি-পদক ও স্মৃতি-বৃত্তি প্রদত্ত হয়। এ বছরে যে সমস্ত রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করবে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে সেগুলোকে লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে (মধুমিলন উৎসব সমিতির তরফে) পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হবে। এ ব্যবস্থা এ বছরই প্রথম করা হল। বর্তমান বৎসরে মধুমিলন উৎসব সমিতির সম্পাদক শ্রীঅতীন্দ্রিয় বসু।

লাইব্রেরীতে মধু-আসর নামে একটা আলোচনা বৈঠক আছে, আর এজন্য রয়েছে যথারীতি একটা উপ-সমিতি। এই উপ-সমিতির উদ্যোগে বছরের মধু-আসরের সাত-আটটি বৈঠক হয়ে থাকে। এই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ মনীষিবৃন্দ এসে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। স্থানীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিয়ে এই মধু-আসরের বৈঠকে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়ে থাকে।

লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে মহাকবি মধুসূদনের সমাধিক্ষেত্র রয়েছে। প্রতি বৎসর ২৯শে জুন প্রাতে মাইকেল লাইব্রেরীর সদস্যগণ সেখানে গিয়ে মধুসূদনের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত করেন আর বিকেল বেলা পাঠাগারের স্মৃতি-বাসরের একটি অধিবেশন হয়ে থাকে।

প্রধানতঃ মাইকেল লাইব্রেরীর কার্যকলাপ চারিটি বিভাগে চলছে, সন্ধান-বিভাগ, লেনদেন-বিভাগ, পঠন-বিভাগ ও বিতর্ক-বিভাগ। সন্ধান বিভাগে রয়েছে বিশ্বকোষ, অভিধান আর সাধারণের জ্ঞাতব্য নির্দেশিকা। লেনদেন-বিভাগে বিবিধ পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা, পঠন-বিভাগে সর্বসাধারণের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা আর বিতর্ক-বিভাগে শিল্প, সাহিত্য ও বিবিধ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য বৈঠকের বন্দোবস্ত রয়েছে।

মাইকেল লাইব্রেরীর স্থায়ীসভ্য যেমন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত তেমনি সাধারণ সভ্যদের তিনটি শ্রেণী রয়েছে। প্রথম শ্রেণী এক সঙ্গে ৩ খানা বই নিতে নিতে পারেন, দ্বিতীয় শ্রেণী এক সঙ্গে নিতে পারেন ২ খানা আর তৃতীয় শ্রেণী ১ খানা করে বই পান। স্থায়ী সভ্যদের চাঁদা যথাক্রমে ১৫০৲ টাকা, ১০০৲ টাকা ও ৫০৲ টাকা। আর সাধারণ সভ্যদের দেয় চাঁদা যথাক্রমে দেড় টাকা, বার আনা ও ছয় আনা এবং সাধারণ সভ্যদের যথাক্রমে ১২৲ টাকা, ৮৲ টাকা ও ৪৲ টাকা জমা দিতে হয়।

১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত মাইকেল লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত চণ্ডীচরণ পাঠক, ১৯১৮-১৯ সভাপতি ছিলেন সেণ্ট জন্ কেলি, ১৯২০-২১ সভাপতি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর ১৯২২-২৫ সাল পর্যন্ত সুরেন্দ্র-নাথ মল্লিক লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন। ১৯২৫ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত লাইব্রেরীর সভাপতি রয়েছেন শ্রীসন্তোষকুমার বসু। বর্তমান লাইব্রেরীর

সম্পাদক শ্রীনলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আর বর্তমান গ্রন্থাগারিক হলেন শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক। সভাপতি ১, সহঃসভাপতি ৪, সম্পাদক ১, সহকারী সম্পাদক ২, গ্রন্থাগারিক ১, সহঃগ্রন্থাগারিক ২, কোষাধ্যক্ষ ১, হিসাব রক্ষক ১, হিসাব-পরীক্ষক ১ ও ১৩ জন সদস্যকে নিয়ে লাইব্রেরীর কর্ম-পরিষদ গঠিত।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক-সংখ্যা ৮৫১৯ খানা আর পাঠাগারে রাখা হয়েছে ১৪ খানি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা। ভূ-কৈলাস রাজবাড়ীর কুমার সত্যধ্যান ঘোষাল বহু টাকা মূল্যের পুস্তক লাইব্রেরীতে দান করেছেন আর ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবীর মূল্যবান পুস্তক-সংগ্রহও এই লাইব্রেরীতে প্রদত্ত হয়েছে। মাইকেল লাইব্রেরীতে রয়েছে সংস্কৃত রামায়ণ, সামবেদ সংহিতা, ঋগ্বেদ ও অন্যান্য সমস্ত বেদের দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত সংকরণ। এ ছাড়া গত বৎসর খিদিরপুরের শ্রীবৈদ্যনাথ দাস ও শ্রীকেদারনাথ দাস লাইব্রেরীতে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' প্রদান করেছেন। মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর সমস্ত কর্মপন্থার ভেতর কবিবর মধুসূদনের স্মৃতি ওতঃপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে, এমন লাইব্রেরী সত্যি সমস্ত দেশের গৌরব করবার মতো।

[১৭-২-৫২]

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ

আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতবর্ষের এদেশে আজো ঝির্ ঝির্ বয়ে চলেছে একটি ভাষার স্তিমিত ফল্গুপ্রবাহ, চলেছে কি-না আমরা জানতে না চাইলেও আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে তা' বয়ে চলেছে, অতীত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা সে। আমৃত্যু আজো আমরা সে ভাষার ডোরে বাঁধা পড়ে আছি। মরতে বসেও সে ভাষা মরলো না, এমনি তার প্রাণশক্তি। প্রাচীন ভারতকেই শুধু নয়, বর্তমানের ভারতকেও জানতে হলে তার আগে এ ভাষাকে জানতে হবে। ভারতবর্ষে কোনদিনই একটিমাত্র ভাষা প্রচলিত ছিল না—প্রাচীন ভারতেও নয়; কিন্তু একটি বিশেষ ভাষা সমগ্র ভারতবর্ষকে একজাতীয়তার বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল, সে আমাদের সংস্কৃত ভাষা। আজো সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ অনুভব করতে হলে একমাত্র সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই তা' আমরা করতে পারি। একথা জানি, প্রাদেশিক ভাষাগুলোকে বাদ দিয়ে সমগ্র দেশের জন্য একটি ভাষার সুপারিশ করলে আজো রায় পড়বে সংস্কৃত ভাষার অনুকূলেই ষোল আনা। আপাতঃদৃষ্টিতে যা মরে গেছে, আসলে আজো তা' মরেনি, শুধু আমরা সেটা দেখতে চাইছি না বা বুঝতে পারছি না। সেটা বয়ে চলছে অব্যাহতগতিতে দেশের অন্তঃস্থলে আর ব্যাপ্ত হয়ে আছে সমগ্র দেশের অবিচ্ছিন্ন আত্মায়। অমরতার দাবী আছে বলেই এ ভাষা মরবে না।

প্রাচীন ভারতের কাছ থেকে দু'হাত পেতে যা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ করেছি—সংস্কৃত ভাষার অমিয়ধারায় অভিষিক্ত সে সম্পদরাশি, আর বিশ্বকে যদি তার কিছু দেবার থাকে তো তাও দেওয়া হয়েছে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই। বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, ছন্দ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, শিল্পশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে কৌটিল্যের নীতিশাস্ত্র পর্যন্ত সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সে একদিন ছিল যখন ভারতের তপোবনে প্রভাত দেখা দিত।

পাখীর কাকলির সঙ্গে সামগানের সঙ্গীতধ্বনিতে, বঙ্গভূমির হোমাগ্নির দীপ্ত শিখার দিকে তাকিয়ে দেখতো দ্বিপ্রহরের সূর্য, আর পাটল সন্ধ্যার মুখে ছুটতো শান্তি মন্ত্রের নির্ঝরিণী সংস্কৃতের অমৃত প্রবাহে। যুগান্তরের আমাদের রক্তে তার সুর আজো ধ্বনিত হচ্ছে—ভেসে ফিরছে।

তারপর এলো পাশ্চাত্য সভ্যতা সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার ধর্ম আর ভাষা নিয়ে, পাটোয়ারী বুদ্ধির কাছে আমাদের হার হল। আমরা আত্মবিক্রয় করলাম। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির আত্মাকে বিসর্জন দিলাম। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মার নাগাল পেলাম না,—যা পেলাম সে তার ছায়া। দিতে পারলেই তবে পাওয়া যায়, দেবার ক্ষমতাও হারাণো। আমাদের অধঃপতন হল। সে অধঃপতন মনীষীদের চোখ এড়ালো না, পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলতে লাগলো দিনের পর দিন। বর্তমানের সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ সে চেষ্টারই এক সার্থক প্রকাশ।

দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রীর টোল ছিল তাঁরই বাড়ীর এক খোলার ঘরে, ৬/২২ কেবলকৃষ্ণ সুরের লেনে। টোলের অধ্যাপক আর ছাত্রেরা মিলে ঠিক করলেন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের অভিনয় করতে হবে,—উদ্দেশ্য সংস্কৃত ভাষার প্রচার আর প্রসার সাধন। আরো পণ্ডিতেরা যোগ দিলেন, অন্য টোলের ছাত্রদেরও অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হল, আর অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হল ভবানীপুরের গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহাশয়কে (টাকির)। ছ' মাস মহড়ার পর নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হল হল মনোমোহন থিয়েটারে। নাটক অভিনীত হল সত্য, কিন্তু তাতে স্থায়ী কোন ফল হল না। স্থায়ী কাজ করবার জন্য ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২১শে শ্রাবণ (১৯১৬) বঙ্গীয় ছাত্র সমিতি প্রতি প্রতিষ্ঠিত হল। এর ঠিক পাঁচ মাস পরে পণ্ডিতমণ্ডলী এক সভায় মিলিত হয়ে এরি নাম বদলে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ রাখলেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন এম-এ মহাশয়, আর প্রথম সম্পাদক গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ। এর প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী, গীষ্পতি রায় চৌধুরী, জানকীনাথ কাব্যতীর্থ, জানকীনাথ শাস্ত্রী (পরে লাইব্রেরীর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত),

পশুপতিনাথ শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্যই পরিষদের প্রতিষ্ঠা। ঠিক হল (১) সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা, (২) চতুষ্পাঠী স্থাপন দ্বারা শাস্ত্রাধ্যাপন, (৩) গ্রন্থাগারে মুদ্রিত সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস আর হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, (৪) অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ, (৫) পত্রিকার মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার প্রচার, (৬) সংস্কৃত রূপকাভিনয়, (৭) অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা ও (৮) শাস্ত্র ব্যাখ্যা,—উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই উপায়গুলি অবলম্বিত হবে। পরিষদের কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ পরিষৎ কার্যালয় ৬নং আর জি কর রোড়ে (চারতলায়) ভাড়াটে বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় ও সেখান থেকে উঠে আসে ১৭ নং আর জি কর রোডের বর্তমান ভাড়াটে বাড়িতে। পরিষদের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আর তিনি ছিলেন পরিষদের আজীবন শুভানুধ্যায়ী।

পরিষৎ গ্রন্থাগারের প্রথম আরম্ভ হয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন। দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় দুটি আলমারি, ৫০০ হস্তলিখিত পুঁথি আর ১৫০ খানি মুদ্রিত গ্রন্থ দেন, তাই নিয়ে প্রথম গ্রন্থাগারের পত্তন হয়। সেই সময় জানকীনাথ কাব্যতীর্থ ও দুর্গামোহন কাব্যসাংখ্যতীর্থ কিছু সংখ্যক মুদ্রিত পুস্তক দিয়েছিলেন। বছর দুই পরে ৬নং আর জি কর রোডে থাকাকালীন লাইব্রেরীর অর্থ সংগ্রহের জন্য শকুন্তলা নাটক অভিনীত হয় ও তাতে প্রায় ১২০০৲ টাকা পাওয়া যায়। সেই টাকায় আলমারি ও পুস্তক কেনা হয়েছিল। এই সময় বিখ্যাত বণিক তুলারাম গোয়েঙ্কা লাইব্রেরীকে পাঁচ শত টাকার পুস্তক উপহার দেন, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানও পরিষৎ গ্রন্থাগারকে অর্থ সাহায্য দিতে আরম্ভ করেন। ফলে লাইব্রেরী বেড়ে উঠতে থাকে, পুঁথি ও বই-এর সংগ্রহ কার্যও সুচারুভাবে আরম্ভ হয়। ক্রমে দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য পুঁথিপত্রে পরিষৎ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ সময় সংস্কৃত মহামণ্ডল উঠে যাওয়ায় সেই গ্রন্থাগারের তিন শত মূল্যবান পুস্তক পাওয়া যায় আর শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহ দান করেন কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব

বাহাদুর। এ ছাড়া ভূ-কৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পুঁথিপত্রের সংগ্রহ, কৃষ্ণচন্দ্র বসুর পারিবারিক বৈষ্ণব ও বাংলা গ্রন্থ সংগ্রহ, পণ্ডিত সতীশ চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ, বামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের পুঁথি সংগ্রহ (যাতে বাংলা দুষ্প্রাপ্য আর জানা নেই এমন মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ছিল) পরিষৎ গ্রন্থাগারে অর্পিত হয়। দেখতে দেখতে গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ভারত ও সিংহলে মুদ্রিত গ্রন্থ সংগৃহীত হতে থাকে, সংগৃহীত হতে থাকে জার্মাণী, জাপান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকায় প্রকাশিত দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থরাজি। প্যারিসে প্রকাশিত ভাগবৎ আর রাশিয়ায় প্রকাশিত ওয়ার্থার বুক অভিধান পরিষৎ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়। এককথায় প্রাচ্য পাশ্চাত্যের কোথাও এমন মূল্যবান পুঁথিপত্রের সংগ্রহ, সংস্কৃত ভাষায় এমন দুর্লভ গ্রন্থ সমাবেশ নেই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। গবেষণা কার্যে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার দেখতে দেখতে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

পরিষদের নিজস্ব ভবনের প্রয়োজনীয়তা গোড়ার দিকেই অনুভূত হতে থাকে ও এর জন্যে চেতলার আশুতোষ বসু ১৯'৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী পরিষদকে মনোহরপুকুর রোডে সাড়ে দশ কাঠা ভূমি দান করেন। কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সে জমির অনেকখানি দখল করে নেন, আর বাকী ভূমি ১৩৪৪ সালে কর্পোরেশন থেকে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে পাঁচ কাঠা জমি পাওয়ার পর নূতন বাড়ি নির্মাণের জন্য বিক্রি করে দেওয়া হয়। বর্তমানে ১৬৮।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে পরিষদের একতলা গৃহ নির্মাণকার্য শেষ হয়ে গেছে, আর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানও আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে ১৯৫০ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে। কিন্তু দোতলা নির্মিত না হলে সেখানে পরিষদের স্থান সঙ্কুলান সম্ভব নয় বলে ১৭, আর জি কর রোডের আগের বাড়িতেই পরিষদের কাজকর্ম এখনো চলছে। পরিষৎ ভবনের দ্বিতল নির্মাণকার্য যাতে সত্বর সুসম্পন্ন হয়, সেজন্য দেশবাসীর মুক্তহস্ত বদান্যতা প্রয়োজন।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের বহুবিস্তৃত কার্যকলাপের সম্যক পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। পরিষৎ পরিচালিত হয়ে আসছে সরকারী সাহায্যে ও দেশ-বাসীর বদান্যতায়। গভর্ণমেণ্ট সাধারণ বিভাগে বর্তমানে নয় শত টাকা সাহায্য করছেন। এ ছাড়া গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগে ও গবেষণা কার্যের জন্য পরিষৎ

সরকারী অর্থ সাহায্য পেয়ে আসছে। কলকাতা কর্পোরেশন বর্তমানে টোলের জন্য ১০০৲ টাকা ও পরিষৎ গ্রন্থাগারের জন্য নিয়মিত পাঁচ শত টাকা অর্থ সাহায্য করছেন।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের রূপকাভিনয় বিভাগে আজ পর্যন্ত অন্ততঃ পঁচিশখানি রূপক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে গেছে, আর প্রশংসা পেয়েছেন দেশবিদেশের দর্শক মণ্ডলীর উচ্চাঙ্গের অভিনয়-কুশলতার জন্যে। সংস্কৃত ভাষায় সেবায় নিয়োজিত 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর। পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগে এ-পর্যন্ত সাতাশখানি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে, তার ভেতর আছে নন্দীশ্বরের প্রভাকর-বিজয়ম্, ধোয়ীর পবন দূতম, বিষ্ণুদাসের মনোদূতম প্রভৃতি দুর্লভ গ্রন্থরাজি। চতুষ্পাঠী বিভাগের আচার্য পদে বর্তমানে অধিষ্ঠিত আছেন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ শাস্ত্রী আর অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন পণ্ডিত শ্রীরামধন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী মহাশয়। পরিষদের গবেষণা কার্য অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য কাব্য-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে সুচারুরূপে চলছে, আর তার ফল শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। পরিষদের উন্নতির জন্য কর্ম-পরিষদের সকলেই খাটছেন সত্যি; কিন্তু তাঁদের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ও শ্রীকার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে পরিষদ-গ্রন্থাগারের মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ৮২৪২, আর সাত হাজার পুঁথি-পাণ্ডুলিপি সেখানে রক্ষিত হয়েছে। বহু আয়াসে ও ব্যয়ে সংগৃহীত হয়েছে এই দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, তার ভেতর রয়েছে সাতশো বছরেরও আগের হাতে লেখা পুঁথি। দুর্লভ পাণ্ডুলিপির ভেতরে রয়েছে বোপদেবের কাব্য-কামধেনু-সর্বশাস্ত্রপ্রবোধনী, কাতন্ত্রের বাররুচবৃত্তি (তালিসপত্রে লিখিত), ভবদত্তের নৈষধ বিবরণ, গদসিংহের তত্ত্বচন্দ্রিকা, মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্যের বিখ্যাত বিজয় নাটক, শ্রীদত্তের শ্রাদ্ধকল্প, অনিরুদ্ধ ভট্টের পিতৃদয়িতা (পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত), বল্কলে লিখিত ভাগবৎ, ১৩৬৫ শকে লিখিত শারীরক ভাষ্য, রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণিকৃত ও তাঁর পুত্রের দ্বারা লিখিত কৃত্যতত্ত্বার্ণব, মথুরানাথের ন্যায় রহস্য, পক্ষধর মিশ্রের আলোক, মহাভারতের উদীচ্যকৃত ও আনন্দপূর্ণকৃত টীকা, শ্রীপতির জাতক-

পদ্ধতি, তন্ত্রের বহু অপ্রকাশিত পুঁথি, স্বর্ণদ্রবে (সোনার জলে) নেওয়ারী (নেপালী) লিপিতে লিখিত অন্তত: পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন পঞ্চরক্ষা প্রভৃতি বহু বৌদ্ধগ্রন্থ আর অসংখ্য অপ্রকাশিত দুর্লভ পুঁথিপত্র। এককথায় সুধীজন-অধ্যুষিত এই গ্রন্থাগার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা কার্যে একেবারে অপরিহার্য, নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে।

যদিও এ গ্রন্থাগার সকলেই ব্যবহার করতে পারেন, তবু বই নিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা কেবলমাত্র পরিষদের সভ্যদেরই আছে। তাঁদেরও এক সঙ্গে দুখানার বেশী বই নেবার বা এক মাসের অধিককাল তা' রাখবার নিয়ম নেই, আর বই নেবার সময় প্রত্যেক বই-এর জন্য তাঁদেরকে পাঁচ টাকা করে গ্রন্থাগারে জমা রাখতে হয়। পরিষদের সভ্য হতে বার্ষিক বারো টাকা চাঁদা দিতে হয় আর অধ্যাপক ও ছাত্রদের সভ্য হতে লাগে ছয় টাকা করে। গ্রন্থাগারের বর্তমান গ্রন্থাগারিক শ্রীজানকীনাথ শাস্ত্রী, পরিষদের বর্তমান সভাপতি বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ও বর্তমানে পরিষদের সম্পাদক হচ্ছেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য এম-এ, বি-এল, শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য এম-এ, কাব্য-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ ও শ্রীগৌরীনাথ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী এম-এ, পি-আর-এস।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ বিরাট ঐতিহ্যের ধারাপ্রবাহে বর্তমান ভারতের মর্মের বাণী বিশ্বের ভাবধারায় সঞ্চারিত করুক, আর সার্থক হয়ে উঠুক তার বহু-বিস্তৃত কর্মধারার জয়যাত্রা উদ্ভাসিত আলোকের আনন্দজ্যোতিতে।

[১-৬-৫২]

বেলেঘাটা লাইব্রেরী

বেলেঘাটা মেন রোড এ অঞ্চলের ভদ্রগোছের রাস্তা। পশ্চিম থেকে পূব দিকে জোড়ামন্দির পর্যন্ত চলে গেছে রেখা টেনে সোজা। উঁচু রাস্তা, নীচে নালায় পচা জল জমে আছে। দু'ধারে এলোমেলো ধনীদের বড় বড় অট্টালিকার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে জীর্ণ খোলার ঘরগুলো, ডোবা, জলা জঙ্গল। ধনীদের আধুনিক একটা সহর গড়ে উঠবার ভাব রয়েছে, কিন্তু আজো যেন সেটা গরীবদের বস্তির মায়া ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারছে না। নোংরা এলাকা পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে আর সে চেষ্টার লক্ষণ সর্বত্র সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। জোড়ামন্দিরের কাছাকাছি বিখ্যাত সরকার বাড়ীর আগটায় রাস্তার দক্ষিণ ধারে মাঠ। মাঠের পশ্চিম সীমা ঘেঁষে অসমাপ্ত দোতলা অট্টালিকার ছাদহীন হা-করা ইটের পাজরা দাঁড়িয়ে আছে—বেলেঘাটা লাইব্রেরী। পাঁচ কাঠা ভূমির ওপর লাইব্রেরী ঘরের কাঠামো খাড়া করা হয়েছে। বড় পরিকল্পনা, ওপরে লাইব্রেরী থাকবে, পাঠাগারের ব্যবস্থা করা হবে, ব্যালকনিযুক্ত বারান্দায় চারধার থাকবে ঘেরা আর নীচে থাকবে মস্তবড় হল-ঘরে থিয়েটার মঞ্চ আর সভা-সমিতি অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা। পরিকল্পনাটির বাস্তব রূপ আজো কল্পনা ক'রে নিতে হয়।

লাইব্রেরী ঘরের জন্য পাঁচ কাঠা জমি দান করেছেন সরকার বাড়ীর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীবিধুভূষণ সরকার ও শ্রীগণপতি সরকার। গণপতিবাবু একেবারে গোড়া থেকেই লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত আর প্রতিষ্ঠাতাদের প্রধান একজন। তাঁর কাছে শুনলাম, ইতিমধ্যে গৃহ নির্মাণকার্যে ষোল হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে, তার ভেতর চার হাজার টাকা দিয়েছেন কলকাতা কর্পোরেশন। এ ছাড়া কর্পোরেশনের বার্ষিক অর্থ সাহায্য রয়েছে লাইব্রেরীতে পাঁচ শত টাকা।

সামনের দিকে একতলার একখানা ঘরে বর্তমানে লাইব্রেরীর কাজ চলছে। ছোট ঘর, কোনমতে কাজ চালাবার বন্দোবস্ত ক'রে নেওয়া হয়েছে। গোড়া

থেকে এখানে আসবার আগ পর্যন্ত লাইব্রেরী সরকার বাড়ীতেই ছিল, সেখানেই লাইব্রেরীর কাজ চলতো। বর্তমানেও ইংরেজী আর সংস্কৃত বই সেখানেই রয়েছে, বাংলা বইগুলো নিয়ে এখানে কাজ চলছে। বাংলা দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলো বিশেষ ক'রে বাংলা সাহিত্যকেই ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়, বাংলা সাহিত্যের প্রসার আর প্রচারের কাজে লাগে। এদিক দিয়ে এই লাইব্রেরীগুলোর মূল্য যথেষ্ট সন্দেহ নেই। অবশ্য এ উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৯৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও গড়ে উঠেছিল। তারো উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ইংরেজী আর সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি-বিধান।

কলকাতার লাইব্রেরীগুলোর ইতিহাস বিচিত্র। নানা উদ্দেশ্যে নানা বিভাগীয় লাইব্রেরী এখানে গড়ে উঠেছে। এতো বড় একটা এলাকার নানা ভাষাভাষী নানা জাতির প্রয়োজন দু'-একটা বা পাঁচ-সাতটা সরকারী বা আধা সরকারী লাইব্রেরীর মেটাবার উপায় যে নেই, একথা অতি সত্য আর সেগুলো থেকে প্রয়োজন মেটাবার সুযোগ-সুবিধা পাওয়াও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তারি ফলে পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার গড়ে উঠেছে। এর সবগুলিই নাম করবার মতো বড়ও নয়, বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতিতেও সবগুলো চলছে না। কিন্তু এগুলো সর্বসাধারণের চাহিদা মিটিয়ে চলেছে, মনের খোরাক যোগাচ্ছে—এটা কম কথা নয়, এর গুরুত্ব সত্যি ভেবে দেখবার মতো। সাধারণ লাইব্রেরী বলতে আমি যেগুলোর কথা বলছি; সেগুলো লাইব্রেরীর বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা পদ্ধতির ধার ঘেঁষেও যায় না, অনিয়ম আর অব্যবস্থার ভেতর দিয়েই সেগুলো জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনের একটা বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে। বহু দিন অবাক হয়ে ভেবেছি, যাদের খাবার জোটে না তাদের এ পড়বার বিলাস পোষায় কি ক'রে? এটাকে অনেক সময় অর্থহীন মানসিক বিলাস মনে হয়েছে। আসলে কিন্তু তা নয়, এক একটা জাতির এক একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে সাংস্কৃতিক জীবনটাই আসলে বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য। তা সে খেতে পাক, চাই না পাক। সমস্ত ভারতবর্ষকে বই-এর খোঁজে বাংলা দেশের লাইব্রেরীগুলোর কাছে ছুটে আসতেই হবে। এক কলকাতা সহরে ছোট বড় যত লাইব্রেরী রয়েছে আর তাতে রয়েছে যত রকমের বই, সমস্ত এশিয়া খণ্ডে আর কোথাও

তা পাওয়া যাবে না।

কলকাতার পূর্বপ্রান্তে বেলেঘাটা অনুন্নত এলাকা। কলকাতা কর্পোরেশনের ভেতর পড়লেও আজো এ এলাকার তেমন কিছু উন্নতি হয়নি। যারা যারা ওখানকার বাসিন্দা তাদের বাদ দিলে আজো সহজে কেউ ওখানে গিয়ে বসবাস করতে রাজি হয় না। আগে এটা ছিল মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন। তখন ওদিকের অবস্থা আরো খারাপ ছিল। ডোবা, জলা, জঙ্গল, মশা আর দুর্গন্ধ আজো আছে, তখনো ছিল। জল নিকাশের ব্যবস্থা তখনো ছিল না, এখনো নেই। তবু বেলেঘাটা এখন আগের চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন হয়েছে। কেরোসিনের বাতির পরিবর্তে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে, দু' একটা ভালো রাস্তাও বর্তমানে আছে। ঠিক বসবাসের যোগ্য হয়ে উঠেছে বললে বেশী বলা হবে, তবে উন্নতি এর হয়েছে অনেকখানিই আর বেলেঘাটা 'সরকার বাড়ী'র বিধুভূষণ সরকারের সার্থক চেষ্টায়ই এ অঞ্চলের দ্রুত অগ্রগতি অনেকটা সম্ভব হয়েছে।

এই সরকার বাড়ীর গণপতি সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে বহুদিন জড়িত। ১৯১৯ সালে তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক, বর্তমানেও তিনি সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে জড়িত আছেন। প্রথম তারি মাথায় আসে বেলেঘাটা লাইব্রেরী স্থাপনের কথা। তাঁর বড় ভাই বিধুভূষণ সরকার আর সহপাঠি (বর্তমান মন্ত্রী) হেমচন্দ্র নস্করের সঙ্গে এ বিষয়ে তিনি পরামর্শ করলেন। বেলেঘাটা লাইব্রেরী স্থাপনের কথা স্থির হ'ল আর আনুষ্ঠানিক ভাবে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হ'ল ১৯১৯ সালের ১৯শে জানুয়ারী। লাইব্রেরীর প্রথম সভাপতি হ'লেন আশুতোষ ঘোষ, সম্পাদক হ'লেন অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর লাইব্রেরীয়ান হ'লেন গণপতি সরকার। ৬৯নং বেলেঘাটা মেন রোডে 'সরকার বাড়ী'তেই লাইব্রেরীর কাজ চলতে লাগলো আর ধীরে ধীরে লাইব্রেরী বড় হয়ে উঠতে লাগলো গণপতিবাবু প্রভৃতির চেষ্টায়। কালী দত্ত লাইব্রেরীকে প্রায় শ' তিনেক বই দিয়ে সাহায্য করেন। আরম্ভের অল্প দিন পরেই লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ-নির্মাণ তহবিল স্থাপিত হল। এখনো আরো ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গেলে তবে অর্ধসমাপ্ত লাইব্রেরী-গৃহে কাজ সম্পূর্ণ হ'তে পারে।

'বিজয়া-সম্মিলনী' আর 'নাট্যাভিনয়' লাইব্রেরীর সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান। অভিনয় বৎসরে দু'বার ক'রে হয়ে থাকে আর বিশেষ ক'রে তাতে লাইব্রেরীর সদস্যদের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। অবশ্য অন্যান্য নাটক অভিনীত হ'তেও কোন বাধা নেই। এ ছাড়া মনীষীদের দ্বারা লাইব্রেরীতে বক্তৃতায় সকলেই যোগদান করতে পারেন। এমন সব সভায় সভাপতিত্ব ক'রে গেছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর জলধর সেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি আর বক্তৃতা দিয়েছেন শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, মিঃ কে সি দে (আই সি এস), রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ।

বেলেঘাটা লাইব্রেরীর আজীবন সদস্যদের চাঁদা এক শত টাকা, আর সাধারণ সভ্যের চাঁদা আট আনা। সাধারণ সভ্যদের চার টাকা ক'রে জমা দিতে হয়। পাঠাগারে দৈনিকে মাসিকে দশখানা পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তকের সংখ্যা পাঁচ হাজার সাত শ' পনের। ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানীর ১৩৪৬ সংস্করণ বঙ্গ দর্শনের সুদৃশ্য নয় খণ্ড (১২৭৯ সাল থেকে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত) লাইব্রেরীতে রক্ষিত হয়েছে। তা' ছাড়া লাইব্রেরীতে বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ আর পুরাতন বই-এর দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ আছে। এর মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড, কায়স্থ কাণ্ড, বৈশ্য কাণ্ড, রাজন্য কাণ্ড), দাশরথি রায় ও ব্রজ রায়ের পাঁচালী, বৌদ্ধ গান ও দোহা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, লিঙ্গপুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন বাংলার কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র—রামরাম বসু, স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, হুতোম পেঁচার নক্সা, বেদান্ত চন্দ্রিকা, নববাবু বিলাস, ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট, পাষণ্ড-পীড়ন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বেলেঘাটা লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি রায় বাহাদুর সুশীল মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক শান্তিনাথ সরকার আর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান হচ্ছেন কাশীনাথ সরকার। সহ লাইব্রেরীয়ান দুর্গাকান্ত ঘোষ রায় লাইব্রেরীর তরফ থেকে একখানা মাসিক পত্রিকা বের করবার চেষ্টা করছেন।

[৬-৪-৫২]

মনোহরপুকুর দেশবন্ধু পাঠাগার

মনোহরপুকুর কলকাতার খুব প্রাচীন এলাকা। সম্ভবতঃ কালীঘাটের সন্নিহিত অঞ্চল বলেই অতি প্রাচীনকালে এখানে লোকে বসবাস করতে আরম্ভ করে ও ক্রমে একটি সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মনোহরপুকুর দেশবন্ধু পাঠাগারের রজত-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়েছে ১৯৪৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর। সেই দিন লাইব্রেরীর ইতিহাস বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—'এ অঞ্চলে মনোহরপুকুর ইউনাইটেড ক্লাব লাইব্রেরীই প্রথম লাইব্রেরী। এ এলাকার উন্নত হবার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট, বহু প্রাচীনকালে এখানে জনপদ গড়ে উঠেছিল। আশেপাশের অঞ্চলগুলি যখন বসবাসের অযোগ্য ছিল, এখানে তখন চলতো সর্বাঙ্গীন সমাজ-ব্যবস্থায় এক সুষ্ঠু জীবন-প্রবাহ। কিন্তু এই জীবন-প্রবাহে একটা ফাঁকা থেকে গিয়েছিল। সে ছিল একটা লাইব্রেরীর অভাব। একটা অঞ্চলের সংস্কৃতি কেন্দ্র বলতে সেখানকার লাইব্রেরীকেই বোঝায়। সেই ফাঁকি পূরণ করতেই মনোহরপুকুরে এই লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা।

মনোহরপুকুর দেশবন্ধু পাঠাগার প্রথমে মনোহরপুকুর ইউনাইটেড ক্লাব লাইব্রেরী নামে আরম্ভ হয়েছিল। লাইব্রেরীর উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নলিনেশ্বর ভট্টাচার্য, অমূল্য সেনগুপ্ত, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ বিনয়ভূষণ বসু। আর পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ও কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক (লাইব্রেরীর প্রথম সভাপতি) এ লাইব্রেরী স্থাপনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিয়েছিলেন, আর লাইব্রেরীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন নানাভাবে। ১৯১৯ সালের ২৪শে নভেম্বর ১৯নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেনের বাড়ীতে আনুষ্ঠানিকভাবে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় ও পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। এখানে কয়েক মাস থাকার পর লাইব্রেরী ৩০ নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেনে উঠে যায়।

লাইব্রেরীর গোড়ার দিকের ইতিহাসে পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক (সভাপতি), আর ডাঃ বি এন ঘোষ (লাইব্রেরীর সম্পাদক), এ তিনজনের চেষ্টা, যত্ন ও নিঃস্বার্থ সেবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনজনেই ছিলেন প্রতিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী। লাইব্রেরীর উন্নতির জন্যে নানাভাবে ওঁরা কাজ করে গেছেন। টাকা চাই—সাহানগর ইউনাইটেড ক্লাব লাইব্রেরীর ভিত্তি রচনার টাকা তুলতে অভিনয়ের আয়োজন করলেন। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে খাটতে লাগলেন হাজার কাজের ফাঁকে। লাইব্রেরীর জন্যে বই চাই, আসবাবপত্র চাই, টাকা চাই। এ ব্যাপারে জনসাধারণের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেল ; অনেকেই চাঁদা দিলেন আর দিলেন নিজেদের বই লাইব্রেরীতে। চাঁদাদাতাদের ভেতর নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, অমূল্যধন আঢ্যী, কাপ্তেন রাজেশ্বর ভট্টাচার্য, খিদিরপুরের শ্রী টি পি ঘোষ, সন্তোষের রাজা বাহাদুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আর বইদাতাদের ভেতর নলিনেশ্বর ভট্টাচার্য (১০০ বই), যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৫০০ বই), সুরেন্দ্রনাথ রায় (৫০ বই), ও হরিদাস দাসের নাম করতে হয়। এ ছাড়া নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরীর অসংখ্য বই সদস্যদের পাঠের জন্য লাইব্রেরীতে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীর একখানা ঘরেই তখন লাইব্রেরীর কাজ চলতে থাকে। শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের চেষ্টায় একেবারে প্রথম থেকেই লাইব্রেরী কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি (তখন তাই বলা হত) থেকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে অর্থ সাহায্য পেতে আরম্ভ করে। এইরূপে সকলের সমবেত চেষ্টায় ও যত্নে লাইব্রেরী দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগলো।

পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে পাঁচ ছয় বৎসর লাইব্রেরীর কাজ চলতে থাকে। তারপর সেখান থেকে লাইব্রেরী উঠে যায় ৩নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেনে শিবপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বাড়ীতে। এখানে লাইব্রেরী ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ছিল। এ সময়ে বিশেষভাবে লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর অভাব অনুভূত হতে থাকে ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছেলেদের নিকট থেকে লাইব্রেরীর গৃহ নির্মাণ তহবিলে পাঁচ হাজার টাকা দান আদায় হয়। এ লাইব্রেরীর ইতিহাসে এই দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে মনোহরপুকুর ইউনাইটেড ক্লাব থেকে লাইব্রেরী সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায় ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিরক্ষার্থে

লাইব্রেরীর নূতন নামকরণ হয় 'মনোহরপুকুর দেশবন্ধু পাঠাগার'। এ সময়ে নূতন কর্মপরিষদের পরিচালনায় লাইব্রেরী চলতে থাকে ও সর্বপ্রথম একটি ভাড়াটে বাড়ীতে ১২৬।৬, মনোহরপুকুর রোডে স্থানান্তরিত হয়।

নূতন পরিচালকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে প্রথম লাইব্রেরী ভালভাবে চললেও ১৯২৮ সাল থেকে লাইব্রেরীর অবস্থা খারাপ হতে থাকে, আর সেটা চরমে পৌঁছে ১৯৩০ সালে। এ সময়ে রমাপদ চট্টোপাধ্যায় লাইব্রেরীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন ও ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে নূতন কর্ম পরিষদ গঠিত হয়। প্রফুল্লবাবু জায়গা কিনে গৃহ-নির্মাণে তৎপর হন। ফলে ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে লাইব্রেরী নিজস্ব একতলা পাকা বাড়ীতে চলে আসে ও ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে লাইব্রেরী হলের নাম রাখা হয় "সতীশ স্মৃতি মন্দির।" এইরূপে নিজস্ব বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে লাইব্রেরীর কার্যকলাপ দ্রুত বেড়ে চলে। এ সময়ে লাইব্রেরীর 'শিশু বিভাগ' খোলা হয়। লাইব্রেরীর শিশু বিভাগে বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা ১৫০০। শিশু-সাথী, মৌচাক প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পত্রিকাও এ বিভাগে রাখা হয়ে থাকে। লক্ষ্য করবার বিষয়, এ বিভাগে ১৯৪৬ সালে সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ২২ জন, আর বর্তমানে এর সভ্য সংখ্যা ১০ জন মাত্র। শিশু-সভ্যদের দু' টাকা করে জমা ও মাসিক ৶০ আনা করে চাঁদা দিতে হয়।

দেশবন্ধু পাঠাগারের উন্নতির ইতিহাসে ১৯৩৭ সাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে ডাঃ এস কে গুপ্ত লাইব্রেরীর সভাপতি হন। এ অঞ্চলের সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে থাকে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনিই দেশবন্ধু পাঠাগারের সভাপতি। এ অঞ্চলে এই গ্রন্থাগার একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণে টালিগঞ্জ, পূর্বে বালিগঞ্জ, পশ্চিমে চেৎলা ও উত্তরে ভবানীপুর—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দারা এই লাইব্রেরীর পাঠক ও সদস্য। বর্তমানে লাইব্রেরীর সদস্য সংখ্যা ৪৭০।

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেশবন্ধু পাঠাগারের মহিলা বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগে মেয়েদের কাজে লাগে এমন সব বই রাখা হয়। এখানে রয়েছে গৃহস্থালী, রান্না, গান, সেলাই, প্রসূতি পরিচর্যা ও শিশু-পালন সম্বন্ধীয়

যাবতীয় মূল্যবান পুস্তকপত্র। আশা করা যায়, মহিলা মাত্রেই এই বিভাগের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবেন।

কয়েক বৎসর যাবৎ এই বর্ধিত কার্যকলাপের জন্য লাইব্রেরীতে স্থানাভাব অনুভূত হতে থাকে ও অনেক সময় নূতন সদস্য গ্রহণ বন্ধ করে দিতে হয়। লাইব্রেরী গৃহের দ্বিতল নির্মাণের জন্য একটি তহবিল স্থাপিত হয়েছে ; কিন্তু গৃহ নির্মাণের জিনিষপত্র না পাওয়ার এখনো সেটা হয়ে ওঠেনি। আশা করা যায়, বর্তমান বৎসরে দ্বিতল নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়ে যাবে।

মনোহরপুকুর দেশবন্ধু পাঠাগারের আজীবন সদস্যের চাঁদা ২৫০৲ টাকা। উঁহারা এক সঙ্গে তিন খানা বই নিতে পারেন। সাধারণ সদস্যদের 'ক' 'খ' ও 'গ' এই তিনটা শ্রেণী রয়েছে। যথাক্রমে উঁহাদের জন্য আট টাকা, পাঁচ টাকা, আর মাসিক চাঁদা এক টাকা দু' আনা, বারো আনা ও ছয় আনা আর এক সঙ্গে বই নেবার যোগ্যতা তিন খানা, দু'খানা ও একখানা। মহিলারাও সাধারণ সদস্যদের পর্যায়ভুক্ত। এ ছাড়া লাইব্রেরীর শিশু-বিভাগে শিশু সদস্য রয়েছে। লাইব্রেরীতে প্রবেশ মূল্য এক মাসের চাঁদার সমান।

বর্তমানে লাইব্রেরীর পুস্তক- সংখ্যা ৮৫৯৩। এর ভেতর বাংলা বই ৬৪৮৩ খানা আর বাকি ২১১০ খানা ইংরেজী বই। লাইব্রেরীর পাঠাগারে পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা আছে, সর্বসাধারণে বিনামূল্যে সেখানে বসে পড়তে পারেন। পাঠাগারে ২ খানা ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ৫ খানা দৈনিক, ১০ খানা সাপ্তাহিক ও ৮ খানা মাসিক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। দেশবন্ধু পাঠাগারের বর্তমান সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত, আর শ্রীজীবকুমার দত্ত রায় লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান।

[৭-৯-৫২]

শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট

খুঁজলে দেখতে পাওয়া যাবে, অনেক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মূলেই রয়েছে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা—কয়েকটি বালকের খেয়াল বা স্বপ্ন আর সেই স্বপ্নই একদিন দেখতে দেখতে সার্থক হয়ে উঠেছে। সেদিন যে ক্ষুদ্র বীজের সন্ধান কেউ রাখেনি, সেটাই ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রমে বেড়ে উঠেছে, শাখা-প্রশাখার আর একদিন দেখা দিয়েছে মহামহীরুহরূপে। গোড়ায় ক্ষুদ্রাবয়ব বীজের ভেতর যে মহাসম্ভাবনা লুক্কায়িত ছিল, পরবর্তীকালে এ তারই রূপান্তরের ইতিহাস।

ইংরেজী ১৯২০ সাল, একত্রিশ বছর আগের কথা। সেদিন কাঁটাপুকুরের কয়েকটি ছেলের চেষ্টায় কাঁটাপুকুর স্পোর্টিং ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরীর সূচনা হল। প্রভাতকুমার বোস, জ্যোতির্ময় নাগ, ইন্দুভূষণ মুখার্জী, বিপিনবিহারী কুণ্ডু প্রভৃতির সেদিনকার সেই স্বপ্নই অর্থাৎ সেই কাঁটাপুকুর স্পোর্টিং ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী বর্তমান শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটে রূপান্তরিত হয়েছে। ছোট আরম্ভের এ এক সার্থক পরিণতি।

সেদিন যাঁদের চেষ্টায় এই কাঁটাপুকুর স্পোর্টিং ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরীর পত্তন হয়, তাঁদের স্বপ্ন ছিল এই প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সমস্ত দেশের ও সমাজের সেবা, আর দেশবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিগত সর্ববিধ উন্নতি সাধন। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে সেদিন চলেছিল তাঁদের অবিরাম কর্মপ্রচেষ্টা; সেবাবিভাগ, খেলাধূলা ও ব্যায়ামবিভাগ, শিল্প, সঙ্গীত বিভাগ ও পাঠাগারের ভেতর তাঁদের কাজ এগিয়ে যেতে লাগলো। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কাজ চললো দিনের পর দিন; তাঁদের পেছনে সেদিন জনবল, অর্থবল কিছুই ছিল না। পত্রিকাবাড়ীর ছেলেদের চেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগলো।

ক্রমে সহরের খেলাধূলায় শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ও সমাজ-সেবাকার্যে ইহা প্রধান অংশ গ্রহণ করতে থাকে ও সহরবাসী জনসাধারণের

দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। ক্রমে সভ্য সংখ্যা বাড়তে থাকে, কলকাতা কর্পোরেশন থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় আর কাঁটাপুকুর স্পোর্টিং ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরীর কাজের পরিধি বেড়ে চলে। প্রথমে ইহার কার্যালয় ছিল কাঁটাপুকুরে জ্যোতির্ময় নাগের বাড়ীতে, পরে বর্তমান ভাড়াটে বাড়ীতে ইহা স্থানান্তরিত করা হয়। ইংরেজী ১৯৩১ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে কাঁটা-পুকুর স্পোর্টিং ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরীর নূতন নামকরণ হয় শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট। এর পর থেকে ইনষ্টিটিউটের কাজ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং বর্তমান ভাড়াটে ঘরে ক্রমে স্থান সঙ্কুলান কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে ইনষ্টিটিউটের জন্য নূতন নিজস্ব বাড়ীর প্রস্তাব গৃহীত হয় ও ১৯৩৪ সালে বাংলা দেশের নেতৃস্থানীয় ও বহু খ্যাতনামা লোকের নাম স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্রে এর জন্য দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে এক বিবৃতি প্রচারিত হয়। ইংরেজী ভাষায় লিখিত সে বিবৃতিটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :—

"কলকাতার অধিবাসী জনসাধারণ সকলেই জানেন, শিশিরকুমারের স্মৃতি-রক্ষার জন্যে ১৯২০ সালে শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের জনসেবার কথাও তাঁদের অজানা নেই। ইনষ্টিটিউটের সদস্যগণ দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতায় ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব ভবন নির্মাণে সঙ্কল্প করেছেন। শিশিরকুমার অতীতের মুকুরে দেশবাসীর ভবিষ্যৎ প্রতিফলিত দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, আমাদের গৌরবময় অতীত গৌরবোজ্জল ভবিষ্যৎ গড়বেই গড়বে। এই আদর্শের ওপরই শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটের ভিত্তি। এর কার্যপদ্ধতি শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক সর্ববিধ উন্নতি সাধনের দিকে প্রসারিত।"

বর্তমানে শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট সেবা-শিক্ষা-সংস্কৃতির বিষয়ে ব্যাপক কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। জনসেবা বিভাগ, সেণ্টজন এম্বুলেন্স ব্রিগেড, লাইব্রেরী ও মৃণালকান্তি সাধারণ পাঠাগার ও শিল্পকলা বিভাগের কাজ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সেণ্টজন এম্বুলেন্স ব্রিগেড ১৯৪০ সালে খোলা হয়। জনসেবার জন্য সুশিক্ষিত সেবাদল গঠিত হয়েছে, দুঃস্থকে সাহায্য করতে ইঁহারা সর্বদাই

প্রস্তুত। কলেরা-বসন্তের সময় ইঁহারা বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার কাজ করছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে যখন দলে দলে উদ্বাস্তু আসতে থাকে, তখন শিয়ালদা ষ্টেশনে দু' মাস ধরে চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করে উদ্বাস্তুদের সেবায় এই সেবাদল আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। তা' ছাড়া বারুণী, দশহরা গ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে স্নানযাত্রীদের ইঁহারা সাহায্য করে থাকেন। পুরীর রথযাত্রায়, বেলুড়মঠের উৎসবে, বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে এই সেবাদলের সেবাকার্য বর্তমান বৎসরে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক চিকিৎসা-সাহায্য শিক্ষা-দানের ব্যবস্থাও এখানে রয়েছে।

লাইব্রেরী ও মৃণালকান্তি সাধারণ পাঠাগারে সর্বসাধারণের পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা বর্তমানে সর্বমোট ১৩,৮৮৪ খানা। তার ভেতর বাংলা বই-এর সংখ্যা হ'ল ৯,৫৫৬ খানা আর বাকি ইংরেজী। লাইব্রেরী ও পাঠাগারে অনেকগুলো সংবাদপত্র এবং পত্রিকা সর্ব-সাধারণের পাঠের জন্য নিয়মিতভাবে রাখা হয়। তার মধ্যে দৈনিকের সংখ্যা বর্তমানে ৭, পাঁচ খানা সাপ্তাহিক, ১ খানা পাক্ষিক ও ১৬ খানা মাসিক পত্রিকা। মোটের উপর বাংলা ও ইংরেজী শ্রেষ্ঠ পত্র-পত্রিকাগুলো পাঠাগারে পড়তে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গত ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে ইনষ্টিটিউটের পাঠাগারের নূতন নামকরণ হয়েছে মৃণালকান্তি সাধারণ পাঠাগার।

স্থানীয় বালক-বালিকাদের শিক্ষার সুবিধার জন্য লাইব্রেরী ও পাঠাগারের শিশু-বিভাগ খোলা হয়েছে। শিশু-বিভাগে সভ্য-সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। বর্তমানে এ বিভাগের সভ্যসংখ্যা ১৩৮, পুস্তকসংখ্যা ১,৩১৮ ও পত্রিকাসংখ্যা ৪। সপ্তাহে তিনদিন এ বিভাগের কাজ চলে।

ইনষ্টিটিউটের শিল্প-কলা বিভাগ সঙ্গীত ও অভিনয় অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সর্বসাধারণকে আনন্দ পরিবেশন করছেন। ১৯৫০ সালের ২৩শে মে এই বিভাগ শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মেঘমুক্তি' অভিনয় করেন। তা' ছাড়া ১৯৫০ সালের ১৬ই জুলাই শ্রী সিনেমা গৃহে তাঁরা আয়োজন করেন এক সঙ্গীত অনুষ্ঠানের, যাতে যোগ দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীপঙ্কজ মল্লিক, শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশীতল ব্যানার্জী, শ্রীমতী কল্যাণী দাশ

প্রভৃতি সেরা শিল্পিবৃন্দ। বঙ্গীয় কলালয়ের ছাত্রবৃন্দকে নিয়ে ১৯৫০ সালের ২৭শে জানুয়ারী এই বিভাগ এক বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এসবের ভেতর দিয়ে ইনষ্টিটিউটের আদর্শ দিনে দিনে পরিণতির পথে চলছে।

মোটের উপর যে উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯২০ সালে এর সূচনা, ক্রমেই সেটা সার্থকতার পথে এগিয়ে চলছে বলা যায়। বর্তমানে এর আর্থিক অবস্থা ভালই। তবু মনে হয়, ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব নূতন গৃহ নির্মাণের জন্য দেশবাসীর নিকট থেকে যতটুকু সাহায্য ও সাড়া পাওয়া উচিত ছিল তা যেন পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ব্যানার্জীর চেষ্টায় এ বৎসর গৃহ নির্মাণ তহবিলের ১৭৫১৲ টাকা চাঁদা আদায় হয়েছে, এ প্রসঙ্গে একথার উল্লেখ করতে হয়।

বর্তমানে ইনষ্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুধীরকুমার বোস। উপযুক্ত কার্য-নির্বাহক সমিতির তত্ত্বাবধানে ইনষ্টিটিউটের কাজ বর্তমানে সুচারুরূপে চলছে।

[১৩-১-৫২]

সমাজপতি স্মৃতি সমিতি

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা দেশের সব রকম সাহিত্য-প্রচেষ্টার সঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম জড়িত রয়েছে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র ছিলেন। সুরেশচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যিক, সমালোচক, সম্পাদক ও বাগ্মী,—একাধারে এতোগুলো গুণের সমাবেশ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। তিনি যখন 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বৎসর। পর বৎসর (১২৯৭ বঙ্গাব্দে) সে পত্রিকার নাম পরিবর্তিত হয় ও 'সাহিত্য' নামে তাহা প্রকাশিত হ'তে থাকে। সুরেশচন্দ্রকে 'সাহিত্য' সম্পাদক হিসেবে লোকে চেনে—তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পত্রিকাখানি তিনি সম্পাদনা ক'রে গেছেন। এ প্রসঙ্গে আরো দু'-একটি কথা বলতে হয়। মাসিক 'সাহিত্যের' প্রধান আকর্ষণ ছিল তাতে যে সাহিত্য সমালোচনা থাকতো সেটা। 'সাহিত্য' খুলে প্রথমেই লোকে মাসিক সাহিত্য সমালোচনার পাতাটি পড়তে বসতো। সেটা ছিল যেমন নির্ভীক রচনা, তেমনি উপভোগ্য। নমুনাস্বরূপ একবারের মাসিক মালঞ্চের কবিতার সমালোচনা,—"মালঞ্চে এবার ঘেঁটু ফুলেরই ছড়াছড়ি।" একবার এক লেখক গ্রন্থারম্ভে নিবেদনে দৈন্য প্রকাশ করলেন, "অক্ষম রচনায় ফুল তুলিতে গিয়া কাঁটা তুলিয়াছি।" গ্রন্থ সমালোচনায় সমাজপতি লিখলেন, "লেখকের সত্য ভাষণ প্রশংসনীয়।" কোন কবি লিখেছিলেন, "আমাদের স্থান কোথায়?" সমাজপতি সোজা ব'লে দিলেন, "বাতুলাশ্রমে।" ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই পৌষ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি দেহত্যাগ করেন আর তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই ১৩২৭ সালের ১লা ফাল্গুন স্থাপিত হয় সমাজপতি স্মৃতি-সমিতি।

সুরেশচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্মৃতি রক্ষার আয়োজন চলতে থাকে। তাঁর পল্লীবাসী আর অনুরাগী কয়েকজন সাহিত্যিক এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা নিতে থাকেন। প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু, অমূল্যচরণ

বিদ্যাভূষণ, কিরণচন্দ্র দত্ত, কালীকৃষ্ণ ভদ্র, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, মণিমোহন নাগ প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ। স্থির হ'ল, সুরেশচন্দ্রের শেষ বাসস্থানের নিকটে তাঁর স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করতে হবে। ১৩নং রামধন মিত্র লেনে সমাজপতি স্মৃতি সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১লা ফাল্গুন কলকাতার তখনকার শেরিফ ডাঃ চুণীলাল বসু, এম-বি, সি-আই-ই সমিতির উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন করলেন।

সমাজপতি স্মৃতি-সমিতি প্রধানতঃ তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ হয়। প্রথম উদ্দেশ্য হ'ল সুরেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্যে সাহিত্যালোচনা প্রবর্তন আর গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সুরেশচন্দ্রের সমালোচনাগুলো সঙ্কলনপূর্বক গ্রন্থাকারে প্রকাশ, আর তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ। আর তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সরল বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা পল্লীর বালক ও যুবকদের মানসিক উন্নতি বিধান।

সমাজপতি স্মৃতি-সমিতি প্রথম আরম্ভ হয় সুরেশচন্দ্রের নিজস্ব ক্ষুদ্র লাইব্রেরী নিয়ে। লাইব্রেরীর প্রথম পুস্তকসংখ্যা ছিল ১০০, তার ভেতর ৭০ খানা বাংলা আর বাকি ৩০ খানা ইংরেজী। লাইব্রেরীর প্রথম সভ্যসংখ্যা ছিল চৌদ্দজন মাত্র। সমাজপতি স্মৃতি-সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আর প্রথম লাইব্রেরীয়ান ছিলেন শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম থেকেই লাইব্রেরী অর্থানুকূল্য ও পুস্তক উপহার পেতে থাকে, পেতে থাকে সর্বসাধারণের সহানুভূতি, ফলে দ্রুত সভ্যসংখ্যা বাড়তে আরম্ভ হ'ল। লাইব্রেরী আরম্ভ হয়েছিল ১৩নং রামধন মিত্র লেনের ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ীতে। কর্ম প্রসারের ফলে ১৩৩১ সালে ৪।১।২নং রামধন মিত্র লেনের বাড়ীতে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হ'ল। দুই বৎসর পরে ১৩৩৩ সালে লাইব্রেরী উঠে যায় ২নং শ্যামপুকুর লেনের ভাড়াটে বাড়ীতে। চার বৎসর সমিতির কাজ সেখানে চলে, পরে বাড়ীওয়ালার নিজস্ব প্রয়োজনে সে বাড়ী ছেড়ে দিতে হয়। ১৩৩৭ সালের কার্তিক মাসে ২০নং শ্যামপুকুর লেনে সামনের বাড়ীতে লাইব্রেরী উঠে যায়। কর্মবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে ৪৩নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটে দু'খানা ভাড়াটে ঘরে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হ'ল। কিন্তু সেখানেও স্থান সঙ্কুলান

না হওয়ায় ১৩৪১ সালের পৌষ মাসে লাইব্রেরী উঠে আসে ৪৭ই, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের বর্তমান বড় ভাড়াটে বাড়ীতে।

কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে সমাজপতি স্মৃতি-সমিতির পক্ষ থেকে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৯ই মাঘ 'শরৎচন্দ্র-শোকসভা'র আয়োজন করা হয়। সে সভায় সভাপতি ছিলেন রায় বাহাদুর জলধর সেন। সভায় স্থাপিত জি পাল এণ্ড সন্সের শ্রীমণি পাল নির্মিত শরৎচন্দ্রের মৃণ্ময় প্রতিমূর্তি মৃৎশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে সেদিন উপস্থিত সকলকে বিমুগ্ধ করেছিল।

সমারোহের সহিত সমাজপতি স্মৃতি-সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। এ উপলক্ষে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ৮ই আষাঢ় সন্ধ্যা ৭টায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার সে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তারপর ১৪ই আষাঢ়, শনিবার ৩১, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে বরেন্দ্র-স্মৃতি ভবনে সমিতির উদ্যোগে পল্লী গ্রন্থাগার পরিচালক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর তাতে সভাপতি ছিলেন ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়। রজত-জয়ন্তী উৎসবের তৃতীয় দিনের কর্মসূচী 'সঙ্গীতানুষ্ঠান'। 'শ্রী' প্রেক্ষাগৃহে সেটা সম্পন্ন হয়েছিল ২৯শে আষাঢ়, রবিবার প্রাতে আর হেমন্তকুমার বসু ছিলেন তার সভাপতি। এক কথায় সমস্ত আষাঢ় মাসব্যাপী সমিতির রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৩৫০ সালের মন্বন্তরে সমিতির সেবা বিভাগ খোলা হয়েছে। বরেন্দ্র-স্মৃতি-ভবন প্রাঙ্গণে দুঃস্থ শিশুগণকে দুগ্ধ ও বার্লি প্রদান আর রোগে বিনামূল্যে পুষ্টিকর ঔষধ বিতরণ এই বিভাগের কাজ। প্রতি বৎসর সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতির মৃত্যুতিথিতে সমিতির উদ্যোগে সমাজপতি স্মৃতি-বাসর উদযাপিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া সমাজপতি স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে বৎসরে সাত আটটি সাহিত্য আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। জীবনোপায় সন্ধানী বিভাগ ব'লে সমিতির একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। যুদ্ধোত্তর যুগে শিল্পোন্নতির সাথে পাঠকরা তাল রেখে যাতে জীবিকার্জন করতে পারেন, সেটাই এর উদ্দেশ্য। এ বিভাগে বিশেষজ্ঞ দ্বারা কার্যকরী বৃত্তি আর শিল্প শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দেবার ও পাঠকদের সন্ধানী পুস্তক প্রদান করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সভাপতি, ৪ জন সহ-সভাপতি, ২ জন সহকারী সহ-সম্পাদক, ৩ জন

সহকারী সহ-লাইব্রেরীয়ান, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব-রক্ষক আর কুড়িজন সাধারণ সদস্য নিয়ে বর্তমান সমিতির কর্ম-পরিষদ গঠিত। সমিতির বর্তমান সভাপতি শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার আর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান হ'লেন শ্রীদেবীপদ নন্দন। সমিতির আজীবন সভ্যের চাঁদা ১০১৲। বর্তমানে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দে, নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস মুন্সী, প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও কালীপদ গুহ রায়—সমিতির এই ছয়জন মাত্র আজীবন সভ্য আছেন। সমিতির কিশোরবিভাগে বর্তমান সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

বর্তমানে লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা বাংলা ৬৪৪৯ ও ইংরেজী ২৩১৬ খানা মিলিয়ে সর্বমোট ৮৭৬৫ খানা আর কিশোর বিভাগে ১৪০৫ খানা কিশোর-পাঠ্য পুস্তক রয়েছে। পাঠাগারে সর্বসাধারণের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা আছে আর সেখানে রাখা হয়েছে ষোলখানা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা। কিশোর বিভাগে মৌচাক, শিশুসাথী ও শুকতারা—এই তিনখানা মাসিক রাখা হয়ে থাকে। সাধারণ সভ্যকে মাসিক ছয় আনা চাঁদা দিতে হয় আর জমা রাখতে হয় তিন টাকা আর কিশোর বিভাগের জমা এক টাকা আর চাঁদা তিন আনা মাত্র। বৃহস্পতি ও রবিবার ছাড়া সপ্তাহে পাঁচ দিন কিশোর বিভাগের কাজ চলে।

সমাজপতি স্মৃতি-সমিতির কিশোর বিভাগের বর্তমানে কুড়ি বৎসর চলছে, বর্তমানে এর সভ্যসংখ্যা ৯২। এ বিভাগের কার্যকলাপ সম্পন্ন করার জন্যে পৃথক উপ-সমিতি রয়েছে, কলিকাতা কর্পোরেশনের সাহায্য রয়েছে এ বিভাগে। ১৩৩২ সালে সমাজপতি স্মৃতি-সমিতিকে কলকাতা কর্পোরেশন প্রথম ৫০৲ টাকা ক'রে অর্থ সাহায্য করতে আরম্ভ করেন। বর্তমানে সেটা বেড়ে ২৮৯৲ টাকা হয়েছে আর কিশোর বিভাগে বর্তমানে কর্পোরেশনের সাহায্য চলছে ২৩৲ টাকা ক'রে।

"কথিকা" ব'লে একটি গল্পের আসর আছে এই কিশোর-বিভাগে। গল্পের ভেতর দিয়ে বিজ্ঞানকেও লোভনীয় ক'রে তোলা যায়। "দাদাভাই" শ্রীসুধীর কুমার কুণ্ডুর যত্নে ও চেষ্টায় আর সার্বজনীন "কাকাবাবু" শ্রীপ্রভাতকিরণ বসুর পৌরোহিত্যে কিশোরদের জন্যে এই "কথিকা" আসরের প্রতিষ্ঠা হয়। এ

আসরে কিশোরদের গল্প বলেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, "মৌমাছি" প্রভৃতি।

সমিতির সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু ১৩২৭ সাল থেকে ১৩৫২ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সমিতির আরম্ভ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সমিতির সভাপতি ছিলেন আর ১৩৪০ সাল থেকে ১৩৫০ সালের অগ্রহায়ণ অবধি সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য। বিশেষভাবে এ দু'জনের নাম এ প্রসঙ্গে করতে হয়। এঁদের দু'জনের যত্নে আর চেষ্টায় সমাজপতি স্মৃতি-সমিতি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে—এঁদের দু'জনের অধ্যবসায় আজকের সমিতির গড়ে ওঠার গোড়ার কথা।

[৪-৩-৫২]

দক্ষিণ কলিকাতা সংসদ পাঠাগার

'দক্ষিণ কলিকাতা সংসদ পাঠাগার'—দক্ষিণ কলকাতা বলতে এখানে বালিগঞ্জ বোঝাচ্ছে। বালিগঞ্জ কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে গড়ে ওঠা একটা আধুনিক সহর। সুসজ্জিত বাড়ী, ঝকঝকে রাস্তা। বালিগঞ্জের সত্যি একটা নিজস্ব রূপ আছে, আধুনিকতার একটা নামডাক। বনেদি নয়—একেলে, এ নামে ভারের চেয়ে ধার বেশী। বাগবাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর বলতে মনে যে সম্ভ্রমের ভাব জেগে ওঠে, এ-নামে তা' হয় না, মাত্র একটা কৌতূহল জায়গায়। এখানে অবসরপ্রাপ্ত বড়লোকদের বিরাট বিরাট বাড়ীর চারদিকে মিশে রয়েছে আধুনিকতার একটা কৃত্রিম আবহাওয়া যাতে ক'রে এখানকার জীবনের সাবলীল গতিতে একটা ছেদ এসেছে, কৃত্রিম রীতিনীতির কতকগুলো জট পাকিয়ে এ-জায়গা হারিয়ে ফেলেছে তার স্বাভাবিকতা। ফলে উত্তর বা মধ্য কলকাতার কথা ছেড়েই দিলাম, পাশাপাশি ভবানীপুরের কাছে পর্যন্ত বালিগঞ্জকে মনে হবে নির্জীব।

পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে এলাকা। বিপুলায়তন বাড়ীর আর দামী দামী গাড়ীর ছড়াছড়ি চারিদিকে। যেদিকে চোখ পড়ে, একটা শান্তশ্রী চোখের সামনে ভেসে উঠে। কলকাতার উগ্র জীবন-যুদ্ধের বাইরে এ জায়গাটা যেন শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। ওখানকার তীব্র কোলাহল এখান পর্যন্ত এসে পৌঁছচ্ছে না। পোষাক-আসাকে নিখুঁত আধুনিক এখানকার বাইরের রূপ চমৎকার। কিন্তু এমন জায়গায় বিদ্যায়তনের ধরণ যা হওয়া উচিত ছিল সে তো হয়ই নি, সংখ্যাও তার নগণ্য বলতে হবে আর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে গেলে উত্তর বা মধ্য কলকাতার একটা সাধারণ এলাকায় যা আছে, এমন একটা ধনী আর আধুনিক এলাকা সমস্ত বালিগঞ্জে তা' পাওয়া যে যাবে না, এ ঠিক। হয়তো দু'একটা মিলতেও পারে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা' কতোটুকু? কেন এমন হলো এ প্রশ্ন আমি করবো না, শুধু বলবো 'দক্ষিণ কলিকাতা সংসদ পাঠাগারের'র মূল্য এতে ক'রে বহু গুণ বেড়ে গেছে।

অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে রাসবিহারী এভেন্যু চলে গেছে—ছায়া-ঘন বড় রাস্তা। তারি গায়ে দেশপ্রিয় পার্কের পশ্চিম প্রান্তে লাইব্রেরী-গৃহ। সযত্নবর্ধিত চারাগাছের ছায়ায় সম্ভ্রম জাগায় তার নির্বাক গাম্ভীর্য। খোলামেলা পার্কের পরিবেশে লাইব্রেরী একটা অপূর্ব শ্রী পেয়েছে, যেমনটা সচারচর চোখে পড়ে না। ছোট একতলা বাড়ী, প্রয়োজনের তুলনায় খুবই ছোট। একধারে ছোট অল্প পরিসর পাঠাগারে ভদ্রলোকদের পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা, দশজন লোক একসঙ্গে সেখানে ঢুকলে রীতিমতো ভীড় জমে উঠবে, হবে স্থানাভাব। সামনের দিকে কাউন্টার, বাঁ দিকে কাউন্টারের কাঠ সামনের দিকে লম্বালম্বি টেবিলের আকারে বাড়ানো। তারি সামনে কয়েকখানা চেয়ারে মহিলাদের বসবার জায়গা, হয়তো পত্র-পত্রিকা পাঠেরও। এমন সঙ্কীর্ণ এ-জায়গাটুকু যে, এখানে বসে পড়ার কথা ভাবাই যায় না, আরাম ক'রে বসবার কথাও নয়। যে কেহ এখানে বসে হাঁপিয়ে উঠবে দশ মিনিটেই। সর্বত্র সুস্পষ্ট এই স্থানাভাবের ভেতর লাইব্রেরীর কাজ চলছে অতি পরিচ্ছন্ন সুন্দরভাবে। শব্দ নেই, অভিযোগ নেই অসুবিধের—সভ্যেরাও যেন মেনে নিয়েছে এটাকে অবশ্যম্ভাবী ব'লে। সর্বত্র বিরাজ করছে নিস্তেজ এক পবিত্রতা, লাইব্রেরীর সব কাজ এরি স্পর্শ লেগে হয়ে উঠছে মধুময়, দেখলে মন খুশী হয়ে ওঠে—সুন্দর!

দক্ষিণ কলিকাতা সংসদ—লাইব্রেরী আর ক্লাব, সাধারণ গ্রন্থাগার আর ব্যায়ামাগার একই সঙ্গে গড়ে ওঠে। উদ্দেশ্য মহৎ, পড়াশোনা আর খেলাধূলো, দেহ-মনের পরিপুষ্টির সমন্বয় সাধন। ১৯৩০ সালে 'দক্ষিণ কলিকাতা সংসদ পাঠাগার' স্থাপিত হয়। এর প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন হর্ষনাথ মুখোপাধ্যায়, জে সি দাস, জে সি মুখার্জী, অমিয় বসু, অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। পাঠাগার প্রথম ১৩৪ নং রাসবিহারী এভেন্যুর বাড়ীতে আরম্ভ হয় ও এর প্রথম সম্পাদক হন অমিয়নাথ বসু। সভ্যগণের চেষ্টায় লাইব্রেরীর দ্রুত উন্নতি হ'তে থাকে ও ১৯৩৪ সালে লাইব্রেরী যতীন দাস রোডে স্থানান্তরিত হয়। সেখান থেকে লাইব্রেরী ১৯৩৬ সালে আসে দেশপ্রিয় পার্ক রোডে। ইতিমধ্যে লাইব্রেরী কর্পোরেশন থেকে অর্থ-সাহায্য পেতে থাকে। তা' ছাড়া লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহের অভাব অনুভূত

হ'তে থাকে একেবারে গোড়ার দিক থেকেই। ক্লাবের সভ্যদের চেষ্টায় লাই-ব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয় দেশপ্রিয় পার্কে আর ১৯৪২ সালে লাইব্রেরী তার বর্তমান নিজস্ব গৃহে চলে আসে। লাইব্রেরীর ইতিহাসে ভূতপূর্ব সম্পাদক অমিয়নাথ বসু ও বিশ্বনাথ সেনের সেবা ও পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'দক্ষিণ কলিকতা সংসদ পাঠাগার'কে অনেকেই বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। তার ভেতর সুকুমার ঘোষ ৮০০ ইংরেজী মূল্যবান বই-এর সংগ্রহ ও একটি বড় আলমারি পাঠাগারে দান করেছেন আর অরুণেন্দ্রনাথ বসু তাঁর মায়ের স্মৃতি-রক্ষার্থে দিয়েছেন অনেকগুলো দামী দামী বই।

ক্লাব আজও পাঠাগারের পাশাপাশি চলছে। বই লেন-দেন ছাড়া লাই-ব্রেরীর কার্যকলাপের ভেতর প্রথম থেকেই চলে আসছে সাহিত্য আলোচনা-সভার অধিবেশন। এই আলোচনা-অধিবেশনের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে বাইরের সাহিত্যিকরা আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। এটা শুধু সভ্যদের ঘরোয়া আলোচনা সভা নয়, এতে সকলেই যোগ দিতে পারেন। এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দের জন্মোৎসব পাঠাগারে আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এগুলোকে পাঠাগারের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানও বলা যেতে পারে। ১৯৪৫ ও ১৯৫০ সালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে। ১৯৪৫ সালের উৎসবে পৌরোহিত্য করেন কিরণশঙ্কর রায়। এ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন দেব, রাধারাণী দেবী, যতীন বাগচী প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ।

'দক্ষিণ কলিকাতা সংসদ পাঠাগারে'র কর্ম্মপরিষদ ছয়জন সদস্যের দ্বারা গঠিত। মিঃ জে সি মুখার্জী বর্তমানে পাঠাগারের সভাপতি। শ্রীরথীন সেন বর্তমানের সম্পাদক, আর পাঠাগারের বর্তমান লাইব্রেরীয়ান হলেন শ্রীভোলা-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তকসংখ্যা ১১০০০ আর বর্তমান সভ্যসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। বই-এর ভেতর ৮০০০ খানা বাংলা আর বাকী তিন হাজার ইংরেজী। পাঠাগারে বর্তমানে ৮ খানা সাময়িক পত্রিকা ও চারখানা দৈনিক রাখা হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণীর সভ্যেরা একসঙ্গে দুই খানা বই নিতে পারেন

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যেরা নিতে পারেন মাত্র একখানা। তাঁদের চাঁদা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী হিসাবে এক টাকা আট আনা, আর জমা আট টাকা ও পাঁচ টাকা।

প্রয়োজনের তুলনায় 'দক্ষিণ কলিকাতা সংসদ পাঠাগারে'র কর্মপন্থা আরো ব্যাপক হওয়া উচিত। অবশ্য অল্প দিনের ভেতর লাইব্রেরীর যতটুকু উন্নতি হয়েছে, সে একেবারে কম নয়। তবু কি হ'তে পারতো, আর কেন হ'ল না, এটা ভাববার বিষয় বলেই মনে হয়।

[২৯-৬-৫২]

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

'ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট' আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয় ১৯৩২ সালের ১৬ই জুলাই। চার বছর পরে ১৯৬৬ সালের ৯ই এপ্রিল ইনষ্টিটিউটের প্রথম সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। চার বছরে ইনষ্টিটিউট উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে চলেছে। সেই অধিবেশনে সমবেত বিদ্বন্মণ্ডলীর সামনে ইনষ্টিটিউটের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখার্জীর ভাষণের অংশবিশেষ তুলে দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

"...উত্তরাধিকারসূত্রে অতীত ভারতের যে বিশাল সাংস্কৃতিক সম্পদ আমরা পেয়েছি সে বিষয়ে আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সমাজের অমনোযোগিতার কারণ, যে ভাষায় তা লিপিবদ্ধ সে ভাষার দুরধিগম্যতা। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে, একথায় প্রাচ্য বিদ্যাকে ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে গবেষণামূলক ব্যাখ্যার ভেতর দিয়ে প্রচারের উদ্দেশ্যে ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা। সেজন্যে বিশেষ ক'রে চৌদ্দটি কি তারও বেশী বিষয়ে সেগুলোকে ভাগ করা হয়েছে।...আমাদের মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা হয়, প্রাচ্য-বিদ্যা ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্যে এসিয়াটিক সোসাইটি ও আরো আরো প্রতিষ্ঠান যখন বর্তমান রয়েছে তখন আরেকটা প্রতিষ্ঠান বাড়িয়ে লাভ কি ? তার উত্তরে আমরা বলবো, প্রথমতঃ আমাদের উদ্দেশ্যে পার্থক্য রয়েছে, আর দ্বিতীয়তঃ এমন বিরাট সাংস্কৃতিক সম্পদের আমরা উত্তরাধিকারী যে, তার অল্প একটুখানির মাত্র আবরণ খুলে ধরতে এমন আরো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের দরকার। এখনো সেটার আবিষ্কারের এতো বাকী রয়েছে যে, বর্তমানেই অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের গড়ে ওঠা প্রয়োজন।...অতীত ভারতের গৌরবময় ঐশ্বর্যরাশিকে আবিষ্কার ও প্রচারের জন্যে বর্তমানকে বুঝতে আর গৌরবোজ্জ্বল ও সৃজনধর্মী ভবিষ্যৎ ভারতকে গড়ে তুলতে এর প্রয়োজন। সুদূরপ্রসারী শিক্ষার ভিত্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সত্যিকারের বোঝাপড়া হওয়া চাই। একমাত্র ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার

যোগসাধনেই বিশ্বসমস্যার সমাধান সম্ভব।”

সর্বসাধারণের কাছে অতীত ভারতের সম্পদরাশিকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে তুলে ধরতেই 'ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে'র প্রতিষ্ঠা। এর উপায় নির্ধারণের জন্যে ইনষ্টিটিউটের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র শীল ১৯৩২ সালের ৩রা জুন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় তাঁর দেওয়া কর্মসূচী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় এইটি স্থির করা হল —সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পণ্ডিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আর ভারতে যাদের ধর্মশাস্ত্র রয়েছে সেই সব ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে ইনষ্টিটিউটের কর্মপরিষদ গঠিত হবে। সেই মতে অনেকগুলো নাম ঠিক ক'রে তাঁদের সঙ্গে দেখা করা হলো আর ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট কর্মপরিষদে প্রতিনিধি পাঠাতে অনুরোধ করে পত্র দেওয়া হলো। সাড়া পাওয়া গেল সকলের কাছ থেকেই প্রস্তাবের অনুকূলে আর সহযোগিতা করতে সকলেই রাজী হলেন। আনুষ্ঠানিক-ভাবে 'ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে'র প্রথম সাধারণ সভার অধিবেশন হলো ১৯৩২ সালের ১৬ই জুলাই অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় আশুতোষ বিল্ডিংস-এর (কলকাতা ইউনিভার্সিটি) কমিটি-রুমে। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের প্রস্তাবে আর শ্রীসতীশচন্দ্র শীলের অনুমোদনে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। সেই সভায় সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, মাননীয় মন্মথনাথ মুখার্জী, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, সার হরিশঙ্কর পাল, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ ও বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সর্বমোট ত্রিশ জনকে নিয়ে ইনষ্টিটিউটের কর্মপরিষদ গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে ইনষ্টিউটের কার্যকলাপ প্রথম আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে চলতে থাকে। ১৯৩৪ সালে ইনষ্টিটিউট উঠে আসে বর্তমান ঠিকানায় ১৭০, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ীতে।

সংক্ষেপে 'ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে'র উদ্দেশ্য হলো (১) প্রাচীন ভারতের প্রধান প্রধান সাহিত্য, স্মৃতিচিহ্ন আর পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক দলিলপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, (২) মৌলিক গ্রন্থাদির প্রকাশ ও দেশীয় ভাষায় প্রচার, (৩) বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রাচ্য বিদ্যার গবেষণার জন্য পণ্ডিত নিয়োগ, (৪) প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও জ্ঞানকে জনসাধারণের নিকট দেশীয় ভাষায় বক্তৃতা ও সাময়িক

পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার, (৫) বর্তমান বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন 'গুরু-কুলে'র ধারায় বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা, (৬) প্রাচ্য বিদ্যা বিষয়ক লাইব্রেরী স্থাপন। 'ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে'র বহুমুখী কর্মধারার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এখানে অসম্ভব, তবে এটুকু বলা চলে, তা' উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। •

'ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে'র নিজের প্রেস রয়েছে। এর গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে—(১) ইনষ্টিটিউটের প্রকাশিত বই, (২) ভারতী মহাবিদ্যালয়ের প্রকাশিত বই। ইনষ্টিটিউট থেকে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ দেশীয় ভাষাসমূহের ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষভাবে এগুলোকে (১) বৈদেশিক গ্রন্থমালা, (২) কোষ গ্রন্থমালা, (৩) শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব গ্রন্থমালা, (৪) ইতিহাস গ্রন্থমালা, (৫) ভাষাতত্ত্ব গ্রন্থমালা, (৬) প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা, (৭) জীবনীগ্রন্থমালা, (৮) বৌদ্ধগ্রন্থমালা—এই আটটি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ইনষ্টিটিউটের প্রকাশিত ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী ব্যাখ্যা সহ ঋগ্বেদ সংহিতা ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত যজ্ঞীয় মহাকোষ বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। বাংলা পত্রিকা সংস্কারে ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়। এ ছাড়া এখান থেকে ইণ্ডিয়ান কালচার (ইংরেজী) প্রাচীন ভারত (হিন্দী) ও শ্রীভারতী (বাংলা) নামক তিনখানি মাসিক পত্রিকা ইনষ্টিটিউটের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিদ্যায়তন হিসাবে ইনষ্টিটিউট কর্তৃক 'ভারতী মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটিটে'র পৃষ্ঠপোষকদের এককালীন পাঁচশত টাকা বা তার বেশী ইনষ্টিটিউটে দান করতে হয়। পৃষ্ঠপোষকেরা ইনষ্টিটিউটে প্রকাশিত পুস্তকাবলী ও পত্রিকা বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন। ইনষ্টিটিউটের আজীবন সদস্যদের চাঁদা ১০০৲ টাকা। গবেষকদের (রিসার্চ ষ্টুডেন্টস) আর সাধারণ সদস্যদের বৎসর ১২৲ টাকা করে চাঁদা দিতে হয়। ওঁরা লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পারেন ও বিনামূল্যে পত্রিকা পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া ইনষ্টিটিউটের গবেষণা উপসমিতি গবেষণাকার্যে গবেষকদেরকে সাহায্য করেন। গবেষণালব্ধ তথ্য ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকাশ করার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য গবেষকদের এর জন্যে যথাযথ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

'ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে'র লাইব্রেরী প্রাচ্য বিদ্যা সম্বন্ধীয় মূল্যবান পুস্তক ও দলিলপত্রে সমৃদ্ধ। বিশেষভাবে এটাকে গবেষণা গ্রন্থাগার বলা যেতে পারে। প্রাচ্য বিদ্যা, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য, বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা এখানে রয়েছে। এই লাইব্রেরীর মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ পুস্তকের সংখ্যা বর্তমানে দশ হাজার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য পত্রিকা এখানে এসে থাকে। লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানের সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে ও ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। এরকমের উদ্যম সত্যি প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য।

'ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে'র বর্তমান সভাপতি সার এস রাধাকৃষ্ণণ আর সম্পাদক শ্রীচন্দ্রচন্দ্র শীল এম-এ, বি-এল।

[৫-১০-৫২]

শম্ভুনাথ স্মৃতি-গ্রন্থাগার

'শম্ভুনাথ স্মৃতি-গ্রন্থাগারে'র একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় ১৯৪২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে। লাইব্রেরী সুদূর বৌবাজার এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ১১এ, মোহনবাগান লেনে আসে আর বর্তমানেও সেখানেই আছে। লাইব্রেরী ৬নং হলধর বর্ধন লেনে প্রথম আরম্ভ হয়, লাইব্রেরী গোড়ার দিকে খুব ভালোভাবে চলেনি। এছাড়া ওখানে বইপত্র চুরি হ'তে থাকাও লাইব্রেরী বর্তমান ঠিকানায় স্থানান্তরের অন্যতম কারণ বলে জানা যায়।

এ লাইব্রেরী স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব আনয়ন করেন অনিলকুমার বিশ্বাস। তাঁর সে প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠে মথুরা সেন, লালচাঁদ সেন, গোরাচাঁদ সেন, গোপালচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ সেনের আন্তরিক চেষ্টায় আর বৃন্দাবন সেনের অর্থসাহায্যে। লাইব্রেরী আরম্ভ হবার পর শম্ভুনাথ সেনের স্মৃতি-রক্ষার্থে প্রথম এ লাইব্রেরীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'শম্ভুনাথ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী'। শম্ভুনাথ সেন ছিলেন আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই প্রিয়। তিনি শুধু দাতাই ছিলেন না, বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন।

'শম্ভুনাথ স্মৃতি-গ্রন্থাগার' মাত্র ৩৬ খানি বই আর দশ জন সভ্য নিয়ে প্রথম আরম্ভ হয়। অতি সামান্যভাবে আরম্ভ হয়ে ধীরে ধীরে গ্রন্থাগারের উন্নতি হতে থাকে।

১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। লাইব্রেরীর উন্নতির জন্যে তাঁর চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৃত্যুর পর জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় লাইব্রেরীর সভাপতি হন। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর ছিল অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাঁর অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এছাড়া লাইব্রেরীর উন্নতির জন্যে নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন লালচাঁদ সেন, পিয়ারীলাল দাস প্রভৃতি অনেকেই। তাঁদের নিঃস্বার্থ সেবায় সত্যি সত্যি লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। লাইব্রেরীর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে সঙ্কীর্ণ লাইব্রেরী গৃহে স্থান সঙ্কুলান হ'ত না। এরূপ

অনুষ্ঠানে আশুতোষচন্দ্র চন্দ্র তাঁর ২নং হলধর বর্ধন লেনের বাড়ীর বৃহৎ দালানটি লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষকে ব্যবহার করতে দিতেন।

একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচয় তার বিভিন্নমুখী কর্মপ্রবাহে। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য শুধু বই লেন-দেনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়, জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই হ'ল এর কাজ। এদিক দিয়ে 'শম্ভুনাথ স্মৃতি-গ্রন্থাগারে'র কাজ প্রশংসার যোগ্য নিঃসন্দেহে। জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে এর কার্যকলাপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এর সাহিত্য ও কলা বিভাগ, নাট্যাভিনয় বিভাগ, পাঠচক্র, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, আল্পনা প্রতিযোগিতা, 'গ্রন্থী' নামক হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে লাইব্রেরী ঘনিষ্ঠ যেগোযোগ রেখে চলেছে সভ্য, পাঠক আর জনসাধারণের সঙ্গে। কিশোর, বালক ও বালিকা এই তিন বিভাগে লাইব্রেরীর তরফ থেকে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে দেওয়া হয় শম্ভুনাথ স্মৃতি-পাত্র (চ্যালেঞ্জ কাপ) আর প্রত্যেক বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে উপহার দেওয়া হয় শম্ভুনাথ স্মৃতি-পদক। আল্পনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে মহিলাদের জন্যে। তাতে যে কোন মহিলা যোগ দিতে পারেন আর শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে স্মৃতি-পদক উপহার দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব উপলক্ষে সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে লাইব্রেরীর নাট্যাভিনয় বিভাগ কর্তৃক নাটক অভিনীত হয়ে থাকে। এ ছাড়া সরস্বতী পূজা, নেতাজী জন্মোৎসব, রবীন্দ্র-জয়ন্তী প্রভৃতি উৎসব লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আড়ম্বরের সহিত।

লাইব্রেরীতে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান সাহিত্য ও কলা বিভাগের বিশেষত্ব। এই সমস্ত সম্মেলনে পৌরোহিত্য করে গেছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশচীন সেনগুপ্ত, শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ প্রভৃতি খ্যাতিমান ব্যক্তিরা। কলা বিভাগের বর্তমান সম্পাদক শ্রীজীমুতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীসৌরীন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় 'গ্রন্থী' নামক মাসিক পত্রিকা বিশেষভাবে লাইব্রেরীর সভ্যসভ্যাদের ভাবধারার বাহকতা করে চলেছে।

বহু মনীষীর হস্তাক্ষর ও চিঠি রক্ষিত রয়েছে এ গ্রন্থাগারে, তাঁদের ভেতর

ই বি কাউয়েল, মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কবি রাম শর্মা, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব, রাজা ললিতমোহন সিংহ রায় প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে হস্তাক্ষর ও চিঠি বর্তমানেও সংগ্রহ করা হচ্ছে।

'শম্ভুনাথ স্মৃতি-গ্রন্থাগারে' শিশুপাঠ্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক সংখ্যা পাঁচ হাজারের মতো হবে। রেফারেন্সের বই-এর ভেতর (১) এনসাইক্লোপিডিয়া রিলিজিওন এণ্ড এথিকস্ ১২ খণ্ড, (২) পপুলার এনসাইক্লোপিডিয়া ৪ খণ্ড, (৩) বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ২ খণ্ড, (৪) লোকনাথ ঘোষের প্রিন্সেস, কিংস্ এণ্ড রাজাজ, (৫) তান্ত্রিক টেকষ্টস (সংস্কৃত ইংরেজী টীকা সমেত) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

'শম্ভুনাথ স্মৃতি-গ্রন্থাগারে'র বর্তমান সভাপতি ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সেন, বর্তমান সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ লাহা আর শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বসু হলেন বর্তমানে লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান।

এই গ্রন্থাগারে অর্কেষ্ট্রা বিভাগ রয়েছে। প্রতি রবিবারে অর্কেষ্ট্রা বিভাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

[১২-১০-৫২]

শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী

'শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী' হাওড়ার অতি প্রাচীন সমৃদ্ধ লাইব্রেরী। হাওড়ার সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে এই লাইব্রেরীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। গত চুয়াত্তর বৎসর ধরে হাওড়ার সাংস্কৃতিক জীবনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে চলেছে শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী।

লাইব্রেরীর গোড়ার দিকের ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ আজ আর পাবার কোন উপায় নেই। সম্ভবতঃ আর দশটা প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের মতোই সে ইতি-হাসের বেশীর ভাগ হারিয়ে গেছে। ৮৮৩৭ সালে কর্মপরিষদে গৃহীত লাইব্রেরীর কার্য-বিবরণীতে (১৯৩০-১৯৩৬-৩৭) 'শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী'র গোড়ার দিকের যে ইতিহাস দেওয়া হয়েছে সেটা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি তাতে অসঙ্গতিও রয়েছে বিস্তর। তার থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় সেই তথ্যের ভিত্তির উপর 'শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী'র গোড়ার দিকের ইতিহাস মোটামুটি এইরূপ দাঁড়ায়। সে ১৮৭৮ সালের কথা। কাঙ্গালীচরণ হালদারের ছিল শিক্ষার প্রতি প্রবল অনুরাগ। শিবপুর ও হাওড়ার জনসাধারণের ভেতর শিক্ষার প্রসার ও পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে হালদারপাড়া লেনের (শিবপুর) নিজ বাড়ীতে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন এক সংবাদপত্রের পাঠ-কেন্দ্র। সেখানে নিজ ব্যয়ে কয়েকখানা দৈনিক খবরের কাগজ কিনে এক টেবিলের উপর রাখলেন; দরিদ্র জনসাধারণ যাতে বিনা পয়সায় খবরের কাগজ পড়তে পারে, ব্যবস্থা করলেন তার। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এতে করে একদিক দিয়ে লোকের পাঠস্পৃহা যেমন বাড়তে থাকবে, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষার প্রসারও হতে থাকবে এরি মারফৎ। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল, দ্রুত বেড়ে চললো পাঠকের সংখ্যা, বাড়ীতে আর স্থান সঙ্কুলান হয় না। আরো বেশী লোক যাতে কাগজ পড়বার সুবিধা পেতে পারে তারি জন্য সেই পাঠ-কেন্দ্রকে তুলে নিয়ে যাওয়া হ'ল ৩৭নং রাজনারায়ণ চৌধুরী ঘাট রোডের দোতলা বাড়ীতে। কাঙ্গালীবাবুর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন রায়-

বাহাদুর রাজকুমার সেন,—প্রবীণদের সঙ্গে এসে নবীন উদ্যোক্তারাও যোগ দিলেন। পাঠ-কেন্দ্রকে লাইব্রেরীতে পরিণত করবার কথা উঠলো—জনসাধারণ বাড়ীতে বই নিয়ে পড়বার সুবিধে পাবে তাতে করে। কিন্তু গোড়াতেই যুবক কর্মীদের ভেতর মতানৈক্যের ফলে সম্ভাবনা দেখা দিল দু'টো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবার। দু'দলে মিলিত হলেন রায় বাহাদুর রাজকুমার সেনের চেষ্টায় আর তারি ফলে গড়ে উঠলো 'শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী' ১৮৭৯ সালের মার্চ মাসে। এক বছর যেতে না যেতেই সংবাদপত্রের পাঠ-কেন্দ্র রূপান্তরিত হ'ল পাবলিক লাইব্রেরীতে। বইপত্র সংগ্রহ করা হ'ল লাইব্রেরীর কাজ চলতে লাগলো।

১৮৮৬ সালে মতানৈক্যের ফলে লাইব্রেরীর অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়, চার বছর ধরে লাইব্রেরীতে চলতে থাকে একটা বিশ্রী অব্যবস্থা। লাইব্রেরীর বহু বইপত্র খোয়া যায় এসময়। মেসার্স জন কিং এণ্ড কোম্পানী, মেসার্স আন্‌স্তেসেন এণ্ড কোম্পানী, মিঃ জন ষ্টেইন ও বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক—এই চারজন সদস্যের অর্থ সাহায্যের ফলেই এ সময়ে লাইব্রেরীর পক্ষে কোন রকমে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৯০ সালে স্থানীয় ইয়ংমেনস য়ুনিয়নের একদল যুবককর্মী লাইব্রেরী পুনর্গঠনের কাজে এগিয়ে আসেন ও ১৯শে অক্টোবরের লাইব্রেরী-গৃহে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় রায় বাহাদুর রাজকুমার সেনকে সভাপতি ও অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে এক অস্থায়ী কমিটী গঠিত করেন। তারপর ৩০শে নভেম্বরের সভায় শ্রীহরি চক্রবর্তীকে সভাপতি করে আর অঘোর বাবুকেই সম্পাদক রেখে স্থায়ী কমিটী গঠিত হয়। তাঁদের চেষ্টায় লাইব্রেরী আবার চালু হয় ও দ্রুত লাইব্রেরীর উন্নতি হতে থাকে। দেখতে দেখতে লাইব্রেরীর অর্থনৈতিক বনেদও দৃঢ় হয়ে উঠে। ১৮৯৮-৯৯ সালে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর পাকা বাড়ী কিনে 'শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী' সেই বাড়ীতে উঠে যায়। ১৯১৫-১৬ সালের কর্মপরিষদ সে বাড়ী বিক্রী করে দিয়ে বর্তমানে লাইব্রেরী যেখানে অবস্থিত, সেখানে ২৫ কাঠা জমির এক প্লট লাইব্রেরীর নিজস্ব নূতন বাড়ী তৈরীর জন্য খরিদ করে নেন। সেই জমির ওপর লাইব্রেরীর গৃহ-নির্মাণ কার্য ১৯১৬-১৭ সালে আরম্ভ হয়। আর ১৯১৮-১৯ সালে লাইব্রেরীর দোতলা বাড়ীর নির্মাণকার্য শেষ হলে লাইব্রেরী নূতন বাড়ীতে উঠে আসে।

এই গৃহ-নির্মাণ কার্য সম্ভব হয়েছিল জনসাধারণের অকুণ্ঠ বদান্যতায়। এ প্রসঙ্গে বিনোদবিহারী হালদারের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনিই প্রথম গৃহ-নির্মাণ তহবিলে ২০০৲ দান করেন ও ক্রমে সেই তহবিলে ৩০০০৲ দেন। এর থেকে ৬০০৲ আলাদা করে বের করে নিয়েই তিনিই প্রথম গোড়াপত্তন করেন লাইব্রেরীর পরিসর হলঘর নির্মাণ তহবিলের। ১৯২১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর সাতজন ন্যাসরক্ষকের অনুকূলে শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীর অছিপত্রে রেজিষ্টারী করা হয়।

লাইব্রেরীর গৃহ-নির্মাণকার্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালকবর্গ সুপ্রশস্ত হল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র বই লেন-দেনের ভেতরেই লাইব্রেরীর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, সেটাকে প্রসারিত করে দিতে হবে আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে, জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষায়, উৎসবে আনন্দে, নৃত্যে গীতে আর সভা-সমিতিতে। সেজন্য সুপরিসর একটি হল থাকা চাই, নইলে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, ব্যর্থ হবে। হলঘর নির্মাণের জন্যে ১০০০৲ দিলেন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি আর বাকী টাকা পাওয়া গেল জনসাধারণের কাছ থেকে, খরচ হ'ল দশ হাজার টাকার ওপর, আর ১৯৩০ সালের ৯ই মার্চ হলঘরের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হল হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বরদাপ্রসন্ন পাইনের পৌরোহিত্যে। অভিনয়াদির জন্যে হলঘরের দক্ষিণ প্রান্তে ষ্টেজ নির্মাণের সমস্ত খরচ বহন করলেন হরিদাস মিত্র ও তাঁর পুত্র লোকনাথ মিত্র। ১৯৩৪-৩৫ সালে সে কাজ সম্পূর্ণ হ'ল। ১৯৩৯-৪০-এর কার্যবিবরণীতে দেখা যায় ছাদ ফুটো হয়ে হলঘর ব্যবহার বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। দেখা গেল, ছাদ সারাতে ১৩০০০৲ টাকার ওপর খরচ পড়ে (১৯৪৭)। জনসাধারণের কাছে সাহায্য চাওয়া হ'ল। ১৯৪৯ সালে শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ হলঘর মেরামতের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হলেন। তাঁর পিতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে সদ্য নির্মিত হলঘরের নামকরণ করা হয়েছে "ননীভূষণ সিংহ মেমোরিয়াল হল"।

শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীর সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে জনসাধারণের মুক্তহস্ত বদান্যতা। এর পুস্তক ও পত্রিকা ক্রয় তহবিলের সৃষ্টি হয়েছে ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্তের

১০,০০০৲ টাকার দানে, এ টাকার সুদ থেকে বছর বছর পুস্তক ও পত্রিকা ক্রয় করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে তুলসীচরণ মিত্র ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাইব্রেরীর জন্যে আজীবন নিঃস্বার্থ সেবার কথাও উল্লেখ করতে হয়। ১৯১৫-১৬ থেকে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি লাইব্রেরীকে নিয়মিত অর্থসাহায্য করে আসছেন বর্তমানে সে সাহায্যের পরিমাণ মাসিক ৫৫৲ টাকা করে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারও ১২০০৲ টাকার পুস্তক লাইব্রেরীতে দান করেছেন এবছর।

লাইব্রেরীর কিশোর বিভাগের কার্যকলাপ সত্যি প্রসংসার যোগ্য আর কিশোরদের দ্বারাই এ বিভাগ পরিচালিত হয়ে থাকে ১৯২৮ সালে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি কিশোর ও লাইব্রেরীর সহকারী সম্পাদক গোষ্টবিহারী চট্টোপাধ্যায় এ বিভাগের গোড়াপত্তন করেন আর তাঁদের সাহায্য করে বিশ্বনাথ মোদক ও মোদন দাস প্রভৃতি ছেলেরা। স্কুলের ছাত্র পর্যন্ত কিশোরদের নিয়েই এ বিভাগের কর্মপরিষদ গঠিত, শুধু লাইব্রেরীর সাধারণ বিভাগের সহকারী সম্পাদক এর সভাপতি হয়ে থাকেন। কিশোর সভ্যদের কোন চাঁদা নেই, মাত্র এক টাকা তাদের জমা রাখতে হয়। বর্তমানে এ বিভাগের সভ্যসংখ্যা ৩০৩ ও পুস্তক-সংখ্যা ১১৮৮। রামধনু, পাঠশালা, শুকতারা, শিশুসাথী ও মৌচাক—এই পাঁচখানি কিশোর পত্রিকা এ বিভাগে রাখা হয়ে থাকে। কিশোর সভ্যদের দ্বারা পরিচালিত হাতেলেখা বার্ষিকী "কৈশোরকে"র অঙ্গসজ্জা সত্যি সুন্দর। এ বিভাগের দ্বারা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীর কার্যকলাপের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। লাইব্রেরীর পাঠাগারে সমস্ত পত্র-পত্রিকা জনসাধারণের জন্য রাখা হয়ে থাকে। গত ৪০ বছরে পাঠাগারে পত্র-পত্রিকা পড়তে পদার্পণ করেছেন ৪,২৪০০০ সদস্য। বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে এ লাইব্রেরীতে। এছাড়া লাইব্রেরীর ব্যায়ামগারে সুবন্দোবস্ত আছে ব্যায়াম করবার। জনসাধারণের দ্বারা ও লাইব্রেরীর দ্বারা সভাসমিতি ও সঙ্গীত, অভিনয়াদির আয়োজন করা হয়ে থাকে লাইব্রেরীর হলঘরে। এ প্রসঙ্গে মনীষীদের দ্বারা লাইব্রেরীতে বক্তৃতার ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনীষীদের ভেতর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, শীলভদ্র যাজী, অধ্যাপক নির্মল বসু, ডাঃ সতীশ দাসগুপ্ত, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, ডাঃ হরিদাস চৌধুরী

প্রভৃতি এ লাইব্রেরীতে এসেছেন। সাহিত্য সভার আয়োজন ছাড়া বিজয়া সম্মিলনী, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, শরৎ-জন্মোৎসব প্রভৃতির এ লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লাইব্রেরীর ষ্টেজে মঞ্চস্থ হয়েছে বহু নাটক, উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে লাইব্রেরীতে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল আর তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৪ মাস ধরে।

বর্তমানে লাইব্রেরীর মোট পুস্তক-সংখ্যা ১৭,৯৬০ ও মোট সদস্য সংখ্যা ৭৯০। সদস্যগণ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণী হিসাবে সদস্যদের মাসিক চাঁদার হার যথাক্রমে দেড়টাকা, বার আনা ও ছয় আনা। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমা ১০৲ ও তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের জমা রাখতে হয় পাঁচ টাকা মাত্র। বহু প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দলিলপত্র রয়েছে এ লাইব্রেরীতে। এ ছাড়া বহু রেফারেন্সের বইও লাইব্রেরীতে আছে। এসবের ভেতর (১) হিষ্টরিয়ান্স হিষ্টরী অব দি ওয়ার্লড ৪৮ খণ্ড, (২) নেলসনস্ এনসাইক্লোপিডিয়া ২২ খণ্ড সম্পূর্ণ, (৩) ওস্কার ব্রাউনিং-এর হিষ্টরী অব দি মডার্ণ ওয়ার্লড ২ খণ্ড, (৪) ফ্লোরা এণ্ড ফোনা অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া ২৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ (৫) এনুয়েল রিপোর্ট অব জিওলজিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ১৮৯০-১৯০৫ ও (৬) ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারস অব বেঙ্গল ২৮ খণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ সংগ্রহের দিক দিয়ে 'শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী' সত্যি সমৃদ্ধ।

'শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীর' বর্তমান সভাপতি অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহরগোবিন্দ রায় লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান।

[২-১২-৫২]

বালি সাধারণ গ্রন্থাগার

১৮৯৪ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত 'বালি সাধারণ গ্রন্থাগার' পরিদর্শন করতে যান। "ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন" নাম ছিল তখন গ্রন্থাগারের। গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন তিনি—সে সময়ে এ ধরণের প্রচেষ্টায় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই আনন্দ প্রকাশ করবার কথা। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যে সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, আর কোন কিছুতেই সেটা হয় না। সেই সময়ে গ্রন্থাগারের শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষক শান্তিরামবাবু (রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) রমেশচন্দ্রকে বলেছিলেন, "মহাশয় লাইব্রেরীটি আমাদের ছেলেদের সৃষ্টি, উপস্থিত খুবই ছোট কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই লাইব্রেরী বালির (হাওড়া) গৌরবের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।" সত্যি সত্যিই তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হয়েছে। শান্তিরামবাবু আর বীরেশ্বরবাবুর স্নেহপুষ্ট এ লাইব্রেরী সত্যই আজ বালির অধিবাসীবৃন্দের গৌরবের সামগ্রী।

সমারোহের সহিত বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়েছে ১৯৩৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। ১৮৮৩ সালে পাড়ার যুবকদের চেষ্টায় গোস্বামী পাড়ায় হরিধন গোস্বামীর বাড়ীতে একটি ছোট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় আর ঠিক ঐ সময়ে "হোম লাইব্রেরী" নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠানের আরম্ভ হয় পাঠক পাড়ায় নিবারণচন্দ্র পাঠকের বাড়ীতে। হরিধনবাবু আর নিবারণবাবু ছিলেন দুই বন্ধু, কাজেই পাশাপাশি দুটো লাইব্রেরী বেশীদিন চললো না। নিবারণবাবুরা এসে হরিধনবাবুদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৮৮৫ সালে লাই-ব্রেরী দুটো একত্রিত হ'ল আর তার নতুন নামকরণ করা হ'ল "বয়েজ এসোসিয়েশন"। লাইব্রেরীর কাজ হরিধন গোস্বামীর বাড়ীতেই চলতে লাগলো। এটাই হ'ল বালিতে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের গোড়ার কথা। এই গ্রন্থাগার স্থাপনে প্রথম উদ্যোগী ছিলেন হরিধন গোস্বামী, নারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও নিবারণচন্দ্র পাঠক। সেই "বয়েজ এসো-

সিয়েশন"ই পরবর্তীকালে নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়ে 'বালি সাধারণ গ্রন্থাগারে' রূপান্তরিত হয়েছে।

ছাত্রদের ভেতরই লাইব্রেরীর কার্যকলাপ গোড়ার দিকে সীমাবদ্ধ ছিল, দুই আনা চাঁদা দিয়ে কেবলমাত্র ছাত্রেরাই তখন বই পড়তে পেতো। ক্রমে কার্য-কলাপ বাড়তে লাগলো, স্থানাভাব দেখা দিল হরিধনবাবুর বাড়ীতে। অসুবিধার কথা জানানো হ'ল শান্তিরামবাবুর কাছে। শান্তিরামবাবু বীমস চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী ঘরে লাইব্রেরীর জন্য স্থান করে দিলেন। পাড়ার ভেতর থেকে সদর রাস্তায় এসে লাইব্রেরী নাম নিল "ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন" আর তার কর্মধারাও প্রসারিত হ'ল সর্বসাধারণের ভেতর। দু'আনা চাঁদায় তখন সকলেই বই পড়তে পেতেন। ক্রমে সেখানেও স্থানাভাব দেখা দিল। শ্রীচরণবাবু ও শান্তিরামবাবুর চেষ্টায় লাইব্রেরী এবার স্থানান্তরিত হ'ল "রিভার্স টমসন" স্কুল বাড়ীর নবনির্মিত দ্বিতলের উত্তরদিকের ঘরে। স্কুলবাড়ী নির্মাণ শেষ হ'লে "বালি সাধারণী সভার" কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরীকে স্থান দিলেন নীচের তলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণের ঘরে। নিজস্ব বাড়ীতে উঠে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন নামে লাইব্রেরী সেখানেই অবস্থিত ছিল। বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধ ইতিহাস গড়ে উঠেছিল এখানে থেকেই। বালিবাসীদের আন্তরিক সহানুভূতিতেই এই লাইব্রেরীর উন্নতির গোড়ার কথা। দিনের পর দিন সকলের সমবেত কর্মধারা মিলিত হয়ে আজকের এই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। এর ইতিহাস আসলে মিলন আর সমন্বয় সাধনের ইতিহাস।

রাজেন্দ্র শেঠের বাড়ীতে অবস্থিত "ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী" আর গোস্বামী পাড়ার "বয়েজ রিডিং ক্লাব" দু'টো ছোট প্রতিষ্ঠান। ১৯০০-১৯০১ সালে এ দু'টোতে মিল গড়ে উঠলো "ফ্রেণ্ডস রিডিং রুম"। এর উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ শেঠ, সন্তোষকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মুরারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণধন গোস্বামী, তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি। "ফ্রেণ্ডস রিডিং রুম"-এর কাজ চলতে থাকে ডিংসাই পাড়ায় ভগবতী বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বাড়ীতে আর দেখতে দেখতে তা "ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশনে"র তুল্য লাইব্রেরী হয়ে ওঠে। উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ১৯০৪ সালের

৩০শে অক্টোবর "ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন এণ্ড ফ্রেণ্ডস রিডিং রুম" এই নূতন নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠান দুটি একত্র যুক্ত হয়ে যায় আর এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের কাজ চলতে থাকে টমসন স্কুলবাড়ীর নীচের তলায় "ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশনে"র ঘরে। এই যুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সম্পাদক ছিলেন রায়সাহেব মনোমোহন মুখোপাধ্যায় আর হরিধন গোস্বামী ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। এবার অতি দ্রুত উন্নতি হতে থাকে লাইব্রেরীর। ১৯১৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর এক সাধারণ সভায় লাইব্রেরীর নাম রাখা হয় ''বালি পাবলিক লাইব্রেরী"। পরবর্তী-কালে ১৯৩৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সাধারণ সভায় "বালি পাবলিক লাইব্রেরী"র স্থলে "বালি সাধারণ গ্রন্থাগার" এই বর্তমানের নাম গৃহীত হয় আর এই নামেই লাইব্রেরী রেজিষ্টারি করা হয় ১৯৩৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে।

লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ী নির্মাণের কথায় এবার আসা যাক। "ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশনে"র কর্মকর্তারা লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে "পার্লামেন্ট ফাণ্ড" নামে একটি তহবিল খুলে তাতে অর্থ সঞ্চয় আরম্ভ করেন। ''ফ্রেণ্ডস রিডিং রুম'' যুক্ত হওয়ার ছ'সাত বছর পরে লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্মাণের আবহাওয়া আবার সৃষ্ট হ'তে থাকে ও ১৯১২ সালে লাইব্রেরীর "বিল্ডিং ফাণ্ড" বা গৃহ নির্মাণ তহবিল স্থাপিত হয়ে যথারীতি অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ হয়। এই ১৯১২ সালেই বর্তমান লাইব্রেরী ভবন যে জমির ওপর অবস্থিত সেই জমি সংগ্রহ করা হয় "বালি সাধারণী সভা"র সহযোগিতায়। আসলে এ জমি বালি মিউনিসিপ্যালিটি তথা বালি সাধারণী সভার দান। গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি খননকার্য আরম্ভ হয় ১৯১৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। দেখতে দেখতে গ্রন্থাগার ভবনের মাঝের হল ও সম্মুখের বারান্দা গাঁথা হয়ে ছাদ পিটান হয়ে যায়। এরপর গৃহ নির্মাণকার্য আর না এগিয়ে কয়েক বৎসর কাজ বন্ধ থাকে সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষেরই দোষে। অবশেষে ১৯২৩ সালের ১৮ই মে তারিখের অধিবেশনে 'বালি পাবলিক লাইব্রেরী'র পুরাতন কর্মকর্তারা নূতন কার্য-নির্বাহক কমিটির হাতে লাইব্রেরীর সমস্ত ভার দিয়ে নিজেরা অবসর গ্রহণ করেন। এটাকে গৃহ নির্মাণ-পর্বের দ্বিতীয় পর্যায় বলা চলে। গৃহ নির্মাণ তহবিলে রায় সাহেব বৃন্দাবনচন্দ্র সুর ১০০০৲ টাকা, রমা-

প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক হাজার টাকা ও বালি মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ কয়েক দফায় অনেক টাকা দিয়েছেন সত্য, কিন্তু আসলে জনসাধারণের এক, দুই, পাঁচ, দশ, একশ, দু'শো টাকার দানে ও সহানুভূতিতেই লাইব্রেরীর গৃহ নির্মাণকার্য সম্ভব হয়েছে। বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের গৃহ প্রবেশ উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ। গৃহ নির্মাণ ব্যাপারে গোড়ার দিকে সম্পাদক সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় পর্যায়ে লাইব্রেরীর সভাপতি অমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিজস্ব বাড়ীতে আসার পর লাইব্রেরীর কার্যকলাপ বেড়ে চলে—বেড়ে চলে লাইব্রেরীর সভ্যসংখ্যা ও পুস্তকসংখ্যা।

বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালন ভার বরাবরই অবৈতনিক কর্মীদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে। গ্রন্থাগার পরিচালনে প্রতিদিন কয়েকজন ছাত্র ও যুবক সাহায্য করে থাকেন। এই লাইব্রেরীর সদস্যেরা মান্য সদস্য, আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্য, বিদ্যার্থী সদস্য ও সুবিধাভোগী সদস্য—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। সাধারণ সদস্যের মাসিক চাঁদা চারি আনা ও ছাত্র সদস্যের চাঁদা মাসিক দুই আনা। সুবিধাপ্রাপ্ত সদস্যকে চাঁদা দিতে হয় না। কেবলমাত্র তরুণ ছাত্রেরাই এরূপ সদস্য হতে পারেন; অবশ্য এঁদের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী রয়েছে। বর্তমানে লাইব্রেরীর সর্ব মোট সদস্যসংখ্যা পাঁচশত আর পুস্তকসংখ্যা ১২ হাজারেরও বেশী। বিষয়ে বিষয়ে পুস্তকগুলো লাইব্রেরীতে সজ্জিত রয়েছে আর এই লাইব্রেরীর দুষ্প্রাপ্য ও পুরাতন দলিলপত্র ও পুস্তকের সংখ্যাও অনেক। সদস্যদের চাঁদা ও মিউনিসিপ্যালিটির অর্থসাহায্যেরই গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে। ১৯৫১-৫২ সালে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে, আর সরকার থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে ৮০০৲ টাকার পুস্তক ও আসবাবপত্র।

'বালি সাধারণ গ্রন্থাগারে'র বর্তমান কার্যকলাপকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি নিত্যকর্ম, পুস্তক আদান-প্রদান ও শান্তিরাম পাঠ-কেন্দ্র পরিচালন অপরটি এর বিস্তারের দিক, বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ কেন্দ্র, সাহিত্য সভা, জনসভা, ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিমূলক বক্তৃতার আয়োজন, লোকশিক্ষা বক্তৃতামালা, বিমল ("আলি") রচনা প্রতিযোগিতা, অনিল আবৃত্তি

প্রতিযোগিতা, নানারূপ উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির পরিচালনা।

১৮৯৪ সালে লাইব্রেরী দেখতে এসে রমেশচন্দ্র দত্ত লাইব্রেরীতে পাঠাগার খুলবার পরামর্শ দেন ও সেই বৎসরই লাইব্রেরীতে পাঠাগারের ব্যবস্থা করা হয়। সর্বসাধারণ বিনা চাঁদায় পাঠাগারে বসে পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পাঠ করতে পারতেন আর সেজন্যে সব রকমের পত্র-পত্রিকা পাঠাগারে রাখা হত। ১৯১৯ সালের ৪ঠা আগষ্ট শান্তিরাম বাবুর (রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য এই পাঠাগারের নাম রাখা হয় "অবিনাশচন্দ্র ফ্রি রিডিং রুম"। ইহাই বর্তমানে "শান্তিরাম পাঠ কেন্দ্র" নামে পরিচিত। এই পাঠাগারে প্রায় সব কটা পত্র-পত্রিকাই রাখা হয়ে থাকে। পাঠাগার সুসজ্জিত কক্ষে অবস্থিত আর এর পরিচালনা সত্যি দেখবার মতো। জনসভা ও লোক-শিক্ষা বক্তৃতামালা এ লাইব্রেরীর বিশেষত্ব। মনীষীদের দ্বারা বক্তৃতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। লাইব্রেরীতে ১৯১৬ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় "অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এ লাইব্রেরীতেই। একেবারে প্রথম থেকেই বালি সাধারণ গ্রন্থাগারে "সাহিত্য সভা"র অস্তিত্ব রয়েছে। এখানে ছাত্রদের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ক আলাপ-আলোচনার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ গ্রন্থাগারের গৃহ প্রবেশ উৎসব উদ্‌যাপিত হয় বিশেষ সমারোহের সহিত। অনিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও বিমল রচনা প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে প্রতি বৎসর ১৫০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ 'রবীন্দ্র-ভবন' নির্মাণের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন আর সেজন্য "বালি সাধারণী সভা" সাত ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত রবীন্দ্র-ভবন উপনিধিমণ্ডলীর হস্তে ১১ কাঠা জমি রেজেষ্টারী করে দিয়েছেন ১৯৪৯ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে।

লাইব্রেরীর দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ভার রয়েছে কর্মী সঙ্ঘের হস্তে, আদান-প্রদান, পাঠ কেন্দ্রের দেখাশোনা ইত্যাদি লাইব্রেরীর কর্মী সঙ্ঘের সদস্যেরাই করে থাকেন। জন্মাষ্টমীর দিনে সঙ্ঘের জন্মোৎসব পালন করা হয় এঁদেরি উদ্যোগে। এ ছাড়া দোল পূর্ণিমার বসন্তোৎসবে আর বিজয়া সম্মিলনীতে সঙ্গীতাদি উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন এই কর্মী সঙ্ঘই করে থাকেন।

বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের বর্তমান সভাপতি শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীবিজয়ভূষণ গুঁই, গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর শ্রীজয়দেব মুখোপাধ্যায় হলেন এই গ্রন্থাগারের বর্তমানের সাহিত্য-সম্পাদক।

গ্রন্থাগারে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে ১৯৩৯ সালে। সেই থেকে ছাত্রছাত্রীদের পড়াবার আর পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গত ১২ বৎসর এখানকার পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে মোট ১০৪ জন ছাত্রছাত্রী। গ্রন্থাগারের এ উদ্যম সত্যই প্রশংসা করবার মতো।

[১৬-১২-৫২]

বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী

বর্তমানের হাওড়া সহর গড়ে উঠেছে সে বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র বিশ বছর আগেও হাওড়ায় একটিও মেয়েদের স্কুল ছিল না, ছেলেদের স্কুল ছিল মাত্র গুটিকয়। সেই হাওড়া সহরে সত্তর বছর আগে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল, ভাবতে অবাক লাগে। ১৮৮৪ সালের কথা, সেই বৎসর 'বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এক্ট' (পৌরসভা আইন) মাত্র বিধিবদ্ধ হয়েছে, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি তখনো গড়ে উঠেনি, সেই বৎসর হাওড়ার বাঁ্যাটরা পল্লীতে 'বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী'র গোড়াপত্তন করা হয়। বাঁ্যাটরা তখন ছিল এক নগণ্য পল্লী, তার লোকসংখ্যাও ছিল তখন নগণ্য। সেই সময় বাঁ্যাটরায় সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কারণ সম্ভবতঃ নিহিত আছে বাংলা দেশের তখনকার বিপ্লবী আবহাওয়ার ভেতর। তখনকার বাংলা দেশ হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, রামকৃষ্ণ, সুরেন্দ্রনাথের বাংলা,—খুব সম্ভব এঁরাই তখন প্রেরণা যুগিয়েছিলেন হাওড়ার একদল তরুণকে গ্রন্থাগার স্থাপনের ভেতর দিয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ বিপ্লবী কাজের। তারি ফলে 'বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী'কে একটা বিশেষরূপে আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি।

সমারোহের সহিত বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীর তিন দিনব্যাপী 'হীরক জয়ন্তী' উৎসব সম্পন্ন হয়েছে ১৯৪৪ সালের ২৬শে নভেম্বর রবিবার থেকে। প্রথম দিনের উৎসব অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক বিনয় সরকার আর দ্বিতীয় দিন পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছিল তৃতীয় দিনে। জনসাধারণ ও সুধী-বৃন্দের সহযোগিতায় সার্থক হয়ে উঠেছিল জ্ঞানকেন্দ্রে সেদিনের সে উৎসব-সমারোহে।

বর্তমান বেলিলিয়স রোডের পূর্ব নাম ছিল ডোরস রোড। সেই ডোরস রোডে এখন যে বাড়ীতে লয়েডস এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী রয়েছে এই বাড়ীর একটি ঘরে গোটা চার আলমারি ও কিছু বইপত্র নিয়ে ১৮৮৪ সালে 'বাঁ্যাটরা

পাবলিক লাইব্রেরী'র আরম্ভ হয়। স্থানীয় একদল যুবকের চেষ্টায় এ লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছিল জানা যায়; কিন্তু তাদের নাম জানবার আজ আর কোন উপায় নেই। লাইব্রেরীর যে সমস্ত পুরাতন কাগজপত্র পাওয়া যায় সেগুলো ১৮৯৮-৯৯ সালের। এর আগের কোন কাগজপত্র হয় রাখা হয়নি, নয় হারিয়ে গেছে। এই কাগজপত্র থেকে ও লোকের মুখ থেকে এ সময়ের একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। এ সময় লাইব্রেরীর সম্পাদক ছিলেন গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ। তারপর নবকুমার দাস লাইব্রেরীর সম্পাদক হন আর তাঁর সহকর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন বামাপদ শেঠ, বসন্তকুমার দাস, জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যকুমার দাস প্রভৃতি। বামাপদবাবু লাইব্রেরীর জন্যে পুস্তক সংগ্রহ কার্যে বিশেষভাবে উদ্যোগী ছিলেন। অল্প দিনের ভেতরেই লাইব্রেরীতে চুরি হয় ও কর্মীর অভাব দেখা দেয়। ১৯০১—০২ সালে ডোরস রোডের ঘর থেকে লাইব্রেরী উঠে আসে কদমতলা বাজারের উপরের একটি ঘরে। এখানেও বই চুরি যায় ও ক্রমে লাইব্রেরীর কাজ বন্ধ হয়ে আসে। এ সময় গৌরমোহন রায় ও বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে আবার লাইব্রেরীর কাজ চালু করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে আর সম্ভব হয়নি। ১৯০৮ সালে লাইব্রেরী 'ব্যাঁটরা মধুসূধন পাল চৌধুরী বিদ্যালয়ে' স্থানান্তরিত হয় ও বিশেষভাবে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে চলতে থাকে। 'ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী'র ইতিহাস সত্য সত্যই এক বিচিত্র উত্থান-পতনের ইতিহাস।

১৯১৮-১৯ সালে লাইব্রেরীকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করেন নিতাইচরণ রায় প্রমুখ কর্মিগণ। তাঁরা স্কুল থেকে অবশিষ্ট বই ও আলমারি চারিটি নিয়ে এসে ভোলানাথ কবিরাজের বাড়ীতে রাখেন আর এ নিয়ে রীতিমতো আন্দোলন চালাতে শুরু করেন ব্যাঁটরাবাসীদের মধ্যে। এই আন্দোলনের ফলে আবার স্থানীয় তরুণের দল এগিয়ে এলেন। এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরমোহন রায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র সিংহ, কিশোরীবল্লভ দে, প্রমথনাথ মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বলাইচরণ চীনা প্রভৃতি কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। পঞ্চাননতলা রোডের দুইটি স্থানে রাখবার পর লাইব্রেরীর আলমারি ও বই স্থানান্তরিত হ'ল বামাচরণ

কুণ্ডু মহাশয়ের বাড়ীতে। তারপর লাইব্রেরীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত হল এখানেই এক পরামর্শ সভায়। অবশেষে ১৯২০ সালে নরসিংহ দত্ত রোডের উপর শেঠিয়াদের বাড়ীর একটি ঘর ভাড়া নিয়ে আবার লাইব্রেরীর কাজ আরম্ভ হল। এ সময়ে পিয়ারীমোহন দাস, অসিপদ মল্লিক প্রভৃতি লাইব্রেরীকে মূল্যবান পুস্তক দিয়ে সাহায্য করেন আর গণেশচন্দ্র দাস প্রমুখ স্থানীয় অনেকেই করেন অর্থ সাহায্য। লাইব্রেরী আবার চলতে আরম্ভ করলো। কিছু দিন পরে শেঠিয়াদের ঘর থেকে লাইব্রেরী উঠে আসে কালীচরণ কুণ্ডুর বাড়ীতে ও সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসা হয় কদমতলা বাজারের উপরে একটি ঘরে। বর্তমানে ৪নং লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেনে লাইব্রেরী সুষ্ঠুভাবে চলছে।

১৯২০ সালে 'বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী'র পুনর্যাত্রা শুরু হয় মাত্র ৩০০ খানা পুস্তক আর ৮৭ জন সদস্য নিয়ে। এ সময়ে গণেশচন্দ্র দাস ছিলেন লাইব্রেরীর সম্পাদক। ১৯৩১ সালে সম্পাদক কালাচাঁদ শেঠ নিরলস সেবায় নানাভাবে লাইব্রেরীর উন্নতিসাধনে মনোযোগী হন। তাঁরি সময়ে ১৯৩২ সালে বাঁ্যাটরা ইনষ্টিটিউট নামক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরীকে বিনামূল্যে ৩০০ বই দান করেন ও খানকয়েক আসবাব-পত্র বিক্রি করেন মাত্র ১০৲ টাকায়। এই কালাচাঁদবাবুর সময়েই সাহিত্য সভা অনুষ্ঠানের আরম্ভ হয়েছিল, পরবর্তী কালে (১৯৪৩ সাল) এরি সঙ্গে বিতর্ক সভারও আয়োজন করা হয়। এই সাহিত্য সভা উপলক্ষে সময়ে সময়ে কলকাতা থেকে খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও মনীষীরা এই লাইব্রেরীতে এসেছেন। তাঁদের ভেতর বিনয় সরকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিশ্বপতি চৌধুরী, নরেন দেব, রাধারাণী দেবী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

১৯৩৫ সালে হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় 'ছাত্র সম্মিলন লাইব্রেরী' নামক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের বইগুলো পাওয়া যায় ও লাইব্রেরীর বালক-বিভাগ খোলা হয়। বর্তমানে এই বিভাগের সভ্য-সংখ্যা ২৪৯ ও পুস্তক সংখ্যা ১৭৩৩। প্রায় সবক'টা শিশু-সাময়িক পত্রিকাই এই বিভাগে রাখা হয়ে থাকে। বালক সভ্যদের প্রবেশ মূল্য আট আনা ও মাসিক চাঁদা তিন আনা মাত্র। ১৯৩৮ সালে অবনীকুমার মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরীর সম্পাদক হন ও

লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁরই সময়ে ১৯৪১ সালে রঞ্জিতকুমার মল্লিক ও কৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় লাইব্রেরী ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে যথারীতি রেজিষ্টারী করা হয় ও লাইব্রেরী দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। ইতিমধ্যে লাইব্রেরী হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অর্থসাহায্য পেতেও আরম্ভ করে।

কার্য-কলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী'র নিজস্ব ভবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দাস ট্রাষ্টবোর্ডের হাতে ১৫০০০৲ হাজার টাকা দান করেন (১৯৪৭-এর কার্য-বিবরণী)। লাইব্রেরী ভবনের জন্যে 'ল্যাণ্ড একুই-জিশনে'র মারফৎ ৪২।১, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেনে প্রায় ৪ কাঠা জায়গা পাওয়া গেছে। আশা করা যায় সেই জায়গার উপর গৃহ-নির্মাণ কার্য্য এ বছরেই আরম্ভ হবে।

বর্তমানে 'ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী'র উদ্যোগে হাওড়া ও বালি পৌর এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রতিযোগীদের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে মনোমত পুরস্কার দেওয়া হয় আর এই পুরস্কার বিতরণের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয় লাইব্রেরীর সাম্বৎসরিক প্রীতি-সম্মিলনের। এ ছাড়া এই লাইব্রেরীতে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে হাওড়া জেলার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রীকে প্রতি বৎসর "দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক স্মৃতি-পদক" পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেছেন দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র শ্রীঅশোককুমার মল্লিক ও তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ (কার্য-বিবরণী, ১৯৫০)।

'ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী'র সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১২০০ বার শত। লাই-ব্রেরীর আজীবন সদস্যের চাঁদা এককালীন ৬০৲ টাকা। একাদিক্রমে বার বৎসর যাঁরা সাধারণ সদস্য আছেন মাত্র ত্রিশ টাকা দিলেই তাঁরা আজীবন সদস্য হতে পারেন। এ ছাড়া প্রথম, বিশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণী ও সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী —সদস্যদের এই তিনটি শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীর সদস্যরা এক সঙ্গে যে কোন দুইখানা বই নিতে পারেন। বিশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণী দুইখানা বই নিতে

পারলেও বাংলা দু'খানা নিতে পারেন না আর সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী এক সঙ্গে নিতে পারেন মাত্র একখানা বই। এ ছাড়া লাইব্রেরীর পাঠক সদস্যও আছেন। এদের ভর্তি ফি নেই, জমা ও মাসিক চাঁদা আছে। লাইব্রেরীর পাঠাগারে প্রায় সমস্ত দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে, পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পাঠের বিশেষ সুব্যবস্থা আছে এখানে।

'ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী'র বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ১২০০০ হাজার। বহু দুষ্প্রাপ্য দলিলপত্র ও পুরাতন পত্রিকা এ লাইব্রেরীতে রয়েছে। বাঁধানো পত্রিকাগুলোর ভেতর সাহিত্য (১৩০১), ভারতী (১৩০০), নব্য ভারত (১৩০৩), দাসী (১৮৯৬), তত্ত্ববোধিনী আলোচনা, অলকা, অর্চনা, মালঞ্চ, উদ্বোধন ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। আর পুরাতন দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের মধ্যে এইচ বিভারিজের 'ট্রায়েল অব মহারাজা নন্দকুমার' (পি মিত্রের ভূমিকা সহ), ১৮২১ সালে প্রকাশিত 'হিষ্টরী অব মডার্ণ ইউরোপ' ৬ খণ্ড, 'সিলেকসনস ফ্রম কবেটচ পয়েটিকেল ওয়ার্কস' ৬ খণ্ড (১৮৩৫), এডওয়ার্ড পরিটের 'আনরিফর্মড হাউস অব কমনস', নার্স্ উইলিয়ম সিনরের 'কনভারসেসনস উইথ ডিষ্টিংগুইসড পারসনস', হারবার্ট স্পেনসারের 'অটোবায়োগ্রাফী', স্যার জন ষ্ট্রাচির 'ইণ্ডিয়া—ইটস এডমিনিষ্ট্রেশন এণ্ড প্রোগ্রেস', ক্যাপ্টেন বার্টনের 'এরেবিয়ান নাইট' ১২ খণ্ড, "গোল্ডেন বুক অব টেগোর', 'প্রসিডিংস অব বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল' ১৯২১ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ লাইব্রেরীর ইংরেজী পুস্তক সংগ্রহ সত্যি ভালো।

'ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী'র বর্তমান সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দাস, সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় আর শ্রীবলাইচরণ চীনা লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান।

[৯-১১-৫২]

মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী

মহিয়াড়ী কলকাতা থেকে নয় মাইল দূরে হাওড়া জেলায় অবস্থিত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কথায় বলে "আন্দুল-মৌরি"-মহিয়াড়ীকে গ্রাম না বলে ছোটখাটো সহর বলা চলে—সহরের সমস্ত সুবিধাই এখানে পাওয়া যায়। রাস্তাঘাট, বাগান, বিরাট আয়তনের অট্টালিকা শ্রেণী, মন্দির-দেউল, সিনেমা, দু'দুটো হাসপাতাল আর ছেলেমেয়েদের জন্যে এতগুলো স্কুলের একত্র সমাবেশ কোন গ্রামে বড় একটা চোখে পড়ে না। গায়ে গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে আন্দুল আর মহিয়াড়ী দু'টো গ্রাম—গৌরবোজ্জল দুই যমজ বোন যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসছে, চোখ ফেললে চোখ ফেরানো যায় না, এমন সুন্দর। অতীতের সঙ্গে বর্তমান কাল যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এখানে, হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯২১ সালের ১লা মে "মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী"তে গিয়েছিলেন। লাইব্রেরীর মূল্যবান গ্রন্থ-সম্পদ দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি। 'মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী' দেখে ইংরেজীতে তিনি যে মন্তব্য লিখেছিলেন তার কিয়দংশের বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া গেল। "এ-লাইব্রেরীর সুনির্বাচিত বিচিত্র গ্রন্থ-সংগ্রহ দেখে আমি এক সঙ্গে আনন্দ ও বিস্ময় অনুভব করেছি। নানা বিষয়ের প্রচলিত প্রয়োজনীয় ইংরেজী ও বাংলা বই-এর সমস্তই এখানে আছে। এ ছাড়া ১২৩৫ বঙ্গাব্দে লেখা মহাভারতের ও ১১৮৩ বঙ্গাব্দে লেখা কবিকঙ্কন চণ্ডীর দুষ্প্রাপ্য অমূল্য পাণ্ডু-লিপি এখানে দেখতে পেলাম। বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন প্রভৃতি পুরাতন মূল্যবান সাময়িক পত্রিকার সম্পূর্ণ সংগ্রহ লাইব্রেরীতে স্তরে স্তরে সজ্জিত থেকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে লাইব্রেরীর। সুপ্রাচীন (ক্লাসিক্‌স) জীবনী-সাহিত্যের সমস্তই এখানে রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। আসলে এই দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থখণ্ডসমূহ মহিয়াড়ীর কুণ্ডু চৌধুরীবাবুদের দান আর লাইব্রেরীও তাঁদেরি বহির্বাটীর একখানা ঘরেই অবস্থিত। এ লাইব্রেরী তাঁদের নানা ধরণের জন-

হিতকর কার্যকলাপের অন্যতম উদাহরণ মাত্র।...এ মন্তব্য শেষ করবার আগে আরেকটি কথা অবশ্যই আমাকে বলতে হবে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি লক্ষ্য করেছি যে, 'ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদে'র দলিলপত্র (প্রোসিডিংস অব দি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স) ও প্রফেসার সি, ভি, রমণ, প্রফেসার পি, নিয়োগী প্রভৃতির মূল্যবান প্রবন্ধ-সম্ভারে সমৃদ্ধ সবগুলো 'বুলেটিন'ই (বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের) এ লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের এ মন্তব্য থেকে 'মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী'র সমৃদ্ধতর অবস্থার সম্পূর্ণ আভাষ পাওয়া যায় আর বুঝতে পারা যায় কি চমৎকার দুর্মূল্য গ্রন্থরাজি রয়েছে এ লাইব্রেরীতে।

১৮৮৬ সালের জুলাই মাস। মহিয়াড়ীতে স্কুল-হাসপাতাল সবই আছে। মহিয়াড়ী বঙ্গ বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী মারা গেছেন কিছুদিন আগে। একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের অভাব আছে গ্রামে, সেটি হলেই মহিয়াড়ী সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীর মনে গ্রন্থাগারের অভাববোধ ক্রমেই তীব্র হতে লাগলো। লাইব্রেরী স্থাপনে উদ্যোগী হলেন বিপিন বিহারী কুণ্ডু, মিহিরলাল চক্রবর্তী, ফেলারাম কুণ্ডু, উদয়নারায়ণ কুণ্ডু, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ রায় প্রভৃতি গ্রামের যুবকেরা। অবশ্য মহিয়াড়ীর কুণ্ডু-চৌধুরী বাবুরা এই প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। এক আবেদনপত্র প্রচার করলেন উপরোক্ত উদ্যোক্তারা, জনসাধারণের কাছ থেকে আশাতিরিক্ত সাড়া পাওয়া গেল এ আবেদনের। জনসাধারণের কাছ থেকে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বমোট এককালীন দান পাওয়া গেল পনের টাকার, দু'আনা, চার আনা, টাকা দু' টাকার মাসিক দানের অঙ্ক উঠলো পঁচিশ টাকায়, কুণ্ডু-চৌধুরীবাবুদের পারিবারিক মাসিক দান পাঁচ টাকা আজো লাইব্রেরী পাচ্ছে, আর আবেদনের ফলে পুস্তকদান পাওয়া গেল মনুসংহিতা, প্রতাপ সংহার, বিবিধপ্রসঙ্গ (রাজনারায়ণ বসু), পাঁচু ঠাকুর, অদৃশ্য দর্শন কাব্য, একাধিক সহস্র দিবস, স্পিচেস্ অব লর্ড রিপণ ও স্পিচেস্ অব কৃষ্ণদাস পাল এই আটখানা। তারপর ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে এক সাধারণ সভা ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী' মহিয়াড়ী বাজারে কুণ্ডু চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ বিদ্যালয়ের দালানের একখানি ঘরে প্রতিষ্ঠিত

হল। লাইব্রেরীতে সেদিনই দিয়ে দেওয়া হল কুণ্ডু চৌধুরী বাবুদের পারিবারিক লাইব্রেরীর পাঁচশো মূল্যবান গ্রন্থ আর জনসাধারণ যাতে লাইব্রেরীতে বসে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুযোগ পায়, সেজন্য ব্যবস্থা করা হল পাঠাগারের। গুরুদাস কুণ্ডু চৌধুরীকে সভাপতি আর হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরীকে সম্পাদক করে লাইব্রেরীর প্রথম কর্ম পরিষদ গঠিত হল। প্রথমে ১০ জন সভ্য নিয়ে লাইব্রেরী আরম্ভ করা হয়। তারপর দেখতে দেখতে লাইব্রেরীর সভ্যসংখ্যা পুস্তক-সংখ্যা ও কার্যকলাপ দ্রুত বেড়ে চলে।

১৮৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত মহিয়াড়ী বাজারে বঙ্গ বিদ্যালয়ের বাড়ীতেই লাইব্রেরী অবস্থিত ছিল। সে সময়ে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারার দরুণ লাইব্রেরীকে সরিয়ে আনা হয় কুণ্ডু-চৌধুরী বাবুদের মূল বাড়ীর বাহিরের দোতলার দু'খানা সুপ্রশস্ত ঘরে। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এ ভাবেই চলে। পরে একে স্থানান্তরিত করা হয় কুণ্ডু-চৌধুরী বাবুদেরই বহির্বাটীর একখানা সম্পূর্ণ পৃথক ঘরে। সেখানেই আজ পর্যন্ত লাইব্রেরীর কার্যকলাপ চলছে। ইতিমধ্যে গুরুদাস কুণ্ডু চৌধুরীর পুত্রগণ। ভারতচন্দ্র কুণ্ডু-চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র কুণ্ডু-চৌধুরী পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে হল ও ব্যালকনিযুক্ত বিরাট স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করিয়েছেন (১৯৩৪)। সেই বাড়ীতেই লাইব্রেরীর অবস্থিতি ভালো হবে বলেই মনে হয়। লাইব্রেরীতে যাঁরা গেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন 'মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী'র গ্রন্থ-সম্পদ দেখে। একটা গ্রাম্য লাইব্রেরী দেখে মনীষীরা এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অন্য কোথাও করেছেন বলে জানা নেই। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২৫ সালের ৩রা মার্চ এই লাইব্রেরীতে গিয়েছিলেন। দেখে তিনি যে মন্তব্য লিখেছিলেন তার থেকে একটা বাক্যের বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া গেল। "জয়দেবের গীত-গোবিন্দের এখানে রক্ষিত অতি প্রাচীন এক পাণ্ডুলিপিতে জয়দেবের মা-বাবার নাম রয়েছে দেখতে পেলাম। গীতগোবিন্দের বহু পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি কিন্তু জয়দেবের মা বাবার নাম দেখতে পাইনি।" ডাঃ সুকুমার সেন তাঁর "বাংলা সাহিত্যে গদ্য" (প্রকাশিত ১৩৪১) বই-এর ভূমিকায় লিখছেন "মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়ের কর্তৃপক্ষের সহায়তা আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছে।" রায় বাহাদুর জলধর সেন তাঁর প্রবন্ধ রচনাকালে বাংলা দেশের বহু বিখ্যাত লাইব্রেরীতে খোঁজ করেও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত "গাজী

মিঞার বোত্তানি" পুস্তকখানি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত 'মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী" থেকে বইখানি যোগাড় করেছিলেন। পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ১৩২৯ সালের ১০ই পৌষ লাইব্রেরীতে প্রথম আসেন ও এর গ্রন্থ-সম্ভার দেখে এতো মুগ্ধ হয়েছিলেব যে পরবর্তীকালে দু'বছর তিনি লাইব্রেরী গৃহে অবস্থান করে "পাঞ্চজন্য" (১৩৩৩) নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতে থাকেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (বার্ষিক সভাপতি, মহিয়াড়ী অনাথ বান্ধব সমিতি) এ লাইব্রেরী দেখতে আসেন ১৯২১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। মূল্যবান বই-এর সংগ্রহ দেখে কৌতুকভরে তিনি নাকি বলেছিলেন—'লোভ লাগছে, এ সব বই দেখিয়ো না আমাকে—নিয়ে যাবো বলছি।' তাঁর এ কথাগুলো আজো স্থানীয় লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

'মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী' দেখে বহু মনীষী তাঁদের উচ্ছ্বাসমুখর অভিমত লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। তাঁদের ভেতর প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৯১৭), রামদয়াল মজুমদার (১৩২৩ বঙ্গাব্দ), 'নায়ক' সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২১), দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৩৩০ বাং), বিনয়কুমার সরকার (১৯৩৮), সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (১৯৩৩), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪), ডাঃ কালিদাস নাগ (১৯৩৬), ডি আর ভাণ্ডারকর (১৯৩৭), প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৩৪৮ বাং), অশোকনাথ শাস্ত্রী (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এক কথায় যিনিই এ লাইব্রেরীতে গেছেন লাইব্রেরীর গ্রন্থসম্পদ দেখে তিনিই বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়েছেন।

বঙ্কিম শততম বার্ষিকী উৎসব আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হয়েছে এ লাইব্রেরীতে। এ ছাড়া লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে সাহিত্যসভার আয়োজনও করা হয়ে থাকে। নেতাজী জন্মোৎসব, রবীন্দ্র জয়ন্তী, বিজয়া সম্মিলনী প্রভৃতি সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকলেও বই লেনদেনই হচ্ছে এ লাইব্রেরীর কার্যকলাপের ভেতর প্রধান। মহিয়াড়ী ইউনিয়ন বোর্ড ও হাওড়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অর্থ সাহায্যে আর জনসাধারণের দান ও চাঁদায় বর্তমানে লাইব্রেরীর ব্যয়নির্বাহ হয়ে থাকে। এ ছাড়া সরকারী সামাজিক শিক্ষা পরিকল্পনা খাতে গত (১৯৫২) ৩০০৲ টাকার পুস্তক ও আসবাব-পত্রাদি

পাওয়া গেছে। বর্তমানে এ লাইব্রেরীর সভ্য সংখ্যা ১৫০। দুইশত টাকা নগদ বা সেই মূল্যের বইপত্র লাইব্রেরীতে দিলে লাইব্রেরীর আজীবন সদস্য হওয়া যায়। সাধারণ সদস্যদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী হিসাবে চাঁদার হার যথাক্রমে এক টাকা, বারো আনা ও ছয় আনা আর জমা চার টাকা, তিন টাকা ও দুই টাকা। বর্তমানে পাঠাগারে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ৯০ খানা, সাধারণের পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে।

'মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী'র দুষ্প্রাপ্য হাতে লেখা পুঁথি ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ২৫০ খানার মতো। পুঁথিগুলো ২৫০ থেকে ৩ শত বৎসরের পুরাতন তালপাতায় তুলট কাগজে লেখা। এর ভেতর রঘুনন্দন কৃত তিথিতত্ত্বম্, বিরাটপর্ব, শ্রীমদ্ভাগবতম্, রঘুনন্দনকৃত প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, আহ্নিকতত্ত্ব ও আচারতত্ত্ব (রঘুনন্দন), মহাভারত (১২৩৫ বঙ্গাব্দ), কবিকঙ্কন চণ্ডী (১১৮৩ বঙ্গাব্দ), তন্ত্রসার প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। লাইব্রেরীর হাতে লেখা পুঁথির সংগ্রহ সত্যি ভালো।

'মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী' বর্তমানে হাওড়া পাঠাগার সঙ্ঘের সভ্য-তালিকাভুক্ত হয়েছে। লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক-সংখ্যা সর্বমোট ৬২১৪ খানা। তার ভেতর বাংলা বই-এর সংখ্যা ৪৭৫২ খানা আর বাকি ১৪৬২ খানা ইংরেজী। অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বই ও পত্র পত্রিকা এ লাইব্রেরীতে রয়েছে। দুষ্প্রাপ্য রেফারেন্স বই-এর ভেতর বিশ্বকোষ, সমর্থকোষ, শব্দকল্পদ্রুমঃ, মহাভারতম্ (শ্রীরামপুর ১৭৯৩ শকাব্দ) টেগ ও মলি সম্পাদিত স্পেক্টেটর, স্পিচেস এণ্ড মিনিটস বাই কৃষ্ণদাস পাল, স্পিচেস বাই বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (১৮৮৬-৯০) ডব্লু কেরির ডিক্সনারি অব দি বেঙ্গলি লেঙ্গয়েজ (শ্রীরামপুর, ১৮২৫) প্রভৃতি এখানে আছে। এ ছাড়া প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে ইংরেজী, বাংলা, ও সংস্কৃত ভাষায়। প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকার এমন সুন্দর সংগ্রহ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। পুরাতন পত্র-পত্রিকার ভেতর বঙ্গদর্শন (সম্পূর্ণ মূল), আর্যদর্শন (১২৮১ থেকে), জন্মভূমি (১২৯৭ থেকে), ভারতী (১২৮৪ থেকে), ভারতী ও বালক (১২৯৩ থেকে), বালক (১২৯২), ভ্রমর (১২৮১ থেকে), প্রচার (১২৯১ থেকে), নবজীবন (১২৮২ থেকে), তমলুক পত্রিকা (১২৮০ থেকে), অনুসন্ধান (১২৯৪ থেকে), কল্পনা (১২৮৭ থেকে), প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

এ লাইব্রেরীর দুষ্প্রাপ্য অভিধানের সংখ্যাও অনেক। তার ভেতর বাচস্পত্য (১৮৭৩), শব্দস্তোম মহানিধি সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান (১৮৬৬), শব্দার্থ মুক্তাবলী (১৭৮৮) প্রকৃতিনির্ণয় অভিধান (১৮৮০) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী'র মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ দেখে সত্যি মুগ্ধ হতে হয়।

'মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী'র বর্তমান সভাপতি শ্রীযতীন্দ্রমোহন কুণ্ডু চৌধুরী, সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী কুণ্ডু চৌধুরী ও শ্রীনলিনবিহারী কুণ্ডু চৌধুরী আর শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীমানী হলেন বর্তমান লাইব্রেরীয়ান।

[৩-২-৫৩]

পল্লী-ভারতী গ্রন্থাগার

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে পল্লী-ভারতী গ্রন্থাগারে (মুগকল্যাণ, হাওড়া) সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সে উৎসবে পৌরোহিত্য করছেন যুগান্তর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তারপর ১৯৫২ সালের ৩০শে নভেম্বর গ্রন্থাগারের পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে হীরক জয়ন্তী উৎসব সম্পূর্ণ হয় বিশেষ আড়ম্বরের সহিত কথা-সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসুর সভাপতিত্বে। সে উৎসবের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ অতীন বসু এম-এল-এ, আর সেদিন তিনি বলেছিলেন—"এ প্রতিষ্ঠান এই পল্লী অঞ্চলের প্রকৃত তীর্থ।" তাঁর এই কথাগুলো সেদিন সে অঞ্চলের লোকদের ভেতর যে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, আজো তার পরিচয় পাওয়া যায়।

হাওড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বাগনান থানায় মুগকল্যাণ গ্রাম অবস্থিত। হাওড়া থেকে রেলপথে বাগনান উনত্রিশ মাইল, সেখানে নেমে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে দক্ষিণে আরো তিন মাইল গেলে মুগকল্যাণ গ্রাম পাওয়া যায়। পূর্ব-পশ্চিমে সমান দূরে দামোদর ও রূপনারায়ণ নদ—দুই নদ-বিধৌত মাঝের এ সমতলভূমি স্বাস্থ্যকর। গ্রামের প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত "মেদিনীপুর ক্যানেল"—পূর্বে যাত্রীও মালবাহী ষ্টিমার চলতো এ 'ক্যানেল' দিয়ে। সুদূর অতীতে মেদিনীপুরের প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তের দ্বারপথের গঞ্জরূপে কাজ করতো মুগকল্যাণ আর তার আশেপাশের গ্রামগুলো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্ক ছিল এখানকার লোকের। মধ্যবিত্ত প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম মুগকল্যাণ পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতাই রক্ষা করে চলেছে।

স্থানীয় জমিদার ঘোষাল বাবুরা ১৮৬৬ সালে এক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও ১৮৮৮ সালে সেটা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এ অঞ্চলে স্কুল না থাকায় নিকট ও দূরের ছাত্রেরা এখানে পড়তে আসতো। বিরাট ধুম-ধামের সহিত পূজাপার্বনাদির ব্যবস্থা করতেন জমিদার ঘোষাল বাবুরা, ব্যবস্থা

করা হতো নাচ, গান, যাত্রা, কথকতার, বিশেষ করে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হতো মহাসমারোহে। গ্রামের আর দশ জনের সঙ্গে এ সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানে গ্রামের শিক্ষক আর ছাত্রেরাও যোগদান করতেন, প্রবাসী ছাত্ররাও গ্রামে ফিরে আসতো পূজোয়। ১৮৮৮ সালের অক্টোবর মাসে এই উৎসব আসরে বসেই গ্রামের কয়েকজন তরুণ ছাত্র গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রথম সঙ্কল্প গ্রহণ করে, আর পরের সপ্তাহে কার্যে পরিণত করে তারা সে সঙ্কল্পকে ; গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আনা বই-এর সংগ্রহ দিয়ে ঘোষালবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপের ছোট এক ঘরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'যুগকল্যাণ পাবলিক লাইব্রেরী।" নবগঠিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের চেষ্টায় এই নবগঠিত পাঠাগার স্থানীয় কিশোর ও তরুণ মহলে উৎসাহ ও আলোড়নের সৃষ্টি করলো, গ্রন্থাগারকে উপলক্ষ করে বয়ে চললো কর্মচঞ্চল এক প্রাণ-প্রবাহ স্থানীয় তরুণদের ভেতর ছিলেন রামকানাই ঘোষাল ক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষাল, গোষ্টবিহারী ঘোষ, লালবিহারী ঘোষ, বিনোদবিহারী ঘোষ নলিনীকান্ত ঘোষাল, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, লালবিহারী মিত্র ও শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ। উদ্যোক্তদের ভেতর একমাত্র শরৎচন্দ্র ঘোষই বর্তমানে জীবিত আছেন এঁদের নিয়েই লাইব্রেরীর প্রথম কর্মীসংঘ গঠিত হ'ল, লাইব্রেরীর প্রথম সভাপতি হলেন শ্রীপতিচরণ বসু আর রামকালী ঘোসাল হলেন লাইব্রেরীর প্রথম সম্পাদক। লাইব্রেরী স্থাপনের এই প্রথম প্রচেষ্টায় পাশের সাহড়া গ্রামের ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক (র‍্যাংলার), চন্দ্রভাগ নিবাসী নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ও বর্তমানে অশীতিপর শ্রীকৃত্তিবাস সরকার আর খাজুরনান গ্রাম নিবাসী ফকিরচন্দ্র বিশ্বাস নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। তরুণ কর্মীদের এ সৎকর্মে খুসী হয়ে স্থানীয় জমিদার ক্ষেত্রমোহন ঘোষাল লাইব্রেরীর গৃহ নির্মাণের জন্য আড়াই কাঠা জমি দান করলেন আর গ্রামবাসীদের সহায়তায় তরুণ কর্মীরা তৈরী করলেন সুদৃশ্য মেটে কোঠা সেই জমির উপর। ১৮৮৮ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন সেই ঘরেই লাইব্রেরী অবস্থিত ছিল। সেই আদিযুগে স্থানীয় ঈশানচন্দ্র ঘোষাল বহু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন এই লাইব্রেরীকে।

এ লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করে শুধু যে একটা সাংস্কৃতিক আবহাওয়াই গড়ে উঠেছিল এমন নয়, এ অঞ্চলের জাতীয় আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করেই ১৯০৬-০৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

ও বিদেশী পণ্য বয়কট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদেরি আমন্ত্রণে এ দুর্গম পল্লী অঞ্চলে পদার্পণ করেছিলেন—তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'নেশন ইন মেকিং'-এ তিনি নিজে এ কথা লিখে রেখে গেছেন (বিংশ অধ্যায়, পৃঃ ২০৩)। সমস্ত জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গেই লাইব্রেরীর ইতিহাস যুক্ত হয়ে আছে।

১৯২১ সালে লাইব্রেরীর কর্মিসঙ্ঘ বুঝতে পারলেন, তরুণ সম্প্রদায়কে আরো বেশী আকর্ষণ করতে হলে লাইব্রেরীর ক্লাব বিভাগ খোলা প্রয়োজন,—প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'মুগকল্যাণ রিক্রিয়েশন ক্লাব ও মুগকল্যাণ ড্রামাটিক ক্লাব'। এবার রীতিমতো সাড়া পড়ে গেল, জনসাধারণ বিশেষভাবে লাইব্রেরীর দিকে ঝুঁকতে লাগলো। স্থানীয় জমিদারবাবুদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক মাসের ভেতর কর্মীরা তৈরী করলেন সুবৃহৎ ফুটবল মাঠ ও অভিনয়ের উপযোগী বিস্তৃত হল ও ষ্টেজ (অভিনয় মঞ্চ)। উত্তরোত্তর বেড়ে চললো লাইব্রেরীর কার্যকলাপ। এদিকে ১৯১৪ সালে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ভবনের অট্টালিকার জন্য স্থানাভাব হওয়ায় লাইব্রেরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক জমিদার ঈশানচন্দ্র ঘোষাল লাইব্রেরী গৃহ সমেত ভূমিখণ্ডটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলেন। ফলে লাইব্রেরী আবার উঠে এলো ঘোষালবাবুদের পূজামণ্ডপে। লাইব্রেরীর কর্মিদল স্থায়ী নিজস্ব লাইব্রেরী ভবন নির্মাণের জন্য এবার উঠে পড়ে লাগলেন। ১৯২১ সালে গৃহ নির্মাণের সবই যখন প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে, গান্ধীজীর খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মীরা, ফলে গৃহ নির্মাণ কার্য আপাততঃ স্থগিত রইলো। অবশেষে ১৯২৪ সালে ব্যবস্থা করা হ'ল লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্মাণের। গৃহ নির্মাণের ভূমিখণ্ড দান করলেন মুগ-কল্যাণ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ। এবার বিপুল উদ্যোগে কর্মীরা গৃহ নির্মাণ কার্যে লাগলেন, লাইব্রেরীর নিজস্ব জায়গায় নিজস্ব গৃহ নির্মিত হল। গণ্ডগোল বেধে উঠলো জমিদারবাবুদের গৃহ থেকে লাইব্রেরী স্থানান্তর করবার ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত লাইব্রেরী নিজস্ব বাড়ীতে উঠে এলেও পুরাতন কর্মীরা নূতন কর্মিসঙ্ঘের হাতে লাইব্রেরীর ভার ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। নূতন কর্মিদল লাইব্রেরীর ভার ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। নূতন কর্মিদল লাইব্রেরীর ভার গ্রহণ করেই ১৯২৫ সালে পাশের সাহড়া গ্রামের

মৃতকল্প গ্রন্থাগারকে এনে এ লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত করলেন। এর ফলে এক সংযুক্ত শক্তিশালী লাইব্রেরী গড়ে উঠলো আর 'মুগকল্যাণ পাবলিক লাইব্রেরী'র জায়গায় এবার লাইব্রেরীর নূতন নামকরণ করা হ'ল 'মুগকল্যাণ ইউনিয়ন লাইব্রেরী।' এবারে লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ও সভ্য সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল। গৃহ নির্মাণ কার্য সম্ভব হয়েছিল জনসাধারণের অকুণ্ঠ বদান্যতায়, এজন্য নতীবপুরের প্রমথনাথ ঘোষের পাঁচ শত টাকা দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯২৮ সালে গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগারের কার্যকলাপ ছাড়া অন্যান্য গঠনমূলক কার্যে হাত দিলেন। তাঁদের চেষ্টায় স্থাপিত হ'ল বালিকা বিদ্যালয় ও "দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার।" এতে করে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের কর্মপ্রচেষ্টা বিস্তৃত হয়ে পড়লো। সেই বালিকা বিদ্যালয়ই বর্তমানে 'মুগকল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত হয়েছে। দু'বছর ধরে সব বিভাগের কাজই চললো ভালোভাবে। তারপর ১৯৩০ সালে এলো গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন। সে আন্দোলনে কর্মীরা যোগ দিলেন, ফলে লাইব্রেরীর কাজে দেখা দিল সাময়িক অবহেলা। অন্যদিকে চললো পুলিসী জুলুম, লাইব্রেরীর বইপত্র তচনচ করলো তারা, বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল অনেক বই আর কাগজপত্র। চরম দুর্দশার সম্মুখীন হ'ল লাইব্রেরী,—একদিকে কর্মীর অভাব দেখা দিল, অন্যদিকে সইতে হ'ল রাজরোষের ফলে ক্ষয়ক্ষতি—ফলে বছরখানেক লাইব্রেরীর কাজ একেবারেই বন্ধ রইলো বলা চলে। ১৯৩১ সালের শেষের দিকে লাইব্রেরীর কাজ আবার নূতন উদ্যমে আরম্ভ হ'ল ও ১৯৩২ সালে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা হাওড়া জেলা কংগ্রেস কর্মী সম্মিলনের আহ্বান করলেন। গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সে সম্মিলন সম্পূর্ণ হ'ল আর সে উপলক্ষে গ্রন্থাগার ভবনে পদার্পণ করলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহোদরা ঊর্মিলা দেবী প্রমুখ নিখিল বঙ্গের বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ। ১৯৩২ সালের শরৎকালে গ্রন্থাগারে শারদীয়া উৎসবের আয়োজন করা হয়, সে উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে এ লাইব্রেরীতে এসেছিলেন বাঙ্গালা দেশের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নূতন পরিচালকমণ্ডলী গ্রন্থাগার পরিচালনভার গ্রহণ করেন ১৯৩৩ সালে,

প্রথমেই তাঁরা গ্রন্থাগারের নাম পরিবর্তন করে নূতন নামকরণ করলেন 'মুগকল্যাণ ইনষ্টিটিউট'। এ বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ সময়ে লাইব্রেরীর কর্মীরা গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের গঠনমূলক কর্মে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। লাইব্রেরীর ক্লাব বিভাগের কার্যকলাপও এ সময়ে ভালভাবেই চলতে থাকে। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ক্লাবের পুরস্কার বিতরণ উৎসবে প্রধান অতিথি হয়ে লাইব্রেরীতে যান স্বর্গীয় বৈমানিক বিনয়কুমার দাস আর সভাপতি হয়ে যান বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের চেয়ারম্যান বীরেন রায়। কলকাতা থেকে সরাসরি বিমানে মুগকল্যাণে গিয়ে অবতরণ করেন তাঁরা। লক্ষাধিক লোক সে উৎসবে যোগদান করে উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হ'ল, স্বাধীন দেশের মনোবৃত্তিকে রূপ দিতে এবার গ্রন্থাগারের নূতন নাম রাখা হ'ল 'পল্লী-ভারতী গ্রন্থাগার।'

'পল্লী-ভারতী গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য। বর্তমানে সমস্ত বিভাগেই এর কার্যকলাপ চলছে। হাওড়া পাঠাগার সঙ্ঘেরও অন্তর্ভুক্ত এ গ্রন্থাগার। এ প্রতিষ্ঠানের তরুণ সভ্যেরা বহুদিন ধরে হাতে লেখা পত্রিকা 'পল্লীবাণী' বের করে চলেছেন। গ্রন্থাগারের নাট্যাভিনয় বিভাগ কর্তৃক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের 'জনা' ও 'বলিদান', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী', দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' প্রভৃতি বহু নাটক। এর ক্লাব বিভাগ এ অঞ্চলের একটি শ্রেষ্ঠ ক্লাবরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে বহুদিন ধরে আর 'দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার' বিভাগ সেবা করে চলেছে দুঃস্থ জনসাধারণের। মোটের উপর "পল্লী-ভারতী গ্রন্থাগারে"র সমস্ত বিভাগই বর্তমানে প্রাণবন্ত, আর এর জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যও সত্যি বিরাট।

বর্তমানে 'পল্লী-ভারতী গ্রন্থাগারে'র পুস্তক সংখ্যা দুই হাজার। কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার রয়েছে। পাঠাগারে আছে সর্বসাধারণের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা। ১৫ খানি সাময়িক পত্রিকা ও দুইখানি দৈনিক পত্রিকা বর্তমানে পাঠাগারে রাখা হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের বর্তমান সভাপতি শ্রীবিমলকৃষ্ণ পাল, সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন ঘোষ ও শ্রীনির্মলশিব পাল এ

গ্রন্থাগারের বর্তমানের গ্রন্থাগারিক।

পঁয়ষট্টি বৎসর অতিক্রম করে 'পল্লী-ভারতী গ্রন্থাগারে'র হীরক জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়েছে সমারোহের সহিত ১৯৫২ সালের ৩০শে নভেম্বর। একটা গ্রাম্য লাইব্রেরীর পক্ষে নিশ্চয়ই এ কম গৌরবের কথা নয়।

[১০-২-৫৩]

ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী

১৮৯৮ সালের কথা। আজকের কল-কারখানাসমৃদ্ধ হাওড়া দেখে তখনকার হাওড়ার কথা চিন্তা করাও সম্ভব নয়। বর্তমানের হাওড়া সহর হালে গড়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এখানে কল-কারখানা স্থাপিত হ'তে আরম্ভ করে আর বর্তমান সহরটা প্রকৃত পক্ষে গড়ে ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। ১৮৯৮ সালের হাওড়ায় নাম করবার মতো শিক্ষায়তনই ছিল না। সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তো দূরের কথা। বিভিন্ন জনহিতকর কার্যকলাপের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৯৮ সালে "ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব" স্থাপিত হয়। সেই ক্লাবের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের ভেতর "ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী"র পরিচালনা অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। "ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী"র ভিত্তি স্থাপিত হয় "ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব" স্থাপিত হবার প্রায় ছয় বৎসর আগে। অবশ্য ক্লাবের হাতে আসবার আগে লাইব্রেরীকে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এ অঞ্চলে সে সময়ে কোন লাইব্রেরী ছিল না। পাড়ার যুবকেরা ঠিক করলেন লাইব্রেরী স্থাপন করতে হবে। সে সময়ের উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন মহাদেব শেঠ (পরবর্তীকালে 'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে'র সম্পাদক ও সভাপতি), অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য প্রভৃতি যুবকবৃন্দ। নিজেদের নামমাত্র উদ্বৃত্ত অর্থে পুস্তক ক্রয় করে এনে তাঁরা পাঠকদের দিতেন, প্রয়োজনমতো পাঠকদের চাহিদা মেটাতেন অন্য লাইব্রেরী থেকে বই এনে দিয়ে। তাঁদের এ চেষ্টাকে লাইব্রেরী স্থাপনের 'উদ্যোগ পর্ব' বলা চলে। লাইব্রেরী স্থাপনের ইচ্ছেটাই এতে চরিতার্থ হয়েছিল, সত্যিকারের লাইব্রেরীর রূপ এ চেষ্টা পায়নি; সুতরাং এ লাইব্রেরীর নামকরণের প্রশ্নই ওঠেনি তখনো। এটাকে ভিত্তি করে কিছু দিন পরে এই উদ্যোক্তারাই খুরুট রোডে (বর্তমানের নেতাজী সুভাষ রোড) একখানি ছোট ঘর ভাড়া করে "ফ্রেণ্ডস পাবলিক লাইব্রেরী" স্থাপন করেন। এই লাইব্রেরীর প্রথম সভাপতি

ছিলেন পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় অল্প দিনের ভেতরেই লাইব্রেরী উন্নত হয়ে উঠে ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ফলে পুস্তকসংখ্যা আর সভ্যসংখ্যা দুই-ই দ্রুত বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে খুব সম্ভব পরিচালকদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে লাইব্রেরীতে ভাঙন ধরে, ঠিক এই সময় ১৮৯৮ সালে 'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব' গঠিত হয় ও 'ফ্রেণ্ডস পাবলিক লাইব্রেরী' হস্তান্তরিত হয়ে ক্লাবের পরিচালনাধীনে আসে। 'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব' লাইব্রেরীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী হয়ে লাইব্রেরীর নামকরণ করেন 'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী'। সেই সময় মাধবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। সুপরিচালিত হয়ে লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ও লাইব্রেরীর সভ্যসংখ্যা বিস্তর বেড়ে যায়।

লাইব্রেরীর কলেবর ও কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। জনহিতকর কার্যের জন্য লটারির (সুইপ) আয়োজন করে অর্থ সংগ্রহ করবার রেওয়াজ ছিল সেকালে, অবশ্য অন্য উদ্দেশ্যেও যে লটারির আয়োজন করা হ'ত না তা নয়। 'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব' লাইব্রেরীর গৃহ নির্মাণ তহবিল গড়ে তোলবার জন্য লটারির আয়োজন করলেন। লটারি করে তহবিল গড়ে উঠলো ও সংগৃহীত অর্থ ব্যাঙ্কে আমানত রাখা হ'ল।

'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব' লাইব্রেরীর গৃহ নির্মাণের জন্য ১০৬, খুরুট রোডে মৌরসী মোকররী চারকাঠা জমি কিনলেন। আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই জমির উপর তিনটি পাকা ঘর নির্মাণ করা হয় ও সেখানে লাইব্রেরী উঠে যায়। বর্তমানে এই বাড়ীতেই লাইব্রেরী অবস্থিত। লাইব্রেরী নিজস্ব বাড়ীতে স্থিত হওয়ার পর লাইব্রেরীর সভাপতি হন হাওড়ার সে সময়ের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী চারুচন্দ্র সিংহ মহাশয়। তিনি বহুদিন লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন ও তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় লাইব্রেরীর অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তারপর লাইব্রেরীর সভাপতি হন হাওড়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথ রিপন কলেজের অধ্যক্ষ গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়। বিশেষভাবে তাঁরই চেষ্টার ফলে লাইব্রেরীর আর্থিক বনেদ সুদৃঢ়তর হয়ে ওঠে।

'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী'র ১৯২৯ সালের কার্য-বিবরণীতে দেখতে পাওয়া যায়, "নিকটবর্তী পল্লীমধ্যে দেশহিতকর কোনরূপ সভা-সমিতি বা অনুষ্ঠান ইত্যাদি করবার উপযুক্ত স্থান না থাকায় 'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব' লাইব্রেরীর ইমারতের উপর একটি সুপ্রশস্ত হলঘর নির্মাণ করবার সঙ্কল্প করেছেন।" গঙ্গাধরবাবু তখন লাইব্রেরীর সভাপতি। তাঁরই চেষ্টায় একতলায় আরেকটি নূতন ঘর তৈরী করে সমগ্র ইমারতের ওপর সুউচ্চ পরিসর বারান্দাযুক্ত একটি বৃহৎ হলঘর নির্মিত হয়। বর্তমানে এই হল নানারূপ জনহিতকর সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একেবারে গোড়ার দিক থেকেই এ লাইব্রেরী একটি অবৈতনিক গ্রন্থাগার। 'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী'র সভ্যদের কোন চাঁদা দিতে হয় না। এটা এ লাইব্রেরীর সত্যিকারের বিশেষত্ব সন্দেহ নেই, এ রকম সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা সত্যি বিরল। যাঁরা বাড়ীতে পড়বার জন্যে বই নিয়ে যান তাঁদেরকে কেবলমাত্র পাঁচ টাকা জমা রাখতে হয়, লাইব্রেরীর সঙ্গে সম্পর্ক যখনই তাঁরা শেষ করে দিতে চান, তখন তাঁদের এ জমা টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর সমস্ত খরচ চলে একতলার কিয়দংশের ভাড়া থেকে আর আমানতী টাকার সুদ থেকে। এ বাড়ীর দেয় কর মকুব করে দিয়েছেন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি। এ ছাড়া পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য বর্তমানে মিউনিসিপ্যালিটি বাৎসরিক ২৪০৲ টাকা করে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। গত বৎসর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারও লাইব্রেরীকে পুস্তক দিয়ে সাহায্য করে চলেছেন।

'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী'র বর্তমান সভ্যসংখ্যা ৪ শতেরও অধিক। বর্তমানে লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৬ হাজার। সংহিতা, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ভালো সংগ্রহ রয়েছে এ লাইব্রেরীতে।

এ ছাড়া বহু প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এই লাইব্রেরীতে আছে, তার থেকে মাত্র কয়েকখানার নাম এখানে দেওয়া গেল। (১) বিশ্বকোষ ১ হইতে ২২ খণ্ড পর্যন্ত (২) শ্রীপদ কল্পতরু ১ম—৫ম খণ্ড; (৩) অক্ষয় দত্তের ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ও ২য় খণ্ড; (৪) প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও ব্যবসা বাণিজ্য (৫) অক্ষয় মৈত্রের গৌড় লেখমালা; (৬) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগার আইন, পাঁচু ঠাকুর; (৭) কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর নবদ্বীপ মহিমা—নবদ্বীপের প্রাচীন

ইতিহাস; (৮) কুমুদনাথ মল্লিকের নদীয়া কাহিনী; (৯) কৃষ্ণকুমার মিত্রের মোহম্মদ রচিত; (১০) গোবিন্দ দাসের বিজয়ন্তী, কুঙ্কুম, কস্তুরী; (১১) ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গল; (১২) ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ; (১৩) প্যারীচাঁদ মিত্রের লুপ্ত রত্নাগার, (১৪) শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস; (১৫) কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীত সূত্রসার প্রভৃতি। এই লাইব্রেরীর দর্শন, উপনিষদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের সংগ্রহ খুব ভালো। পাঠাগারে বর্তমানে ৫টি দৈনিক, ২টি সাপ্তাহিক ও ৯খানি মাসিক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। সুপ্রশস্ত পাঠাগারে পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া এ লাইব্রেরীতে প্রাচীন দলিলপত্র ও রেফারেন্সের বইও রয়েছে যথেষ্ট। গবেষণাকার্যের জন্য অনেকেই এ লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী'র বর্তমান সভাপতি হাওড়ার ভূতপূর্ব পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক অমরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর শ্রীশশাঙ্কশেখর ঘোষাল হলেন লাইব্রেরীর বর্তমানের লাইব্রেরীয়ান।

[২৫-১০-৫২]

বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী

বেলুড় আজ তীর্থে পরিণত হয়েছে, পুণ্যার্থী জনগণের ভিড় লেগে আছে এখানে দিনরাত। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত বেলুড় মঠ পুণ্যভূমি, সাধনক্ষেত্র স্বামীজীর,—গঙ্গাতীরের শান্ত সমৃদ্ধ পরিবেশে অপূর্ব। সফল সাধনার স্বপ্নরঞ্জিত বেলুড় আজ আনন্দমুখর, ছবির মতো ভেসে ওঠে চোখের সামনে সগৌরবে। অতীতে বেলুড় খুব সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। লালাবাবুর কীর্তিভূমি বেলুড়, একটা ইতিহাস আছে এগ্রামের। এখানেই উদ্‌যাপিত হয়েছিল লালাবাবুর পত্নী রাণী কাত্যায়নীর "অন্নমেরু" আর "তুলাদান" এ দুই মহাব্রত। ছোট বড় উৎসব অনুষ্ঠানে আনন্দ-কোলাহলমুখর ছিল সেদিনও এ গ্রাম। আজো লালাবাবুর স্মৃতি মিশে আছে গঙ্গাতীরে "লালাবাবু সায়ার স্নানের ঘাটে" আর তাঁর অপর নামানুসারে বেলুড় গ্রামের কিয়দংশের "কৃষ্ণচন্দ্র-পুর" নামে। তারপর আরেক দিন এখান থেকেই বের হতে আরম্ভ করেছিল গিরীশচন্দ্র ঘোষের বিখ্যাত "বেঙ্গলী" পত্রিকা, রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিল দেশ-বিদেশের বিদ্বৎসমাজে। সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল অতীতের বেলুড়, বহু ধনী-জ্ঞানীর সমাবেশ হয়েছিল সেদিন এখানে।

কিন্তু কোন সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল না সেই বর্ধিষ্ণু বেলুড় গ্রামে। ১৮৯৪ সালে তীব্র হয়ে উঠলো গ্রামবাসীদের ভেতর সে অভাব বোধ। ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে "বিনীত প্রার্থনা" নাম দিয়ে প্রচার করা হ'ল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত এক মুদ্রিত আবেদন পত্র, সেখানি আজো সযত্নে রক্ষিত আছে "বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী"তে। তার হুবহু প্রতিলিপি এখানে দেওয়া গেল লাইব্রেরীর আরম্ভের ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য হিসেবে। "আমাদের বেলুড় গ্রামে একটি সাধারণ পুস্তকালয়ের সম্পূর্ণ অভাব আছে। এই গ্রামে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস, সুতরাং এখানে একটি পুস্তকালয় থাকা নিতান্ত আবশ্যক। এই অভাব পূরণ করিবার অভিলাষে আমরা শিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী অর্থশালী ব্যক্তিগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা

যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া উক্ত সৎকার্য সাধনে উৎসাহ বর্ধন করবেন। নিবেদকগণ— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবগোপাল ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রচন্দ্র দাস ঘোষ, পুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশনাথ দাস দত্ত, অম্বিকাচরণ দাস ঘোষ, যশোদানন্দন সাধু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।" এঁরাই 'বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী'র প্রথম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা।

এর পর এক সভায় সবাই মিললেন, ১৮৯৫ সালের গোড়ার দিকের কথা সেটা। লাইব্রেরী স্থাপনের কথা ঠিক হ'ল, ঠিক হ'ল "বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী" নাম হবে লাইব্রেরীর। লাইব্রেরী গড়তে টাকা ও বইপত্র চাই। এক টাকা করে চাঁদা দিলেন দশ বার জন সভ্য, একটি আলমারি কিনে আনা হ'ল সেই টাকায়। জনসাধারণের কাছ থেকে চেয়ে আনা হ'ল বইপত্র, কেউ বা দিলেন কিছুদিনের জন্য, আবার একেবারেই দান করলেন কেউ। যাঁরা একেবারেই দান করলেন তাঁদের ভেতর হরিপদ আচার্য, যশোদানন্দন সাধু ও রাজনারায়ণ পালের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৫ সালের গুড্ ফ্রাইডের শুভদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে "বেলুড পাবলিক লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠিত হল বেলুড় বাজারে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর বেলুড মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের (বর্তমান বেলুড় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়) উপরের তলায়, সেই সঙ্গে পাঠাগারে ব্যবস্থা করা হ'ল সাধারণের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের। সাধারণ সভ্যের মাসিক চাঁদা করা হ'ল দু'আনা করে আর ছাত্রেরা হ'ল বিনা চাঁদায় "সুবিধাপ্রাপ্ত" সভ্য। গ্রামবাসীদের নিকট চাঁদা উঠলো পঁয়ষট্টি টাকা, তার থেকে বই কিনে আনা হতে লাগলো দু'চারখানা করে। কালীপদ আচার্য লাইব্রেরীতে ২৫৲ টাকার বই দিয়ে আর প্রমথনাথ ঘোষ নগদ কুড়ি টাকা দিয়ে লাইব্রেরীর আজীবন সভ্য হলেন। মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ও লাইব্রেরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যশোদানন্দন সাধুর তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরীর কাজ চলতে লাগলো।

১৮৯৫ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরী ক্রমোন্নতির পথে চলতে লাগলো, বেড়ে চললো এর সভ্য সংখ্যা ও বইপত্র। মিঃ এইচ কে বেম্বার যখন বালি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তখন (১৯০৫) থেকে লাইব্রেরী মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অর্থ সাহায্য পেতে আরম্ভ করে। বই লেনদেন ছাড়া প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন, রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব, সরস্বতী পূজায় আবৃত্তি

প্রতিযোগিতা, সাহিত্য সভা প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হতো তখন। স্বামীজী মঠে থাকাকালীন মাঝে মাঝে এসে লাইব্রেরীতেও বসতেন। যে চেয়ারে তিনি বসতেন আজো সে চেয়ার স্কুলগৃহে দ্রষ্টব্য হিসেবে রক্ষিত আছে। ১৯০৫ সাল থেকে লাইব্রেরীর উন্নতিতে ভাঙন ধরলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী সরকারী পরওয়ানা নিয়ে এসে দক্ষিণ পাড়ার (বর্তমান লিলুয়া রেলওয়ে কলোনী) জায়গা জোর-দখল করলেন। সাত-পুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হ'ল অনেককে অন্যত্র, আর ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অনেকে চলে গেলেন সহরে। অপর দিকে ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দেওয়ায় গ্রাম উজাড় হতে বসলো। ফলে ব্যাহত হ'ল লাইব্রেরীর কার্যকলাপ। একটা অব্যবস্থার ভেতর দিয়ে লাইব্রেরী চলতে থাকে একটানা ১৯১৬ সাল অবধি। এ সময়ে যশোদাবাবুই ছিলেন লাইব্রেরীর সর্বময় কর্তা। ১৯১০ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরীর কার্য পরিচালনা করেন সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, আর তার পরে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরীর পরিচালনা ভার পড়ে বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর। বিমলবাবুর আমলে অনেক বইপত্র খোয়া যায় ও পরিচালনায় অব্যবস্থা চরমে পৌঁছে। এই অব্যবস্থার হাত থেকে লাইব্রেরীকে বাঁচাবার জন্য ১৯১৬-১৭ সালে নলিনচন্দ্র সরকার, ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি একদল যুবক কর্মী এগিয়ে এলেন। তাঁদের চেষ্টায় লাইব্রেরী আবার ভালভাবে চলতে আরম্ভ করলো, নতুন কার্যনির্বাহক কমিটী গঠিত হলো ও পরিবর্তন সাধিত হলো লাইব্রেরীর গঠনতন্ত্রে। তবু ১৯২৩ সালেও লাইব্রেরীর মোট পুস্তক সংখ্যা মাত্র ১৬০২ খানা ছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। নলিনচন্দ্র সরকার ও ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায়ই ১৯২৩ সালের ২০শে জুলাই এক সাধারণ সভায় পণ্ডিত যশোদানন্দন সাধুকে সভাপতি করে আর মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে নূতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় ও সত্যিকারের লাইব্রেরী পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হয় বলা চলে। সে সময় পরিমলচন্দ্র আচার্য, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি একদল যুবক কর্মী লাইব্রেরীর উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্নবান হন।

এ সময় থেকে লাইব্রেরীর দ্রুত উন্নতি হতে থাকে ও স্কুলঘরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

১৯২৮ সালে লাইব্রেরীর প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবের আয়োজন করা হয় রসরাজ অমৃতলাল বসুর পৌরোহিত্যে। সে উৎসব সভায় বালি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মনোমোহন মুখোপাধ্যায় ও পোস্তার রাজা কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর জন্যে এক আবেদন প্রচার করা হলো আর যেখানে বর্তমান লাইব্রেরীগৃহ অবস্থিত সেই জমিটুকু মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে লাইব্রেরীর গৃহ নির্মাণের জন্য দান করতে অনুরোধ জানান হ'লো চেয়ারম্যান মনোমোহন মুখোপাধ্যায়কে। গৃহ নির্মাণ তহবিল সেদিনই খোলা হলো। সেই তহবিলে কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় দিলেন ৫০৲ টাকা ও মনোমোহনবাবু দিলেন ২৫৲ টাকা। এ ছাড়া সভায় উপস্থিত জনসাধারণের নিকট থেকেও তহবিলে আরো কিছু অর্থ সংগৃহীত হলো। মনোমোহন মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী গৃহের জমির জন্য চেষ্টা করে দেখবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন সেদিন। তারপর ১৯৩১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর বালি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নলিনচন্দ্র সরকার বর্তমানে লাইব্রেরীগৃহ যে জমির উপর অবস্থিত সেই ৩ কাঠা ১৩ ছটাক জমি রেজিষ্টারী দানপত্রে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষকে দেন। সেই জমির উপর ১৯৩২ সালে লাইব্রেরীর দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়ের পৌরোহিত্যে ও ৺সনৎকুমার কোলের আগ্রহাতিশয্যে ১৯৩৯ সালে সরস্বতী পূজা ও সেই সঙ্গে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় আড়ম্বরের সহিত।

কিন্তু গৃহ নির্মাণের জন্য মোটা টাকার প্রয়োজন। লাইব্রেরীর জমা তহবিল থেকে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর কিছু টাকা গৃহ নির্মাণ তহবিলে দিতে লাগলেন, রামকৃষ্ণ মেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ভিক্ষা করে কিছু টাকা সংগৃহীত হ'ল, কয়েক দফায় মিউনিসিপ্যালিটি কিছু টাকা দিলেন, আর জনসাধারণের কাছ থেকেও কিছু টাকা পাওয়া গেল। এইরূপে ১৯৩৭-৩৮ সালে সর্বমোট গৃহনির্মাণ তহবিলে টাকার পরিমাণ দাঁড়ালো ৬৫৯৷৷০ আনা। ১৯৩৯-৪০ সালে অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় "রেডিও তহবিলের" জমা ৬৮৷৷০ আনাও গৃহ-নির্মাণ তহবিলে যোগ করা হলো। তারপর 'বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হ'ল লালাবাবু সায়ার রোডের লাইব্রেরীর নিজস্ব জমিতে ১৯৪১ সালের ৪ঠা মে রবিবার দিনে। ভিত্তিপ্রস্তর

স্থাপন করলেন বালি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় আর সে উৎসবের পৌরোহিত্য করলেন নলিনচন্দ্র সরকার। গৃহনির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়ে যুদ্ধের জন্য আসবাবপত্র দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৯৪৫ সালে আবার নূতন করে গৃহ নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। এ সময়ে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এজন্যে ১০০০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া যায়, "সাহায্য রজনী"র অভিনয় করে "বান্ধব নাট্য সমাজ" লাইব্রেরীকে ১২০০৲ টাকা সংগ্রহ করে দেন আর বাকি টাকা পাওয়া যায় জনসাধারণের বদান্যতায়। পশ্চিম-দিকের দালান শেষ হলে স্কুল গৃহ থেকে লাইব্রেরী নিজস্ব বাড়ীতে উঠে আসে ও লাইব্রেরীর দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হয় ১৯৪৬ সালের ৫ই জানুয়ারী বালি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ স্কটকারের সভাপতিত্বে মহাসমারোহে আর ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ সেই উৎসবে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। গৃহ নির্মাণ ব্যাপারে তাঁর, সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষের চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালের ১৭ই জুলাই আইনমতে লাইব্রেরী রেজিষ্টারী করা হয়।

১৯৪৭-৪৮ সালে স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রীঅনাদিনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পিতা যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য পূর্বদিকের পাঠাগার গৃহ নির্মাণের সমস্ত ব্যয় (৬০০০৲ টাকা) বহন করতে প্রতিশ্রুতি দান করেন ও ১৯৪৯ সালে যতীন্দ্র স্মৃতি মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়। সেই সময়ে মাঝের করিডর নির্মাণের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করেন শ্রী বি এম ঘোষ। এখনও সেটার নির্মাণ কার্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, আশা করা যায় জনসাধারণের অকুণ্ঠ বদান্যতায় শীঘ্রই সে কাজ সম্পূর্ণ হবে। গত ১৯৫১-৫২ সালে বালি মিউনিসিপ্যালিটি লাইব্রেরীতে ১০০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেছেন বটে, তবে তার সে টাকা এখনও পাওয়া যায় নি। পুস্তক ও আসবাবপত্র কেনবার জন্য বর্তমান বৎসরে ৭০০৲ টাকার অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে সরকারী সামাজিক শিক্ষা পরিকল্পনা খাতে। গত নভেম্বর থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরী-য়ান ডাঃ বি এম কেশবনের তত্ত্বাবধানে 'বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী'র পুনর্গঠনের

কাজ চলেছে। এ ছাড়া শীঘ্রই কিশোর বিভাগ খোলবার ও বয়স্ক শিক্ষা পরিকল্পনা কার্যকরী করবার চেষ্টা চলেছে লাইব্রেরীতে।

লাইব্রেরীর বর্তমান উৎসব অনুষ্ঠানের ভেতর রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নেতাজী ও মহাত্মাজীর জন্মোৎসব, সরস্বতী পূজা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতাই প্রধান। এ বছরের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এছাড়া রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রবোধ সান্যাল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী, নরেন দেব প্রভৃতি সাহিত্যরসিকেরা লাইব্রেরীর বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। সর্বসাধারণের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা আছে লাইব্রেরীর পাঠাগারে। পাঠাগারে বর্তমানে ৫ খানি দৈনিক ও ২১ খানি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে।

বর্তমানে লাইব্রেরীর আজীবন সদস্যের চাঁদা ১০০৲ টাকা। সাধারণ সদস্যদের দুইটি শ্রেণী। ১ম ও ২য় শ্রেণী হিসেবে তাঁদের প্রবেশমূল্য এক টাকা ও আট আনা, জমা চার টাকা ও দু'টাকা, মাসিক চাঁদা এক টাকা ও আট আনা আর বই নেবার যোগ্যতা একসঙ্গে দু'খানা ও এক খানা। লাইব্রেরীর বর্তমান সর্বমোট পুস্তক সংখ্যা ৬৮৪৩। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বহু হাতে লেখা পুঁথি রক্ষিত আছে এ লাইব্রেরীতে। দুষ্প্রাপ্য ও রেফারেন্সের বই-এর ভেতর শব্দকল্পদ্রুম ৪ খণ্ড, বিশ্বকোষ ২৪ খণ্ড, স্কটের উয়েভারলি সিরিজ মূল, বাঙ্গালীর ইতিহাস, তন্ত্রসার ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

'বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী'র বর্তমান সভাপতি শ্রীঅনাদিনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীঅজিতকুমার মজুমদার আর শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান।

[৬-১-৫৩]

রামকৃষ্ণপুর সংসদ

'রামকৃষ্ণপুর সংসদ' স্থাপিত হয় ইংরেজী উনিশ শ' সালে। গত ১৯৫০ সালের ১০ই, ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ছাপানো রিপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠার দু' তিন লাইন থেকে ১৯০০ সালের হাওড়ার সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার স্পষ্ট হদিস পাওয়া যাবে। এখানে তা' তুলে দিচ্ছি—"তখনকার দিনে এই সহরে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল বিরল। সমগ্র হাওড়ায় মাত্র চারটি গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল স্তিমিত দীপের শিখার মতোই। কাজেই এই সংসদ হাওড়ার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে একটি নূতন পৃষ্ঠা রচনার গৌরব লাভ করেছিল।"—এ কথাগুলো কতো সত্য, বর্তমান রামকৃষ্ণপুর সংসদের দিকে তাকালেই সেটা বুঝতে পারা যায়। গত অর্ধশতাব্দী ধরে হাওড়ার সাংস্কৃতিক জীবনে 'রামকৃষ্ণপুর সংসদ' যে ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে, আর যাই হোক, সেটা তুচ্ছ করবার মতো যে নয়, এ ঠিক। 'রামকৃষ্ণপুর সংসদে'র প্রতীক হ'ল "তমসো মা জ্যোতির্গময়" আর অন্ধকারে আলো বিতরণের কাজে যে তা' কার্পণ্য করে নি, নিঃসন্দেহেই সেটা বলা চলে। তাদের প্রতীক-প্রার্থনা সফলতার পথেই এগিয়ে চলেছে।

রামকৃষ্ণপুরের কৃতী সন্তান নৃসিংহচন্দ্র বসু। "নৃসিংহ স্মৃতি-মন্দির"—সংসদ ভবনের এ নামকরণ করা হয়েছে তাঁরই নামে। নৃসিংহচন্দ্র বসুর প্রেরণায় ও মহানুভবতায়ই এ সংসদের প্রতিষ্ঠা। তাঁরই বাসগৃহের একটি কক্ষে এর প্রথম সূচনা। সংসদ প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন ইন্দুভূষণ ঘোষ, অতুলচন্দ্র সিংহ, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র মল্লিক, হৃদয়রঞ্জন খাঁ, চারুচন্দ্র দত্ত ও শিশিরকুমার মৈত্র প্রমুখ বিশিষ্ট পুরুষেরা। এ প্রতিষ্ঠান প্রথম আরম্ভ হয় "রামকৃষ্ণপুর লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রেণ্ডস সেঞ্চুরী ক্লাব" নাম নিয়ে। নামের থেকেই বোঝা যায় যে এর উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের দেহ ও মনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান। গোড়ায় চারটি মাত্র আলমারি ও দু' এক শ' পুস্তক

সংগ্রহের অকিঞ্চিৎকর সম্বল নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। দেখতে দেখতে এর কর্ম-পরিধি বেড়ে চললো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যোগ দিলেন এসে কর্মচঞ্চল তরুণের দল। প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য যেন নিজেদের উৎসর্গ করে দিলেন তাঁরা, শাখা-প্রশাখায় বেড়ে চললো সংসদের কার্যকলাপ। এঁদের ভেতর ছিলেন চারুচন্দ্র সিংহ, হৃষীকেশ মিত্র, সতীশচন্দ্র বসুমল্লিক, বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত (বর্তমান সভাপতি), কানাইলাল, দত্ত, আশুতোষ বসু, (বর্তমান সহ-সভাপতি), তারাপদ বসু, জিতেন্দ্রনাথ সরকার, কালোবরণ ঘোষ প্রভৃতি যুবকেরা। এ সময়ে প্রায় বৎসরাধিককাল লাইব্রেরী ও ক্লাব অবস্থিত ছিল স্বদেশী ষ্টোর্সে ও প্রসন্নকুমার দত্ত মশায়ের বাড়ীতে। সেখান থেকে প্রতিষ্ঠানটি আবার নৃসিংহ দত্তের বাড়ীতে উঠে যায়। তখন পর্যন্ত সাধারণের জন্য অবৈতনিক পাঠাগারের ব্যবস্থা, সভ্যদের ভেতর বই বিলি ও সাময়িক সাহিত্য চর্চার ভেতরেই সংসদের কর্মধারা ছিল সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ।

স্থানীয় পল্লীর বুকে দু' একটি ব্যায়াম সঙ্ঘ ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল তখন। তাতে করে সম্ভব ছিল না কোনটারই পূর্ণাঙ্গ পরিণতির। বঙ্কিমচন্দ্র দত্তের চেষ্টায় ১৯০৭ সালে এই ব্যায়াম সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্যেরা সংসদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন, অবশ্য কয়েকটি সর্তাধীনেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৯১২ সালে স্থানীয় ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ও "ঐক্য-সমাজ" নামক আরো দুটি প্রতিষ্ঠান সংসদের সঙ্গে সংযুক্ত হয় আর এই সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান "রামকৃষ্ণপুর লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রেণ্ডস সেঞ্চুরী ক্লাব" নামেই চলতে থাকে। এই মিলনের ফলে সংসদ-জীবনে এলো কর্ম-প্রবাহের জোয়ার, সভ্য-সংখ্যা বাড়লো, কার্যকলাপও বেড়ে চললো। লাইব্রেরীর সঙ্গে চললো প্রমোদ বিভাগের কাজ পূর্ণোদ্যমে। পল্লীর দুঃস্থদের সাহায্য করতে সংসদ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে খোলা হল "দাতব্য ভাণ্ডার"। সংসদের সভ্য না হয়েও সকলেই যাতে জনসেবার সুযোগ পেতে পারেন, এর জন্যে এর হিসেব রাখবার হ'ল স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আর নাম দেওয়া হ'ল "রামকৃষ্ণপুর দরিদ্র ভাণ্ডার"। এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হ'লেন হাওড়া জেলার গৌরব চারুচন্দ্র সিংহ আর বঙ্কিম-চন্দ্র দত্ত হলেন এর সম্পাদক। চারুচন্দ্র সিংহ তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত

সংসদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁর উপদেশ ও অকুণ্ঠ দান-দাক্ষিণ্যের বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়।

সংসদের কার্যকলাপ বেড়ে চললো, ফলে স্থানাভাব দেখা দিল লাইব্রেরী ঘরে। নৃসিংহচন্দ্র সিংহ সংসদকে ছেড়ে দিলেন লাইব্রেরীর পাশের ঘর ও সামনের দালান। ১৯১৬ সালে 'রামকৃষ্ণপুর লাইব্রেরী এণ্ড সেঞ্চুরী ক্লাব' আইন মতে রেজিষ্টারি করা হ'ল। ১৯১৭ সালে সংসদকে তুলে নিয়ে যাওয়া হ'ল পরিসর ভাড়াটে বাড়ীতে আর এই মাসিক ভাড়ার ব্যয়বৃদ্ধির নির্বাহের আংশিক ভার গ্রহণ করলেন- নৃসিংহচন্দ্র বসু, প্রসন্নচন্দ্র দত্ত ও চারুচন্দ্র সিংহ। ১৯১১ সালে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি সংসদকে মাসিক ২৫৲ টাকা হিসেবে অর্থসাহায্য করতে আরম্ভ করলেন। ১৯২০ সালে "রামকৃষ্ণপুর বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপিত হ'ল, আর এর জন্যে আহূত এক সাধারণ সভায় স্থির করা হ'ল, "রামকৃষ্ণপুর লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রেণ্ডস সেঞ্চুরী ক্লাবে"র ওপর বিদ্যালয়ের পরিচালনা ভার থাকলেও "দরিদ্র ভাণ্ডারে"র মতো এর জন্যে পৃথক কার্য-নির্বাহক সমিতিও থাকবে আর স্বতন্ত্রভাবে এর আয়ব্যয়ের হিসেবও রাখা হবে। সংসদ এবার একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি কেন্দ্রের রূপ পেলে। গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, প্রমোদ-বিভাগ, বালিকা বিদ্যালয় ও দরিদ্র ভাণ্ডার বিভাগ-সংসদ চললো এই চতুঃশাখায়। সংসদের প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হ'ল আর পৃথক সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। বর্তমানেও সংসদের চারটি বিভাগের কাজই চলছে স্বতন্ত্র কার্যনির্বাহক সমিতির পরিচালনাধীনে। এ ছাড়া সংসদের সাধারণ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকও রয়েছেন।

১৯২০ সালে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই স্থানাভাব দেখা দিল। নৃসিংহবাবু যে দুখানি ঘর ও দালান লাইব্রেরীকে দিয়েছিলেন, তাঁর সুযোগ্য পুত্র আশুতোষ বসু ও তারাপদ বসু বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য সে ঘর দু'খানি ও দালান ছেড়ে দিলেন। ক্রমে সদস্য বৃদ্ধি ও কার্যক্রম বেড়ে চলার ফলে এমন দাঁড়ালো যে, সংসদের নিজস্ব ভবন না হ'লে আর চলে না। গৃহ নির্মাণ কমিটি ও গৃহনির্মাণ তহবিল গঠিত হ'ল। আশুতোষ বসু ও তারাপদ বসু কয়েকটি সর্তে সেই তহবিলে দিলেন ৫০০০৲ হাজার টাকা আর ১১৫০৲ টাকা দিলেন চারুচন্দ্র সিংহ। এ ছাড়া পিতার স্মৃতির উদ্দেশে প্রসন্ন কুমার দত্তের

পুত্রগণ দিলেন পাঁচ শত টাকা আর আরো পাঁচশত টাকা দিলেন সুরেশচন্দ্র ঘোষ, শ্যামসুন্দর ঘোষ ও রামকৃষ্ণ ঘোষ এ তিনজনে। ১৯২২ সালের প্রথমেই সংসদ ভবন নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়ে এক বৎসরের মধ্যেই ১৪,৫০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্মাণকার্য শেষ হয়। চারুচন্দ্র বসু মল্লিক, চারুচন্দ্র দত্ত, হৃষীকেশ মিত্র, সতীশ চন্দ্র বসু মল্লিক, ভূতনাথ মিত্র ও ইঞ্জিনীয়ার পুলিনবিহারী দাসের সমবেত চেষ্টায় ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ বদান্যতায়ই এতো অল্প সময়ের ভেতর সেটা সম্ভব হয়েছিল। জনসাধারণ ও নাগরিকবৃন্দের যাঁরা গৃহনির্মাণকার্যে অর্থ সাহায্য করেছেন তাঁদের অনেকেরই নাম দেওয়ালে প্রোথিত শিলালিপিতে লিখিত রয়েছে। আরম্ভের বাইশ বৎসর পরে এই প্রতিষ্ঠান ১৬টি আলমারি ও ১০০০ গ্রন্থ-সম্পদ নিয়ে নিজস্ব গৃহে এসে প্রবেশ করে।

গৃহ প্রবেশের কয়েক বৎসর মধ্যেই বালিকা বিদ্যালয়টিও সংসদের নিজস্ব ভবনে উঠে আসে ও ১৮০০৲ টাকা ব্যয়ে গৃহের অভ্যন্তরস্থ বারান্দা নির্মিত হয়। এই গৃহ সম্প্রসারণকার্য বিশেষভাবে পঞ্চানন খাঁ, সরলকৃষ্ণ মল্লিক, ধীরেন্দ্রকুমার রায়, গঙ্গাধর খৈতান, শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বদান্যতায়ই সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সমস্ত কার্যে জিতেন্দ্রনাথ সরকারের আপ্রাণ চেষ্টার কথা উল্লেখ করতে হয়, আজো তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। ১৯৩০ সালে সদস্যগণের এক বিশেষ সভায় "রামকৃষ্ণপুর লাইব্রেরী এণ্ড সেঞ্চুরী ক্লাবে"র নব নামকরণ করা হয় "রামকৃষ্ণপুর সংসদ" ও রেজিষ্টার অব সোসাইটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়ে প্রতিষ্ঠান সে নামে চলতে থাকে। দীর্ঘ ৫২ বৎসরে এই সংসদ পরিদর্শন করতে এসেছেন বহু জ্ঞানীগুণী সুধীজন। তাঁদের ভেতর হাওড়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত (১৯২৭-২৮), হেমলতা দেবী (১৯২৫) মিঃ এইচ, এস ই ষ্টিভেন্স (১৯২৮), বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৩১), কালিদাস নাগ (১৯৩২), কুমার মণীন্দ্রদেব রায় (১৯৩৬), রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৯৪০), নীহাররঞ্জন রায় (১৯৪১), ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (১৯৫০) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

সংসদের সমস্ত কার্যনির্বাহের জন্য একটি সাধারণ কাযনির্বাহক সমিতি রয়েছে আর চারটি বিভাগে চলছে এর প্রসারিত কার্যকলাপ। এর প্রমোদ বিভাগ আর দরিদ্র ভাণ্ডার বিভাগ চলেছে সদস্যদের ও জনসাধারণের

বদান্যতায়। বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ১২০০৲ টাকার সরকারী অর্থসাহায্য ও ৭৮১৲ টাকার মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ সাহায্য রয়েছে আর গ্রন্থাগার বিভাগ সরকারী অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ৮০০৲ টাকা ও বর্তমানে মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যের পরিমাণ বার্ষিক ৩৩০৲ টাকা করে। সভ্যেরা সংসদ সদস্য ও গ্রাহক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এককালীন পাঁচ টাকা দিয়ে সংসদ সদস্যের দ্বারা প্রস্তাবিত ও কার্যনির্বাহক সমিতির দ্বারা অনুমোদিত হ'লেই তবে সংসদ সদস্য হ'তে পারা যায়। আর গ্রাহকেরা নির্ধারিত টাকা জমা দিয়ে ও চাঁদা দিয়ে লাইব্রেরী থেকে বই নিতে পারেন। সদস্য ও গ্রাহকেরা প্রথম, দ্বিতীয় ও সাধারণ এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সংসদ গৃহের সুপ্রশস্ত হল ঘরে পাঠাগার। পাঠাগার সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত, সেখানে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের বিশেষ সুব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে পাঠাগারে পাঁচটি দৈনিক, দুটি সাপ্তাহিক, একখানি পাক্ষিক ও ছয়টি মাসিক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। বর্তমানে সংসদ সদস্যের সংখ্যা ১৩৪, আর গ্রাহক সংখ্যা ৯৮ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ২২০।

সংসদ গ্রন্থাগারে বহু পুরাতন দুর্লভ পুস্তক ও দলিলপত্র রয়েছে। লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তকসংখ্যা সর্বমোট ১১,৬৩৪; প্রায় ৪০০ খানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রয়েছে এর ভেতর। 'রামকৃষ্ণপুর সংসদে'র গ্রন্থ সংগ্রহে এমন একটা পরিচ্ছন্ন সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়, সচরাচর যেমনটি দেখতে পাওয়া যায় না। তাতে করে সংসদ বিদ্বজ্জনের তীর্থে পরিণত হয়েছে।

রামকৃষ্ণপুর সংসদের বর্তমান সাধারণ সভাপতি শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুবিমল দে সরকার আর সংসদের বর্তমানের লাইব্রেরীয়ান হ'লেন শ্রীঅনিলকুমার বসু।

[১০-১২-৫২]

মাজু পাবলিক লাইব্রেরী

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে মাজু গ্রন্থাগারের উদ্যোগে "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে"র অষ্টাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'মাজু পাবলিক লাইব্রেরী' গৃহে। অনুষ্ঠানের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস), বেদান্ততীর্থ। মাজু গ্রামেরই বাসিন্দা তিনি। সেই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট, সাহিত্য শাখায় সভাপতি ছিলেন ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ ডি-এল আর ইতিহাস শাখায় সভাপতি হয়েছিলেন ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ পি-এইচ-ডি। 'মাজু পাবলিক লাইব্রেরী'র উদ্যোগে সমারোহের সহিত সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল।

মাজু প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম, কলকাতা থেকে ২০ মাইল দূরে হাওড়া জেলায় অবস্থিত। বহু নামকরা শিক্ষিত লোক জন্মেছেন এখানে। এক সময়ে এখানকার বসু পরিবার, দত্ত পরিবার আর মিত্র পরিবারের খ্যাতি ছিল ধনী হিসেবে। সহরাভিমুখী সভ্যতা আজ এঁদের অনেককেই টেনে নিয়ে গেছে সহরের আশেপাশে। বসু পরিবারের কেউ কেউ আজো গ্রামে আছেন বটে, কিন্তু সহরের টানে গ্রামের সে শ্রী আজ আর নেই। গ্রামের পূর্বদিকে দামোদর নদের শাখা 'কানানদী', উত্তর থেকে দক্ষিণে সোজা চলে গেছে। এক সময় পণ্যসম্ভার নিয়ে এর বুকে পাল উড়িয়ে যেতো বড় বড় নৌকা—সংস্কারাভাবে আজ মজে গেছে, দিনে দিনে ভরাট হয়ে শুকিয়ে আসছে এর স্রোতধারা। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ডিষ্টি ক্ট বোর্ডের বাঁধের উপর দিয়ে চলে গেছে হাওড়া-আমতা রেল লাইন। তার পশ্চিমে বিশাল শস্যক্ষেত্র 'কাঁহুয়া মাঠ'। সমস্ত গ্রামের খাদ্য যুগিয়ে আসছে তা' বহুদিন। বর্ষার জলের বন্যায় মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় আজ জলনিকাশের সুবিধে নেই বলে—ফলানো মাঠভরা সবুজ ধান্যক্ষেত্র নষ্ট হয়ে যায় চোখের ওপর, ঘরে ফসল তোলবার সময় পায় না কৃষকেরা। তবু আজো মাজু উন্নত গ্রাম। বাংলা দেশের নাড়ীতে অলক্ষ্যে প্রবাহিত শিক্ষা-সংস্কৃতির যে ধারা বয়ে চলেছে তার ছাপ ছড়িয়ে আছে দেশের সর্বত্র প্রত্যেকটি

মানুষের উপর। একটি এলাকায় ছড়িয়ে থাকা সে ছাপ কেন্দ্রীভূত হয়ে রূপ পেয়েছে এসে 'মাজু পাবলিক লাইব্রেরী'র ভেতর। তাইতেই এ লাইব্রেরীর গুরুত্ব এতো বেশী।

১৯০২ সালের সালের ১লা অক্টোবর 'মাজু পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠান মাজুতে গড়ে তুলতে হবে যেখানে সর্বসাধারণ বসে পুস্তক আর পত্র-পত্রিকা পড়তে পারে, মেটাতে হবে জনসাধারণের এ অভাব—প্রথম একথা এসেছিল অক্ষয়কুমার দাস নামক একজন যুবকের মাথায়। তাঁকেই বলা চলে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল মজুমদার ও বিপিনবিহারী দাস—এঁরা ছিলেন অক্ষয়কুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন সবাই। যুবকদের চেষ্টায় আর আগ্রহে ১৯০২ সালে ১লা অক্টোবর মাটির দেয়ালঘেরা এক খড়ো ঘরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'মাজু পাবলিক লাইব্রেরী'—একটি আলমারিতে মাত্র পঁচিশখানা বাংলা বই-এর সম্বল নিয়ে এর যাত্রা হ'ল সুরু। প্রতিষ্ঠার পর সাহায্য আর সহযোগিতা পাওয়া গেল জনসাধারণের, যোগ দিলেন এসে গ্রামের শিক্ষিত সম্প্রদায়—নারায়ণচন্দ্র মজুমদার, রণবীর চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ পাঠক, ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করলেন লাইব্রেরীর উন্নতি প্রচেষ্টায়। সকলের সমবেত চেষ্টায় লাইব্রেরীর কার্যকলাপ বাড়তে লাগলো, পুস্তক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রস্তুত করানো হ'ল আরেকটি আলমারি। 'মাজু পাবলিক লাইব্রেরী'র সভ্যসংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে চললো।

প্রথম থেকেই লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানের কাজ করে আসছিলেন অক্ষয়কুমার দাস। সাংসারিক অবস্থা বিপর্যয়ে ১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একাজ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সে সময় নূতন কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয় আর লাইব্রেরীর পরিচালনভার ন্যস্ত হয় এই নূতন কমিটির উপর। এ সময়ের সম্পাদক ছিলেন রণবীর চট্টোপাধ্যায়। খড়ো ঘরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয় তাঁর বৈঠকখানা ঘরে। এখান থেকে বইপত্র চুরি হওয়ায় ১৯০৫ সালে লাইব্রেরীর নিরাপত্তা বিধানের জন্যে কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অম্বুজাচরণ মজুমদার, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রনাথ সোমকে নিয়ে "বোর্ড অব

ট্রাষ্টিজ গঠিত হয় ও নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় রণধীর চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি আর নারায়ণচন্দ্র মজুমদারকে সম্পাদক করে। এ সময়ে যে শুধু লাইব্রেরী স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হয় এমন নহে, লাইব্রেরীর নিজস্ব ইমারত নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে অনুভূত হ'তে থাকে। ফলে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে এক সাধারণ সভায় লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয় ও "গৃহ নির্মাণ তহবিল" খোলা হয়। ইতিমধ্যে লাইব্রেরীকে একটি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করবার চেষ্টা চলতে থাকে। অবশেষে অনুজাচরণ মজুমদার তাঁর বৈঠকখানা ঘর ও দালান বিনা ভাড়ায় লাইব্রেরীর ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দেন ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে। সে সময় লাইব্রেরীর ইংরেজী ও বাংলা বই-এর সংখ্যা ছিল ১২৬১ আর সভ্যসংখ্যা ছিল ১৩১। ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ তহবিলে সংগৃহীত হয়েছিল মাত্র ৬৭॥০ টাকা। সেই সময় থেকে লাইব্রেরীর কার্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৯ সালে স্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজী ও বাংলা রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ও লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে রৌপ্যপদক ও নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় প্রতিযোগীদের প্রথম স্থান অধিকারী তিন জনকে। এ ছাড়া ১৯০৯ সালের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন বসুর জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সমারোহের সহিত লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে আর সে উৎসব অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

জনসাধারণের বদান্যতায় ক্রমে 'গৃহ নির্মাণ তহবিল' পুষ্ট হ'তে থাকে। ১৯১০ সালে লাইব্রেরীর ইমারতের জন্য ৬৩০০০ ইট পোড়ান হয়। ঐ সময়ে হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি সি প্যাটারসন, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বার্ড এণ্ড কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার মিঃ ডব্লিউ এ আয়রণ-সাইড, উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ছিলেন লাইব্রেরীর সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক। সার তারকনাথ পালিত কে-টি মহাশয়ের পরামর্শে ১৯১১ সালে ২১শে সেপ্টেম্বর গ্রন্থাগারটি রেজিষ্টারী করা হয়। সার তারকনাথ পালিত এ সময় রেজিষ্টারীর খরচ বাবদ ১০০৲ টাকা অর্থসাহায্য করেছিলেন। গৃহ নির্মাণ তহবিলে মিঃ আয়রণসাইড

১০০০৲ টাকা দিয়েছিলেন আর ৩০০৲ টাকা অর্থসাহায্য করেছিলেন উত্তরপাড়ার রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁদের মৃত্যুর পর লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে শোকসভার আয়োজন করা হয়।

লাইব্রেরী গৃহ নির্মাণের জন্যে টাকা ও জমি এ দুয়েরই প্রয়োজন। এর জন্যে মাজুগ্রামের রামলাল মজুমদার, হরলাল মজুমদার, কালীপদ মজুমদার ও অমূল্যচরণ মজুমদার লাইব্রেরীকে পাঁচ কাঠা দুই ছটাক জমি দান করেন ও দানপত্র রেজিষ্টারী করে দেন। সেই জমির ওপর হাওড়ার তখনকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি সি প্যাটারসন কর্তৃক লাইব্রেরী গৃহের ইমারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯১৩ সালের ১৮ই জুন তারিখে। সে উপলক্ষে মাজু গ্রামে আমন্ত্রিত হয়ে সমবেত হয়েছিলেন হাওড়া ও কলকাতায় গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি আর অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয়েছিল সে ভিত্তিস্থাপন উৎসব। সুদীর্ঘ আট বৎসর লেগেছিল গৃহ নির্মাণকার্য সম্পন্ন হ'তে। ১৯২১ সালে গৃহ নির্মাণকার্য শেষ হ'লে লাইব্রেরী নিজস্ব বাড়ীতে উঠে আসে। সুপরিসর লাইব্রেরী গৃহ ছাড়া পাঠাগারের জন্যেও লাইব্রেরীর অফিসের জন্যে আরো দুটি ঘর পর পর নির্মিত হয়। কারো নাম না করে একথাই বলা ভালো যে, গ্রামবাসীদের ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় আর সহযোগিতায়ই গৃহ নির্মাণকার্য সুসম্পন্ন হতে পেরেছিল, এর কৃতিত্ব সকলেরই সমান প্রাপ্য।

কলকাতার ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার মিঃ ডব্লিউ ম্যাক এ হুইন এক সময়ে মাজু গ্রামে বেড়াতে আসেন। লাইব্রেরী দেখে খুসী হয়ে তিনি লাইব্রেরীতে দান করেন ২৪ খণ্ড 'হিষ্টরিয়ানস হিষ্টরি অব দি ওয়ার্ল্ড' নামক ৩০০৲ টাকা মূল্যের ইতিহাসগ্রন্থ। এছাড়া "ঘণ্টেশ্বরী স্মৃতি" আলমারির দাতা ঘণ্টেশ্বরী দেবীর পুত্র হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর শ্রীহরলাল মজুমদারের নিঃস্বার্থ সেবার কথাও এ প্রসঙ্গে বলতে হয়। পুস্তক ও আসবাবপত্রাদি ক্রয়ের জন্য বর্তমান বৎসরে ৩৫০৲ টাকার সরকারী সাহায্য পাওয়া গেছে আর হাওড়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বছর বছর গ্রন্থাগারকে ৩০৲ থেকে ৫০৲ টাকা করে অর্থ সাহায্য করে চলেছেন। পঞ্চাশ টাকা বা সেই মূল্যের আসবাবপত্র ও পুস্তকাদি দিলে লাইব্রেরীর আজীবন সদস্য হ'তে পারা যায়। সাধারণ সদস্যের মাসিক দেয় চাঁদার হার ছয় আনা আর জমা এক

টাকা। ছাত্র সদস্যদের কোন জমা দিতে হয় না। তিন আনা করে চাঁদা দিতে হয় মাত্র। গ্রাহকদের একসঙ্গে একখানার বেশী বই দেওয়া হয় না।

অমূল্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তকপত্র বাংলা দেশের নানা জায়গায় কিভাবে ছড়িয়ে আছে, 'মাজু পাবলিক লাইব্রেরী'তে গেলে সেকথা বুঝতে পারা যায়। পাঠাগারে পুস্তক ও পত্রপত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে পাঠাগারে ৬ খানা মাসিক, ৩ খানা দৈনিক ও ২ খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তকসংখ্যা পাঁচ হাজারের উপর। সকল বিভাগেরই দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। বিশেষভাবে এ লাইব্রেরীর ইতিহাসের সংগ্রহ দেখবার মতো। হার্মচওয়ার্থের 'হিষ্টরি অব দি ওয়ার্ল্ড' ১৫ খণ্ড— রেভারিজের 'কমপ্রিহেনসিভ হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া' ৩ খণ্ড, রবার্ট আর্মির 'হিষ্টরি অব দি মিলিটারি ট্রানজেকসন', রিচার্ড লিডেকেনের 'রয়েল নেচারেল হিষ্টরি' ৬ খণ্ড, লেনসনস 'এনসাইক্লোপিডিয়া' ২৫ খণ্ড, হার্মচওয়ার্থের 'পপুলার সায়েন্স' ৯ খণ্ড প্রভৃতি অসংখ্য ইতিহাস ও রেফারেন্সের বই এ লাইব্রেরীতে রয়েছে। এছাড়া লাইব্রেরীর জীবনী সংগ্রহও মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য। পুরাণ, সাহিত্য, সংহিতা, দর্শন, সমালোচনা প্রভৃতির এমন সমন্বয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। এক কথায় অবাক হ'তে হয় এ লাইব্রেরীর গ্রন্থ-সম্পদ দেখে।

'মাজু পাবলিক লাইব্রেরীর' বর্তমান সভাপতি শ্রীযুগলকিশোর চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীনিধুভূষণ চক্রবর্তী আর কমলাকান্ত দাস হ'লেন লাইব্রেরীর বর্তমান লাইব্রেরীয়ান। 'মাজু পাবলিক লাইব্রেরী'র মতো লাইব্রেরী একমাত্র বাংলা দেশের গ্রামে থাকাই সম্ভব। এর তুলনা অন্যত্র ক্বচিৎ মিলতে পারে।

[২৪-১২-৫২]

ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী

'ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী' হাওড়ার ১১নং চার্চ রোডে লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীতে অবস্থিত। ১৯১১ সালের কথা। বিদেশী শাসন চেপে বসেছে দেশের বুকের ওপর, বিশেষ করে বাংলা দেশের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে রাজরোষের বন্যা। শাসক সম্প্রদায়ের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রয়েছে প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর—হয়রাণির অন্ত নেই, তাদের চোখে প্রতিষ্ঠান মানেই বোমামারার বা রাজদ্রোহের আড্ডা, পুলিসের অত্যাচার নেমে আসছে নিত্য নূতন পথ ধরে। ইতিহাস যাঁদের জানা আছে, সহজেই তাঁরা বুঝতে পারবেন কিরূপ অসম্ভব ছিল সে সময়ের শাসকদের সন্তুষ্ট না করে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। লাইব্রেরী ও সাহিত্য সম্মিলন গড়ে তুলতে হবে, হাওড়ায় জনসাধারণের 'সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আকর্ষণ, আর সাহিত্যসেবীর সাহিত্য সেবাব্রতে উৎসাহ দানে'র জন্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হ'বে। ১৯১১ সালের ১৯শে আগষ্ট পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রমুখ মণীষিগণ ও হাওড়ার বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহীরা এক সভায় সমবেত হ'লেন। সে সভায় একটি সাহিত্য-সভা ও একটি লাইব্রেরী স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হ'ল। ঠিক হ'ল সাহিত্য-সভাকে এশিয়াটিক সোসাইটি ও লাইব্রেরীকে ইম্পিরিয়াল (বর্তমানে ন্যাশনাল) লাইব্রেরীর আদর্শে গড়ে তোলা হ'বে।

কিন্তু শাসক সম্প্রদায়ের সাহায্য ছাড়া কোন বড় পরিকল্পনাই কার্যকরী করবার উপায় ছিল না তখন। এ সত্য এর উদ্যোক্তারা জানতেন, শাসকদের সন্তুষ্ট করতেই হ'বে। 'ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী' নামের ভেতর দিয়েও এ উদ্দেশ্যটিই আসলে রূপ পেয়েছে। সার উইলিয়ম ডিউক ছিলেন হাওড়ার সে সময়ের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরবর্তীকালে অস্থায়ী লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর। লাইব্রেরীর গঠনতন্ত্রেও স্থায়ী চিহ্ন আছে শাসকদের সন্তুষ্ট করবার। হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সব সময়ে লাইব্রেরীর সভাপতি হবেন, এমন বিধান রয়েছে গঠনতন্ত্রে।

ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী

উদ্যোক্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে তিন বছর ধরে আলাপ-আলোচনা চললো জেলা শাসকদের। শাসক সম্প্রদায় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। সরকারী খাসমহল থেকে নয় কাঠা জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হ'ল ইমারত তৈরীর জন্যে। এ প্রসঙ্গে উত্তরপাড়ার রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের বদান্যতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য এককালীন ২৫,০০০৲ টাকা দান করলেন। দাতার ইচ্ছানুযায়ী ১০,০০০৲ টাকা লাইব্রেরীর গৃহ নির্মাণের জন্যে ও ৫,০০০৲ টাকা পুস্তক সংগ্রহ করতে ব্যয় করা হ'ল আর অবশিষ্ট ১০,০০০৲ টাকা জমা রাখা হ'ল লাইব্রেরীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে। লাইব্রেরী গৃহের পরিকল্পনা তৈরী করলেন বিখ্যাত স্থপতি মার্টিন এণ্ড কোম্পানী। কাজ আরম্ভ হ'ল, লাইব্রেরী গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করলেন হাওড়ার তখনকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সার উইলিয়ম ডিউক ১৯১৩ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখে। আজো বিদ্যমান আছে সে অনুষ্ঠানের স্মারক প্রস্তরফলকটি। গৃহ-নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লাইব্রেরী ও সাহিত্য সম্মিলনের কাজ আরম্ভ হ'ল। গোড়ার দিকে এ লাইব্রেরীর নাম ছিল 'ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরী', এর সদস্যদের কোন চাঁদা দিতে হ'ত না। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি একেবারে আরম্ভের থেকেই লাইব্রেরী গৃহের ট্যাক্স মকুব করে দিয়েছেন আর অর্থ সাহায্য করে চলেছেন লাইব্রেরীতে। বর্তমানে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি লাইব্রেরীকে বার্ষিক ৪২০৲ টাকা করে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন।

তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে লাইব্রেরী চলতে লাগলো। সেগুলো হ'ল (ক) লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালন, (খ) সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক পাঠে উৎসাহ দান আর ছাত্রদের জন্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতার আয়োজন ও (গ) হাওড়া সাহিত্য সম্মিলনকে সর্বপ্রকারের সাহায্য। আজ পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্য নিয়েই 'ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী' চলছে। এই লাইব্রেরীর গঠনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করবার মতো। আগেই বলা হয়েছে, লাইব্রেরীর সভাপতি হবেন সব সময়ে হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। কার্যকরী সমিতির ষোল জন সদস্যের ৪ জন নেওয়া হবে পুরাতন সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে, ৪ জন থাকবেন সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিনিধি, ২ জন

মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড কমিশনার আর কমিশনার নন মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত এমন প্রতিনিধি দুইজন,—এই তেরো জন সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত ২ জন শিক্ষক আর রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবার থেকে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি—এই ষোল জন সদস্য নিয়ে এ লাইব্রেরীর কর্মপরিষদ গঠিত হবে সব সময়েই। এই কর্মপরিষদ লাইব্রেরীর একজন অবৈতনিক সম্পাদক আর অনধিক দুইজন অবৈতনিক সহকারী সম্পাদককে নির্বাচন করবেন (১৯৪৯ সালের ১১ই জুনের কর্মপরিষদের সভায় গৃহীত)। এ গঠনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সত্যি লক্ষ্য করবার বিষয়। একেবারে গোড়ার দিক থেকেই এটা প্রায় একইভাবে আছে। এরূপে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকাল তিন বৎসর। তিন বৎসর পর পর লাইব্রেরীর নূতন নির্বাচন হয় ও কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়ে থাকে।

আরম্ভের থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত 'ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী' ও সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক ছিলেন দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়। তাঁকে ঘিরেই এ লাইব্রেরী হাওড়ার বিদ্যোৎসাহীদের মিলন-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। হাওড়া সাহিত্য সম্মিলনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ মহাশয়ের "হিন্দুদর্শন" ও মহামহোপাধ্যায় ডক্টর ভাগবতকুমার শাস্ত্রীর "বৈষ্ণব দর্শন" নামক পুস্তক দু'খানি। দুর্গাদাস লাহিড়ীর পর লাইব্রেরীর সম্পাদক হন বীরেশচন্দ্র দাস। তাঁর আমলে পুস্তক সংগ্রহের দিক দিয়ে লাইব্রেরীর দ্রুত উন্নতি হ'তে থাকে। তাঁর পরে লাইব্রেরী পরিচালনার ভার পড়ে শ্রীনির্মলাচরণ দাসের উপর। ১৯৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় লাইব্রেরী গৃহ সরকারের দখলে চলে যায় ও সেখানে সৈন্য রাখা হয়। তাতে করে লাইব্রেরীর কাগজপত্রও নষ্ট হয়েছিল প্রচুর পরিমাণেই।

১৯৪৯ সালে লাইব্রেরীর কাজ আবার চলতে আরম্ভ করে। সে সময় 'ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী'র সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীনারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সহকারী সম্পাদক শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস আর লাইব্রেরীয়ান শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়ের মিলিত চেষ্টায় লাইব্রেরীর কাজ আবার আগের মতই চলতে থাকে। গত ১৯৫১ সালে এ লাইব্রেরীর সম্পাদক হয়েছেন হাওড়ার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। গত বৎসরের হাওড়ার গ্রন্থাগার আন্দোলনের

প্রথম মিলিত সভা এ লাইব্রেরী হলেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর গঠিত হয়েছিল 'হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ' শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যকেই সভাপতি করে। 'হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘে'র কার্যালয় 'ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী'তেই অবস্থিত আর বর্তমানে জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৭০টি পাঠাগার এই সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত রয়েছে। লাইব্রেরী ও সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোগে বহু সাহিত্য-সভার আয়োজন করা হয়েছে আর বহুদিন আগে তাতে সভাপতিত্ব করে গেছেন সার আশুতোষ। কুমার মুণীন্দ্রদেব রায়, অনুরূপা দেবী, ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সার ইউ এন ব্রহ্মচারী প্রমুখ অনেক জ্ঞানীগুণী এসেছেন এ লাইব্রেরীতে। এ সমস্ত সাহিত্য সভার আয়োজন লাইব্রেরীতে বর্তমানেও করা হয়ে থাকে আর তাতে নিয়ে আসা হয় বিখ্যাত মণীষীদের। লাইব্রেরীর নীচের তলার সুপরিসর হল ঘরে বর্তমানে প্রতি রবিবারে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক হয়ে থাকে।

পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুবন্দোবস্ত রয়েছে 'ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী'র পাঠাগারে। বর্তমানে পাঠাগারে প্রায় সবকটা দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাই রাখা হয়। লাইব্রেরীর সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা, প্রবেশমূল্য তিন টাকা আর জমা পাঁচ টাকা করে। ছাত্র সভ্যদের বার্ষিক চাঁদা দুই টাকা মাত্র। বর্তমানে এ লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৬৩৫০। 'ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী'র ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজী বই-এর সংগ্রহ সত্যি ভালো। এছাড়া গবেষণাকার্যের উপযোগী অনেক পুরাতন দুষ্প্রাপ্য ও রেফারেন্সের বই রয়েছে এ লাইব্রেরীতে। তার ভেতর মনীষী ম্যাক্সমুলারের 'সেক্রেড বুকস অব দি ইষ্ট' ২৭ খণ্ড ও "ষ্টোরি অব দি নেশনস' ৬৩ খণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য রেফারেন্সের বই-এর ভেতর এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ২৯ খণ্ড, ওমিজ ফ্রেগমেন্টস (১৮০৫), রবার্ট ক্লাইভএর জীবনী (১৭৮৫), হিষ্টরী অব দি নিয়ার ইষ্ট (১৭৫৭), হলওয়েস হিন্দুস্থান (১৭৬৪), বিশ্বকোষ ২২ খণ্ড, প্রাচীন ঋগ্বেদ সংহিতা ৬ খণ্ড প্রভৃতির নাম করা যায়। বহু তথ্যপূর্ণ দলিলপত্র 'ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী'তে রয়েছে। হাওড়া সাহিত্য সম্মিলনের সভ্যদের ও বিশেষ করে গবেষণাকার্যে রত ব্যক্তিদের লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন।

'ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী'র বর্তমান সম্পাদক অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সহকারী সম্পাদক শ্রীখগেশচন্দ্র দাস ও শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় লাইব্রেরীর বর্তমানের লাইব্রেরীয়ান। হাওড়ার বর্তমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হ'লেন লাইব্রেরীর বর্তমানের সভাপতি।

[২৫-১১-৫২]

ব্যাঁটরা পারিজাত সমাজ

'ব্যাঁটরা পারিজাত সমাজে'র উদ্যোগে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ, ১৯৪১ ইং) শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায় ১৫১, নরসিংহ দত্ত রোডে যাদব ব্যাঙ্ক হলে এক সম্বর্ধনা সভায় আয়োজন করা হয়। 'পারিজত সমাজে'র "সংক্রান্তি মিলনের" (সাহিত্য-আসর) সেটা ছিল ২২৬তম বৈঠক। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি। সে সময়ে তিনিই ছিলেন 'পারিজাত সমাজে'র সমাজপতি (সভাপতি)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে তখন, বিশ্ববাসী জনগণ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে আতঙ্কিত প্রতীক্ষায়। সার মন্মথনাথ তাঁর সেদিনের ইংরেজী ভাষণের উপসংহারে যা বলেছিলেন, বাংলায় তার অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়, "আজকের এ উত্তেজনাপূর্ণ অন্ধকার মুহূর্তেও 'পারিজাত সমাজে'র মতো প্রতিষ্ঠানের বেঁচে থাকবার প্রয়োজন আছে।" সত্যি তাই, দুর্দিনেই 'পারিজাত সমাজে'র মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, সার মন্মথনাথের একথা ক'টির ভেতর বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নেই।

১৯১৪ সালের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায় বিশ্ব উত্তেজনা-চঞ্চল। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছে বাঙ্গালার কিশোর ও ও যুবকেরা। একদিকে রয়েছে বিদেশী শাসনের অকথ্য নির্যাতন আর আর অপর দিকে পুলিস আর গুপ্তচরের চোখের উপর মরণকে তুচ্ছ করে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে আর আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বাংলায় তরুণ-তরুণীরা। সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ একদল তরুণ সেদিন গড়ে তুলেছিল 'ব্যাঁটরা পারিজাত সমাজ', আর তার প্রতিষ্ঠাতা চারজনের নাম হ'ল কালীপ্রসন্ন পাইন, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজকুমার দেউটি ও ব্যোমকেশ অধিকারী (বর্তমান প্রধান কর্মসচিব)।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর দীর্ঘ ছুটি মিলেছে। এঁদের বৈঠক বসতো হাওড়ায় সেণ্ট থমাস চার্চের উত্তর দিকের ছোট গেটের সামনে অল্প পরিসর ভূখণ্ডে।

কলকাতা থেকেও অনেকে গিয়ে যোগ দিতেন সে বৈঠকে ; সমবেত হ'তেন কালীপ্রসন্ন পাইন, ইন্দ্রনারায়ণ নন্দী, প্রভাস ঘোষ, নগেন সরকার, অমলা সরকার, বীণা মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) প্রভৃতি। গুপ্তচর বিভাগের চোখ পড়ায় ভ্রাম্যমান করে নিতে হ'ল প্রতিষ্ঠানকে। বৈঠক বসতো কলকাতার কার্জন পার্কে, আর্যনিবাস হোটেলে ও ও সার্পেণ্টাইন লেনে। এতে বিস্তর অসুবিধে দেখা দিল। ফলে মাসিক পাঁচ টাকায় ঘরভাড়া নেওয়া হ'ল ৫নং লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেনে, বর্তমান 'ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী'র দক্ষিণ দিকের বাড়ীতে। তারপর সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ করা হ'ল ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ তারিখে 'ব্যাটরা পারিজাত নাট্যকুঞ্জ' নামে। এর উদ্দেশ্য রইলো শিক্ষাবিস্তার, জনসেবা ও স্বাস্থ্য-চর্চা। আর সভাপতি হ'লেন কলকাতা লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্যামলাল দে। কালীপ্রসন্ন পাইন, ব্যোমকেশ অধিকারী, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ) প্রভৃতি এই কার্যকরী সমিতি গঠন করবেন। 'নাট্যকুঞ্জে'র পাঠাগার ও ব্যায়ামাগারের (কেবল ঠাকুরের আখড়ায়) কাজ চলতে লাগল ও দ্রুত সভ্যসংখ্যা বেড়ে চললো। সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো বিশিষ্ট শিল্পী সমবায়ে নাট্যাভিনয়, মঞ্চস্থ করা হ'ল 'রিজিয়া', 'পরপারে', 'আহুতি' প্রভৃতি নাটক। কার্যকলাপ বেড়ে চললো ক্রমেই।

ইতিমধ্যে সালখিয়ার এক রাজনৈতিক ডাকাতির মামলায় সভাপতি কালীপ্রসন্ন পাইনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল আর পুলিসের নির্যাতন চললো অন্যান্য কর্মীদের উপরও সমানভাবে। পুলিস 'নাট্যকুঞ্জে'র কাগজপত্র হস্তগত করে নিল আর মামলায় জড়িত করতে চাইলো সকলকেই। বিশেষ তদ্বিরের ফলে কর্মিগণ রেহাই পেলেন বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী ঘোষণা করা হ'ল আর প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ব্যোমকেশ অধিকারীকে নিজ গৃহে অন্তরীণ করা হ'ল ৫ বৎসরের জন্য। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে "সিসিলিয়া বাওয়া"র নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠান চালাবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু হাওড়ার জেলা শাসক মিঃ হপকিন্স পৃষ্ঠপোষকতায় অসম্মত হওয়ার এর কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২১ সালের ১লা আগষ্ট (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাজকুমার দেউটির চেষ্টায় ২নং মাকড়দহ ফার্ষ্ট বাই লেনে (বর্তমান ২নং

কেদারনাথ দেউটি লেনে) "ব্যাটরা পারিজাত নাট্য সমাজ" নাম দিয়ে আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে সভাপতি ও ব্যোমকেশ অধিকারীকে সম্পাদক করে নূতন উদ্যমে আবার প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ করা হ'ল। প্রতিষ্ঠানের নূতন গঠনতন্ত্র গৃহীত হ'ল ১৯২১ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখের সাধারণ সভায়। এবার প্রতিষ্ঠানের নূতন নামকরণ করা হ'ল "ব্যাটরা পারিজাত সমাজ" আর সৃষ্টি করা হ'ল গ্রন্থাগার ও সাহিত্য বিভাগ, নাট্য-প্রমোদ বিভাগ, ব্যায়াম বিভাগ ও দরিদ্র ভাণ্ডার বিভাগ—এই চারটি শাখার। নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে সমাজের কাজ অব্যাহতভাবে চলতে লাগলো।

এবার চলল একই সঙ্গে সমাজের চারটি শাখারই বিচিত্র কার্যকলাপ। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংক্রান্তির দিনে ব্রহ্মচারী অনাদি চৈতন্য পারিজাত সমাজের "সংক্রান্তি মিলন" নামক সাহিত্য-সভার উদ্বোধন করেন। এই বৈঠকে ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সত্যনারায়ণ পূজা ও সকলের একত্রে পান-ভোজন এই 'সংক্রান্তি মিলনে'র বিশেষত্ব। এই বৈঠকের অধিবেশন হয় প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে বা সংক্রান্তিতে। বর্তমানে এ বৈঠকের সংখ্যা হ'ল ৩৬৮, এর থেকে এর প্রাচীনতা বোঝা যায়। ব্যায়াম ও খেলাধুলা বিভাগের কার্যকলাপও দক্ষতার সঙ্গেই সেই থেকে আজ পর্যন্ত চলছে,—"সপ্তকে সপ্তকে" প্রভৃতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে সমাজের ব্যায়াম বিভাগের ক্রীড়া-কুশলীরা। নাট্য ও প্রমোদ বিভাগের দ্বারা আজ পর্যন্ত অসংখ্য নাটকের মঞ্চাভিনয় ও উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সমাজের এই বিভাগেব শিল্পীদের ভেতর অনেকেই আজ খ্যাতিমান। তাঁদের ভেতর ডাঃ বিভূতিভূষণ গাঙ্গুলী (মধু বসু প্রযোজিত 'আলিবাবা' চিত্রের নায়ক), প্রকাশচন্দ্র মুস্তাফি, বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ("নদের নিমাই"-এর প্রতিষ্ঠাতা), হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য কালীপদ পাঠ, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (রেডিও) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। সমাজের দরিদ্র ভাণ্ডার পল্লীর দুঃস্থ জনগণের সেবা করে চলেছে আজ দীর্ঘদিন ধরে। সমাজের নাট্য বিভাগের দ্বারা আজ পর্যন্ত অভিনীত হয়েছে 'কুরুক্ষেত্র', 'রঘুবীর', 'প্রতাপাদিত্য', 'বলিদান', 'সাজাহান', 'শাস্তি কি শান্তি', 'মুক্তিস্নান', 'সাধু তুকারাম' প্রভৃতি অসংখ্য নাটকের। বহু স্থান ঘুরে সমাজের

কার্যালয় ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বর্তমান ঠিকানা ৯নং নরসিংহ দত্ত রোডে ভোলানাথ কবিরত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে উঠে আসে ও সেই অবধি সেখানেই বিনা ভাড়ায় সমাজ অবস্থিত আছে। সমাজপতি সার মন্মথনাথের চেষ্টায় ১৯৩৬ সালের ৫ই জানুয়ারীর সাধারণ অধিবেশনে 'পারিজাত সমাজে'র গৃহ নির্মাণ তহবিল গঠিত হয়। বর্তমানে সে অসম্পূর্ণ কাজের ভার ডাঃ বেণীচন্দ্র দত্ত এম্-এল-এ মহাশয়ের হাতে পড়েছে।

১৯২৪ সালের ২৩শে নভেম্বর 'পারিজাত সমাজে'র গ্রন্থাগারের সাহায্যার্থে 'চন্দ্রশেখর' নাটক অভিনয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয় ও হাওড়া টাউন হলে সাহায্য-রজনী অনুষ্ঠিত হয় সার মন্মথনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দের উপস্থিতিতে। ইতিমধ্যে "ভোলানাথ স্মৃতিমন্দিরে"র পুস্তকগুলি ভোলানাথ কবিরাজের পুত্রগণ সমাজকে দান করেন। এই সহ-যোগিতার ফলে রাজরোষে লুপ্তপ্রায় 'পারিজাত সমাজে'র গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ও সেই থেকে পাঠাগার ও গ্রন্থাগারে সভ্যসংখ্যা ও পুস্তকসংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। তারপর ১৮৬০ সালের ২১ আইনে 'বঁ্যাটরা পারিজাত' সমাজ রেজিষ্টারি করা হয়েছে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৭ই আশ্বিন (১৯২৭ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর) তারিখে।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নেতাদের সম্বর্ধনার আয়োজন 'পারিজাত সমাজে'র বিশেষত্ব। রায় বাহাদুর জলধর সেন (১৩২৯), সার মন্মথনাথ (১৩৩০), বিজয়-কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৩৩৭), কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩৩৮), কবি যতীন্দ্র-মোহন বাগচি (১৩৫১), কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৩৫২) প্রভৃতিকে সমাজের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত। সমাজের পক্ষ থেকে গিরিশ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে ১৩৫১ সালের ১০ই মার্চ। এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্মৃতিসভা ও জন্মোৎসব এমনভাবে আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় কিনা বলা সত্যই শক্ত। বর্তমানে পুস্তকাগার ও সাধারণ পাঠাগার সংসদের উদ্যোগে (সমাজের) ও বিজয় দাসের ব্যবস্থাপনায় বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের হাওড়া কেন্দ্র (২)-এর মাধ্যমে প্রতি বৎসর এখানে পরীক্ষা গৃহীত হয়ে থাকে।

সমাজের আরম্ভ থেকেই প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ বাংলা ভাষার মাধ্যমে

চলেছে। হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পাঠাগারকে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে বার্ষিক ৩০০৲ টাকার পুস্তকাদি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বর্তমান হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ গত বৎসর থেকে সমাজকে মিউনিসিপ্যালিটির মাসিক ১৫৲ টাকার অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছেন। বর্তমানে 'পারিজাত সমাজে'র কার্যনির্বাহক সমিতিতে সমাজপতি শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, কার্যকরী সমাজপতি শ্রীকালোবরণ ঘোষ (হাওড়া কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট), সহকারী সমাজপতি, লোক সভার সদস্য শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত, ডাঃ বিভূতি দাস ও ধূর্জটি গোস্বামী, প্রধান কর্মকর্তা ব্যোমকেশ অধিকারী, সাহিত্য পাঠাগার সম্পাদক শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী ও গ্রন্থাগারিক শ্রীপদ্মেশ অধিকারী, শ্রীসুধীর সেনগুপ্ত ও শ্রীপ্রদ্যোৎ দেব, যুক্ত-সম্পাদক শ্রীকালী রায় ও শ্রীসচ্চিদানন্দ অধিকারী, সেবা স্বাস্থ্য সম্পাদক শ্রীরাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমোদ-সংসদ সম্পাদক শ্রীশৈলেন হাজরা প্রভৃতি রয়েছেন।

ছয়টি শ্রেণী রয়েছে সমাজের সদস্যদের, তাদের নাম যথাক্রমে— (১) সম্মানিত সভ্য, (২) বিশিষ্ট বা আজীবন সভ্য, (৩) পৃষ্ঠপোষক, (৪) সাধারণ সভ্য, (৫) চাঁদাদাতা সভ্য ও (৬) বিনা চাঁদায় সভ্য। সমাজের সাধারণ সভ্যকে এক টাকা জমা, এক টাকা প্রবেশ মূল্য ও আট আনা করে মাসিক চাঁদা দিতে হয়। মহিলা ও ছাত্রদের চাঁদার হার অর্ধেক। চাঁদাদাতা সভ্য দুই টাকা জমা ও মাসিক চার আনা চাঁদায় পুস্তকাগার থেকে বাড়ীতে পড়বার জন্যে বই নিয়ে যেতে পারেন। পাঠাগারে বসে পুস্তক বা পত্র-পত্রিকা পড়তে কোন চাঁদা দিতে হয় না। সমাজের প্রত্যেক বিভাগের জন্য বিভাগীয় সম্পাদকের পরিচালনাধীনে পৃথক পৃথক উপসমিতি রয়েছে।

পাঠাগারে বর্তমানে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ছয়খানা। গ্রন্থাগারের পৃথক-বিভাগ রয়েছে কিশোর-কিশোরীদের জন্যে। গ্রন্থাগারের মোট পুস্তকসংখ্যা ৪৩৫৪। বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ধর্ম ও চিকিৎসা গ্রন্থ রয়েছে এ গ্রন্থাগারে। এ ছাড়া রবার্ট ব্রাউন-এর সায়েন্স ফর অল ৪ খণ্ড, ফেমাস লিটারেচার ১৩ খণ্ড, অমরার্থ চন্দ্রিকা, অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা বা বাগভট ও সংস্কৃত ভাষায় মূল পুরাণ-সমূহের সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[১৩-১-৫৩]

সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী

আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে ১৯১৬ সালের পয়লা জুন 'সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী' "বাণী-নিকেতন" নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সাঁত্রাগাছি তখন গণ্ডগ্রাম মাত্র, আজকের পিচঢালা রাস্তাও ছিল না, বিদ্যুতের আলোও জ্বলতো না সেখানে তখন। বিদ্যালয় বলতে ছিল একটি মাত্র "মাইনর স্কুল", আর চারিদিকে ছিল জলা-জঙ্গল।

স্থানীয় 'বান্ধব সমিতি' পরিচালিত একটি লাইব্রেরী সাঁত্রাগাছিতে গড়ে উঠেছিল "বাণী-নিকেতনে"র বছর দশেক আগে ১৯০৬ সাল নাগাদ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জোর চলছে তখন, বৃটিশ সরকারের বোমার ভয়, ফলে সমিতি আর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দু'টোই বন্ধ হ'ল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায়। পরবর্তী কালে (১৯১৮ সালে) সমিতি-পরিচালিত লাইব্রেরীর আলমারী, আসবাবপত্র ও পুস্তকাদির তখনো যা অবশিষ্ট ছিল সমস্তই বাণী-নিকেতনের হাতে আসে। সাঁত্রাগাছি লাইব্রেরীর ১৯১৯ সালের রচিত নিয়মাবলীর তৃতীয় অনুচ্ছেদে "রাজনীতি সম্বন্ধীয় কোন আলোচনা বাণী-নিকেতনে হইতে পারিবে না।" আর পঞ্চম অনুচ্ছেদের (চ) বিভাগে "সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতি বাণী-নিকেতন সংক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মনে আন্তরিক রাজভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পরিপোষণ" একথা কয়টি রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য ১৯৩৪ সালে প্রবর্তিত নিয়মাবলী থেকে এ অনুচ্ছেদ দু'টি বাদ দেওয়া হয়েছে। তবু এর থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর সে সময়ে রাজ-রোষের বহর ভালোভাবেই বুঝতে পারা যায়।

১৯১৬ সালের এক সকাল। বন্ধুদের আড্ডা জমে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা ঘরে। জড় হয়েছেন সতীর্থ বন্ধু সব। ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ বেরুচ্ছে তখন। কিনে পড়বার সঙ্গতি নেই দুঃস্থ ছাত্রদের। সম্মিলিত বন্ধুর দল চার আনা করে চাঁদা দিয়ে নিয়মিত পাঠক হ'লেন সে আসরের। এই হ'ল লাইব্রেরী পত্তনের গোড়ার কথা। সেখানেই ১৯১৬ সালের ১লা জুন ঘরোয়া বৈঠকে জন্ম নিল "বাণী-নিকেতন"। এলো

টেবিল, এলো আলমারী, বই যোগাড় করা হ'ল ৫৩ খানা—সব চেয়ে-আনা উপন্যাস। রাখা হ'ল প্রবাসী, ভারতবর্ষ, আরো কয়েকখানা বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকা—সেই নিয়ে পাঠাগারের পত্তন করা হল। ধাপে ধাপে রূপ নিতে আরম্ভ করলো লাইব্রেরী। যে চৌদ্দজন উদ্যোক্তার আজীবনের সেবায় লাইব্রেরী আজকের রূপ পেয়েছে তাঁদের নাম হ'ল, হরিদাস সান্যাল, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ললিতমোহন চৌধুরী, সুশীলকুমার মৈত্র, ঘনশ্যাম সান্যাল, নন্দলাল মৈত্র, ভূপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সাধনচন্দ্র দে, বেচারাম কুণ্ডু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ টাট, নরেন্দ্রনাথ পাল, দুলালচন্দ্র দে ও সন্তোষকুমার ভাদুড়ী। এঁদের ভেতর শ্রীহরিপদ সান্যালই ছিলেন লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্ভাবক। লাইব্রেরী রূপ পেতে আরম্ভ করতে তিনিই হন লাইব্রেরীর সভাপতি আর লাইব্রেরীর প্রথম সহ-সভাপতি হ'লেন সন্তোষকুমার ভাদুড়ী। স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরাও এগিয়ে এলেন এ সব যুবকদের সাহায্য করতে, উৎসাহ দিলেন এঁদের নৃসিংহদেব চৌধুরী, কালিদাস লাহিড়ী, বরদাকান্ত সান্যাল, ডাঃ মোহিতচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ।

লাইব্রেরী চলতে লাগলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায়। লোকের চোখ পড়লো। সন্দেহ দেখা দিল ক্রমে। পুলিসের নজর এড়িয়ে ষড়যন্ত্রের দল গড়ে উঠেছে—বঙ্কিমবাবুর মাসী কেঁদে পড়লেন, এখানে আর থাকা চলবে না। এখন ৫২নং বাস ঘোরে যে জায়গায় সেটা ছিল পড়ো জমি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এলাকায় চৌধুরীদের ভাগাড়। দখল করা হ'ল সেটা, উঠলো 'বাণী-নিকেতনে'র নূতন গোলপাতায় ছাওয়া আটচালা ১৯১৮ সালে। বোঝাপড়া চললো, জমিদারদের সঙ্গে রফা হ'ল ১৬ কাঠা ঘেরা জমি বছর চার আনা খাজনায়। 'বাণী-নিকেতন'কে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে গড়ে উঠলো 'সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী', সাঁত্রাগাছি সাহিত্য-সম্মিলন আর সঙ্গীতায়তন—এই তিনটি শাখা বিভাগ সেই ১৯১৮ সালেই। গোলপাতায় ছাওয়া ঘর বর্ষায় টেঁকে না, বই-এ উই ধরে,—ক্রমে স্থানাভাব দেখা দেয়। ১৯২০ সালে লাইব্রেরীকে আবার স্থানান্তরিত করতে হ'ল নন্দলাল মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে। লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন,—এবার জমি কিনে পাকা ইমারত তৈরী করে লাইব্রেরীকে নিজস্ব বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত

করতে হ'বে। এবার সে চেষ্টাই চলতে লাগলো।

লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি শ্রীসুবোধকুমার ভট্টাচার্য এ সময়ে এসে লাইব্রেরীতে যোগ দেন। ১৯৩০ সালের লাইব্রেরীর কার্যবিবরণীতে দেখা যায়,—"আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে, বাণী-নিকেতনের একটি মাত্র শাখা আজো জীবিত আছে, উহা 'সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী।' নিজ বাটি বাসোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ঐ একটিমাত্র লুপ্তাবিশিষ্ট শাখা শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহির্বাটীতে আছে। ১৯২৯-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী কার্য-সূচনা থেকে আরম্ভ করে পাঁচ মাসের মধ্যে বহু বৎসরের সঞ্চিত নির্মাণ তহবিলে শেষ হয়ে গেল। ৫ই জুলাই ১৯২৯ সালে কর্তৃপক্ষ কলকাতার নাটমন্দিরে শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর সাহচর্যে অর্থ সংগ্রহ করলেন। কড়ি থামাল পর্যন্ত উঠে কাজ আবার বন্ধ হ'ল। ১৯৩০-এর জুলাই-এ দেখা গেল অসমাপ্ত কাজ করতে আরো ৩০০০৲ টাকা প্রয়োজন। শ্রীসুবোধকুমার ভট্টাচার্য প্রস্তাব আনলেন,—৫ বৎসরের জন্য লাইব্রেরীর জমি বন্ধক রেখে এ টাকা কর্জ করতে হ'বে। প্রস্তাব অনুমোদিত ও গৃহীত হ'ল,—১০০৲ টাকার ৩০ খানি শেয়ার করে গড়ে তুলতে হ'বে 'বাণী-নিকেতন লোন সিণ্ডিকেট'...। লাইব্রেরীর আর্থিক অবস্থা ভালো হ'ল। ২০।২, রামচরণ শেঠ রোড, সাঁত্রাগাছিতে ১৪০০৲ টাকায় ছয় কাটা জমি কেনা হয়, আর গৃহ-নির্মাণের টাকা ওঠে স্থানীয় লোকদের বদান্যতায় আর অভিনয়ের দ্বারা। লাইব্রেরীর বর্তমান গৃহ নির্মিত হয় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে আর নূতন বাড়ীকে লাইব্রেরী স্থায়ীভাবে ওঠে আসে ১৯৩২ সালে, ১লা জানুয়ারী তারিখে। এ-সময়ে "স্বরাজ স্পোর্টিং ক্লাব" নামক স্থানীয় ক্রীড়- সঙ্ঘ "বাণী নিকেতন স্পোর্টস ক্লাব" নাম নিয়ে বাণী নিকেতনের সঙ্গে এসে যুক্ত হ'ল। ১৯৩৪ সালে গঠিত হ'ল বাণী নিকেতনের বিভিন্ন শাখার নিয়মাবলী। ১৯৩৫ সালে নূতন যুবক কর্মীরা এসে লাইব্রেরীর ভার হাতে নিলেন। তাঁদের মধ্যে সুশীলকুমার চৌধুরী, সুহৃদ চৌধুরী, শিবপ্রসাদ রায়, শিশিরকুমার লাহিড়ী, নিত্যরঞ্জন মৈত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী'তে সাহিত্য সভার আয়োজন চলে আসছে প্রথম থেকেই। এই সমস্ত সভায় যোগদান করেছেন সর্দার হৃষীকেশ ভট্টাচার্য, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, প্রবোধ সান্যাল, কবি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মন্মথ ঘোষ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক ও মনীষীরা। এই লাইব্রেরীর উদ্যোগে সাংস্কৃতিক সম্মিলন, বিজয়া সম্মিলনী ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। লাইব্রেরীর কিশোর বিভাগ খোলা হয়েছে ১৯৫১ সালের পয়লা জানুয়ারী। এই বিভাগে বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা ৫০০ খানা, সদস্য সংখ্যা ১২৬ জন ও মাসিক চাঁদা তিন আনা করে। শিশুদের জন্যে লাইব্রেরীতে 'শুকতারা', 'মৌচাক' ও 'ভাই-বোন' এই তিনখানি মাসিক পত্রিকা নেওয়া হয়। এ ছাড়া ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই লাইব্রেরীকে "দরিদ্র ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডার" নামে একটি তহবিল খুলে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে নিয়মিতভাবে। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমানে লাইব্রেরীকে ১৮০৲ টাকা হিসেবে বার্ষিক অর্থ সাহায্য করে চলেছেন।

'সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী'র বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪০০। প্রথম শ্রেণীর সদস্য একসঙ্গে দুইখানি বই ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্য একখানি মাত্র বই একসঙ্গে নিতে পারেন। শ্রেণী হিসেবে সদস্যদের মাসিক দেয় চাঁদার হার বারো আনা ও ছয় আনা আর জমা চার টাকা ও দুই টাকা। ৬০৲ টাকা বা সেই পরিমাণ টাকার পুস্তক বা আসবাবপত্র একসঙ্গে দিলে লাইব্রেরীর আজীবন সদস্য হওয়া যায়। বর্তমানে লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা পাঁচ হাজার। পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা আছে অবৈতনিক পাঠাগারে। বর্তমানে পাঠাগারে ১৫ খানি মাসিক, ৫ খানি সাপ্তাহিক ও একখানি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। একেবারে গোড়ার দিক থেকেই হাতে লেখা "বাণী" নামক বার্ষিকী এ লাইব্রেরীর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বর্তমান বৎসরে সেটা প্রকাশিত হয়েছে মুদ্রিত হয়ে। এমনি "বাণী" প্রকাশিত হ'তে থাকবে ভবিষ্যতেও এ হ'ল আশার কথা।

'সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী'র বর্তমান সভাপতি শ্রীসুবোধকুমার ভট্টাচার্য, সম্পাদক শ্রীশিবপ্রসাদ রায় ও লাইব্রেরীয়ান শ্রীশিশিরকুমার লাহিড়ী। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বাণী নিকেতনের বর্তমান সভাপতিও শ্রীসুবোধকুমার ভট্টাচার্য আর শ্রীপ্রভাতকুমার ভট্টাচার্য হচ্ছেন এর বর্তমানের সম্পাদক।

[১৩ ১১-৫২]

মাধব স্মৃতি পাঠাগার

দুই কাঠা জমির উপর পরিসর বারান্দাযুক্ত সুন্দর দ্বিতল ইমারত। ১৮নং সালকিয়া স্কুল রোডে এই বাড়ী অবস্থিত। আশে পাশে এর চেয়ে বড় ইমারত বর্তমানে আরো তৈরী হয়েছে, কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর আগের এই দ্বিতল বাড়ীর বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট চোখে পড়ে। এটি 'মাধব স্মৃতি পাঠাগারে'র নিজস্ব বাড়ী। নীচের তলা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাড়া নিয়েছেন, উপরের তলায় লাইব্রেরী অবস্থিত। পরিসর বারান্দা, প্রশস্ত হলঘর। বারান্দায় লাইব্রেরীর অফিস, র‍্যাকে তাকে তাকে সাজানো বই। ভেতরে প্রশস্ত হলঘরের চারদিকে বড় বড় আলমারি ভর্তি বই, মাঝখানে মস্তবড় গোল টেবিলের চারধারে সাজানো চেয়ার —গড়ে দৈনিক পঞ্চাশ জন পাঠক এখানে বসে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠ করে থাকেন। 'মাধব স্মৃতি পাঠাগার' আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত— এটি এ লাইব্রেরীর সত্যিকারের বিশেষত্ব।

মাধবচন্দ্র ঘোষ হাওড়ার খুব বড় ব্যবসায়ী ও দানবীর ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ, স্থানীয় সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি অল্প বিস্তর জড়িত ছিলেন। ১৮৯৭ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি মারা যান। এর বিশ বৎসর পরে ১৯১৭ সালে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা করে তার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

সালকিয়া এ এস স্কুলের সংলগ্ন বড় রাস্তার উপর দুই কাঠা জায়গা লাইব্রেরী স্থাপনের জন্যে 'ল্যাণ্ড একুইজিশনে'র মারফৎ নেওয়া হয়। মাধববাবুর পুত্র ক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ আর তার বড় ছেলের (তখন মৃত) দিকের পৌত্র শীতলচন্দ্র ঘোষ সেই জায়গার ওপর দ্বিতল ইমারত তৈরী করে লাইব্রেরীকে দান করেন। লাইব্রেরীর উদ্বোধন করা হয় ১৯১৭ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে। হাওড়ার এ অঞ্চলে তখন কোন সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল না। ফলে সেই উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করেন স্থানীয় জনসাধারণ আর সে উৎসবের পৌরোহিত্য করেন হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এফ ডি এস্কলি সাহেব। এরো আগে ১৯১৭ সালের

১৬ই সেপ্টেম্বরের এক সাধারণ জনসভায় লাইব্রেরীর কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায় (প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, ২রা অক্টোবর, ১৯১৮)। ক্ষীরোদ বাবু ও শীতল বাবুর এই দান যথারীতি একটি অছিপত্রে রেজিষ্টারী করা হয় ১৯২৫ সালের ৭ই জুলাই আর ন্যাসরক্ষক (ট্রাষ্টি) নিযুক্ত হন ক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ, শীতলচন্দ্র ঘোষ, ত্রিপুরাচরণ রায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

একেবারে আরম্ভের সময়েই ক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ, শীতলচন্দ্র ঘোষ লাইব্রেরীতে ৯৯০ খানা ইংরেজী ও ১১১১ খানা বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক আর লাইব্রেরী চালু করবার মতো আসবাবপত্র দান করেছিলেন। 'মাধব স্মৃতি পাঠাগারে'র প্রথম সভাপতি ছিলেন ৺মহেন্দ্রনাথ রায় আর সম্পাদক ছিলেন ৺ত্রিপুরাচরণ রায়। ত্রিপুরাচরণ রায় প্রথম বৎসরেই ২৯ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লাইব্রেরীকে দান করেন।

এ ছাড়া প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণীতে (২রা অক্টোবর, ১৯১৮) দেখতে পাওয়া যায়, লাইব্রেরীর ক্রমবর্ধমান সভ্য ও পাঠকদের দাবী মেটাতে পরিচালকমণ্ডলীকে প্রথম বৎসরেই ৩৩০ খানা বাংলা বই কিনতে হয়েছিল, পাঠাগার রাখতে হয়েছিল ১৪ খানা দৈনিক ও সাময়িক-পত্র আর লাইব্রেরীর সভ্য-সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৩৯ জন সেই প্রথম বৎসরেই। তখন লাইব্রেরীর খরচ চলত সভ্যদের চাঁদায় আর হিতৈষীদের দানে। লাইব্রেরীর বাড়ীর দেয় কর একেবারে গোড়ার দিক থেকেই হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি মকুব করে দিয়েছিলেন আর একেবারে প্রথম থেকেই মিউনিসিপ্যালিটি লাইব্রেরী পরিচালনের জন্যে মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করে অর্থ সাহায্যও করে চলেছেন।" হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সেই মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা অর্থ সাহায্য সমানভাবে আজ অবধি চলেছে। 'মাধব স্মৃতি পাঠাগার' একেবারে আরম্ভ থেকেই জনসাধারণের সহানুভূতি পেয়েছে বলেই এতো দ্রুত তার এতোটা উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলছে এ লাইব্রেরী। কার্ডে লেখা গ্রন্থতালিকা রয়েছে গ্রন্থাগারের—যাবতীয় পুস্তক ডিউয়ি প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ (ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন) নিয়মানুযায়ী বিষয়ে বিভক্ত। এইরূপ সুন্দরভাবে লাইব্রেরীর পরিচালনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হ'ল লাইব্রেরীর বর্তমান সম্পাদক

শ্রীপঙ্কজকুমার ঘোষের। 'মাধব স্মৃতি পাঠাগারে'র প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন তিনি। তাঁরই কঠোর পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে লাইব্রেরী আজ এতোটা সুশৃঙ্খলভাবে চলছে।

'মাধব স্মৃতি পাঠাগারে'র সহিত সংশ্লিষ্ট একটি 'পাঠচক্র' আছে। এর উদ্যোগে নানা বিষয়ে আলোচনা বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এছাড়া মনীষীদের দ্বারা লাইব্রেরীতে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়ে আসছে একেবারে গোড়ার দিক থেকেই। সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি মনীষীরা বক্তৃতা করেছেন এ লাইব্রেরীতে। এ সমস্ত সভায় লাইব্রেরীর সভ্য ছাড়া অন্য জনসাধারণ সকলেই উপস্থিত থাকতে পারেন। লাইব্রেরীতে ছাত্রদের বিতর্ক সভা বসে মাসে একবার করে। ছাত্রদের এই বিতর্ক সভাও প্রায় গোড়ার দিক থেকেই চলে আসছে। লাইব্রেরীর বর্তমান কার্যকলাপের মধ্যে 'স্মারক' নামক হাতে লেখা পত্রিকার প্রকাশ অন্যতম। ভবিষ্যতে 'স্মারক' লাইব্রেরীর মুখপত্র হিসেবে চলতে থাকার আশা করা যায়।

লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান ও বয়স্ক শিক্ষা পরিকল্পনা বর্তমানে গৃহীত হয়েছে। গত ১৯৫২ সালের ১০ই আগষ্ট কার্যকরী সমিতির সভায় সামাজিক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তাব আনয়ন করেন লাইব্রেরীর বর্তমান সম্পাদক শ্রীপঙ্কজকুমার ঘোষ। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার বর্তমান স্পীকার লাইব্রেরীর বর্তমানের সহকারী সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবে পরিকল্পনাটিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল (ক) বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান ও (খ) স্থানীয় ছাত্রদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ব্যবস্থা। সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য যথারীতি কার্যক্রম রচিত হয়েছে ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়েছে। সামাজিক শিক্ষা পরিকল্পনার সমস্ত কার্যক্রম এখানে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে এটুকু বলা চলে আগাগোড়া জিনিষটাই সুপরিকল্পিত আর এটাকে কার্যকরী করতে পারলে সমস্ত সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে। তা ছাড়া সেটা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই রচিত হয়েছে।

বর্তমানে 'মাধব স্মৃতি পাঠাগারে'র খরচ চলে সভ্যদের চাঁদা, শুভানুধ্যায়ীদের

দান, মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ সাহায্য ও বাড়ীর নীচের তলার ভাড়া থেকে। লাইব্রেরীর কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ার বর্তমান দোতলা বাড়ীর উপরে তৃতীয় তলা নির্মাণের প্রস্তাব চলছে ও সেজন্য একটি কমিটী গঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ (ক্ষীরোদবাবুর ছেলে)। আশা করা যায়, এ বছরেই সেটা সম্পূর্ণ হ'বে।

লাইব্রেরীর বর্তমান সভ্যসংখ্যা ২৮৫ ও পুস্তক সংখ্যা ৯০০০ হাজার। সভ্যদের 'ক ও খ' শ্রেণীর বার্ষিক চাঁদা যথাক্রমে বারো টাকা ও ছয় টাকা আর শ্রেণীনির্বিশেষে জমা পাঁচ টাকা। 'ক' শ্রেণীর সভ্য এক সঙ্গে দুইখানি ও 'খ' শ্রেণীর সভ্যকে এক সঙ্গে একখানি বই নিতে হয়। দামী বই নিতে হলে অবশ্য অতিরিক্ত টাকা জমা রাখতে হয়, তবে বই ফেরৎ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়ে থাকে। পাঠাগারে সর্বমোট দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে ছাব্বিশখানা। লাইব্রেরীতে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়া ২৯ খণ্ড, হিষ্টরিয়ান্‌স হিষ্টরী অব দি ওয়ার্ল্ড ২৫ খণ্ড ও ১৪ খণ্ড কেম্ব্রিজ হিষ্টরি অব দি ইংলিশ লিটারেচার রয়েছে।

'মাধব স্মৃতি পাঠাগারে'র বর্তমান সভাপতি শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু আর লাইব্রেরীয়ান শ্রীসত্যচরণ পাইন।

[২-১১-৫২]

মাকড়দহ সারস্বত লাইব্রেরী

কলকাতা থেকে নয় মাইল পশ্চিমে হাওড়া জেলায় মাকড়দহ গ্রাম অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন থেকে মার্টিন কোম্পানীর গাড়ীতে বা কদমতলা থেকে বাসে চেপে সেখানে যেতে হয়। ছোট রেল লাইন এঁকেবেঁকে গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। ষ্টেশনের দক্ষিণে বিখ্যাত মাকড় চণ্ডীর মন্দির, পি ডব্লিউ ডি'র বড় রাস্তায় পড়ে। মন্দিরের সামনে হাট। বাজারের পশ্চিমে বড় পুকুরের পাড় দিয়ে পশ্চিমমুখী সোজা রাস্তা চলে গেছে, মিনিট সাতেক লাগে লাইব্রেরীতে যেতে। পথে বাঁ হাতে বালিকা বিদ্যালয় ও মহেন্দ্র অবৈতনিক পাঠশালা। একটু এগিয়ে বাঁহাতে ঘুরলেই লাইব্রেরী। লাইব্রেরী বাড়ী পূর্বমুখী, বাড়ীর বাঁপাশে আড়াইশো বছরের পুরানো গ্রাম্য কালীমন্দির লাইব্রেরী বাড়ীর সঙ্গে গা ঘেষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে আছে ছবির মতো।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষার রেওয়াজ ছিল মাকড়দহে। গ্রামের প্রাচীন কাগজপত্রে "মাকড়দহ সাধারণ পুস্তকালয়ে"র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সে কবেকার কথা, তার সাল-তারিখ আজ হারিয়ে গেছে, কারা করেছিল কিংবা কি ধরণের লাইব্রেরী ছিল সে আজ আর জানবারও উপায় নেই। এরপ "সরস্বতী পুস্তকালয়" স্থাপিত হয়েছিল ১২৯১ বঙ্গাব্দের (১৮৮৫) সরস্বতী পূজোর দিনে। গ্রামের প্রান্তে শ্রীমানী পাড়ায় 'বড়বাড়ীতে' স্থাপিত হয়ে, পরে সে লাইব্রেরী হলধর শ্রীমানী মহাশয়ের বাহির বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, আর জানা যায়, কয়েক বৎসর ধরে সেখানে সেটা ভালোভাবেই চলেও ছিল। সরস্বতী পুস্তকালয়ের উৎসব অনুষ্ঠান ছিল অনেক, বাহির থেকেও তাতে বহু গণ্যমান্য লোক এসে যোগদান করতেন। লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হতো আড়ম্বরের সহিত, বাণী বন্দনার সঙ্গে চলতো দরিদ্রনারায়ণ সেবা, আয়োজন করা হতো দিনব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠানের। পরবর্তী কালে এর বইপত্র কিছু পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু লাইব্রেরী হিসেবে এটাকেও পাওয়া যায় নি। লোকের মুখ থেকে যতটুকু জানতে পারা যায়, লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ছিল

সাড়ে তিনশো, কেউ পাঁচশো, আবার কারো মতে তারো বেশী। আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হ'লেও তার অনুষ্ঠানাদি চলতে লাগলো। 'সরস্বতী পুস্তকালয়ের" বাণীবন্দনা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, সঙ্গীতানুষ্ঠানাদি আগের মতোই চলতে থাকলো হলধর শ্রীমানীর বাড়ীতে বৎসরের পর বৎসর ধরে, সেটা বন্ধ হ'ল না।

ঘুরে এলো ১৯১৯ সালের তিথিপূজা, রীতিমতো সেবারেও আয়োজন করা হ'ল বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের, সরস্বতী পুজোর দিনে হঠাৎ প্রবল আপত্তি জানালেন স্থানীয় যুবকদের কয়েকজন,—কি অর্থ হয় গ্রন্থবিহীন গ্রন্থাগারের উৎসব অনুষ্ঠানের? এতে করে উৎসবের পরিবর্তে অভাব আর অক্ষমতায় বেদনাই হয়ে ওঠে তীব্রতরো। লাইব্রেরী আবার গড়ে তুলতে হ'বে। উদ্যোগী হ'লেন সাধনচন্দ্র শ্রীমানী, প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ শ্রীমানী, হরিমোহন নন্দী, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র শ্রীমানী, দাশরথি ঘোষ, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাচরণ শ্রীমানী, কানাইলাল শ্রীমানী, মন্মথনাথ শ্রীমানী ও চণ্ডীচরণ শ্রীমানী, যোগাড় করা হ'ল বইপত্র। এলো সাজসরঞ্জাম। 'মাকড়দহ সারস্বত লাইব্রেরী' নাম দিয়ে নূতন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করা হয় সেদিনই। লাইব্রেরীর নূতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হ'ল জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি আর ডাঃ সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে। বিশ্বনাথ শ্রীমানীর বহির্বাটিতে লাইব্রেরীর কার্যকলাপ চলতে লাগলো। এক বছর পরে (১৯২০ সাল) দেখা গেল লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা হয়েছে ৬৬৮ খানা, পাঠাগারে পত্রিকার সংখ্যা পাঁচখানা আর ১২৫ জন হয়েছে লাইব্রেরীর সদস্য।

লাইব্রেরীর প্রথম বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হ'ল আড়ম্বরের সহিত (রিপোর্ট ১৯২০-২১)। সে উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোকিলেশ্বর শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হ'ল—পরীক্ষক নিযুক্ত হ'লেন বিশিষ্ট মনীষীরা। চারটি বিষয়ের প্রথম স্থান অধিকারী চারজনকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হ'ল লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে। পঞ্চম পুরস্কার পেলেন সুহাসিনী দেবী, তাঁর লেখায় প্রী· হয়ে সভাপতি নিজে তাঁকে পুরস্কার দেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন···লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হ'ল "বিশেষ পুরস্কার" রৌপ্যপদক। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বার্ষিক উৎসবে প্রবন্ধ

প্রতিযোগিতার আয়োজন লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে চলে আসছে। ১৯৩৪ সালে বিচারপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রবন্ধ প্রতিযোগীদের ২ খানা স্বর্ণপদক ও তিনখানা রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। হাওড়া জেলাবোর্ড এই সময় থেকেই লাইব্রেরীকে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করতে আরম্ভ করেন।

সে সময় রাত্রিতে বিশ্বনাথ শ্রীমানীর বাড়ীতে যাতায়াতের অসুবিধে ছিল। অন্য দিকে ষ্টেশনের কাছে লাইব্রেরী অবস্থিত থাকলে দূরের গাড়ীতে যাত্রীদের পক্ষেও লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধে। একদল যুবক প্রস্তাব আনলেন লাইব্রেরী স্থানান্তরের, ষ্টেশনের কাছাকাছি বা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে লাইব্রেরীকে স্থানান্তরিত করা হোক। ফলে লাইব্রেরীর এক শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হ'ল ষ্টেশনের কাছে ডাঃ সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক্তারখানার একাংশে। তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হ'ল এতে করে চাঁদা তো আদায় হ'লই না, বইও খোয়া গেল অনেকখানি। দূরের গ্রাহকদের কাছ থেকে বই ফেরৎ পাওয়া গেল না। ফলে বাধ্য হয়ে সে কেন্দ্র আবার বন্ধ করে দিতে হ'ল।

১৯২১-২২ সালে গ্রামে ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দিল। দেখতে দেখতে উজাড় হয়ে গেল গ্রাম, ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল অনেকে। কর্মী নেই, পড়বার লোক নেই গ্রামে, ফলে লাইব্রেরীর কার্যকলাপ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল সেই দুর্দিনে। সেই থেকে প্রায় দশ বছর সারস্বত লাইব্রেরীর কাজ একদম বন্ধ ছিলই বলা চলে। ১৯৩২ সালে গ্রামের কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় আবার লাইব্রেরী রীতিমত পরিচালিত হ'তে আরম্ভ করে। ১৯৩৪ সালে সার মন্মথনাথ আসেন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার সভাপতি হয়ে লাইব্রেরীতে, জেলাবোর্ড থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া সুরু হয় ও সেই থেকে ক্রমে আবার লাইব্রেরীর উন্নতি হ'তে থাকে। লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রসারিত এবং কার্যকলাপের দরুণ স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ১৯৩৬-৩৭ সালে লাইব্রেরীকে হরিমোহন নন্দী মহাশয়ের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয় ও সেই থেকে লাইব্রেরীর নিজস্ব বাড়ীর চেষ্টা চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৩৭ সালে পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা গিরিবালা দেবী, শরৎকুমারী দেবী ও ননীবালা দেবী লাইব্রেরীকে ৪ কাঠা জমি (’০৩ একর) লাইব্রেরীর গৃহ নির্মাণের জন্য দান করলেন ও সেই দানপত্র রেজিষ্টারী করে দিলেন ১৯৩৭ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে। গৃহ নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করলেন বিশ্বনাথ শ্রীমানী ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিপদ শ্রীমানী। এরপর ১৯৩৮ সালে লাইব্রেরী নিজস্ব ভবনে উঠে এলো, আর সে বছরই লাইব্রেরী নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ’ল। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ষ্টেশন ও বাজারে শাখা কেন্দ্র স্থাপন করে লাইব্রেরীর কাজ চালানো হয়েছিল, কিন্তু নানা অসুবিধায় সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৪ সালের ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী দুই দিবসব্যাপী অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে লাইব্রেরীর রজত জয়ন্তী উৎসব উদযাপিত করা হয়েছে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে। বাহিরের বহু গুণজ্ঞানী সে উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। গ্রামগৌরব জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সে উৎসবের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বিশ্বনাথ শ্রীমানীর পিতৃস্মৃতি রক্ষাকল্পে লাইব্রেরী ভবনের নাম দেওয়া হয়েছে "কেদার মেমোরিয়াল হল"।

১৯৪৪ সাল থেকে সারস্বত লাইব্রেরীকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন শ্রীধর ভট্টাচার্য, প্রাণগোপাল শ্রীমানী, গোপীকান্ত শ্রীমানী, মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, ক্ষৌনীশ সান্যাল, বীরেন মান্না, প্রভাস শ্রীমানা প্রভৃতি একদল নবীন কর্মী। এঁদেরই চেষ্টায় শিশুদের ভেতর পাঠাগার ব্যবহার স্পৃহা বাড়াবার জন্য গড়ে উঠেছে "শিশু সংসদ"। "শিশু সংসদ" লাইব্রেরীর সাহায্যে চলে বটে, কিন্তু ওর পৃথক কার্যনির্বাহক সমিতি রয়েছে। এখানে শিশুদের উপযোগী পুস্তক ও পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। বর্তমানে শিশু সংসদের পুস্তক-সংখ্যা ৯ শত আর সভ্য সংখ্যা ১৫০ জন। শিশু সংসদের ‘ব্রতচারী নৃত্য’ অনুষ্ঠিত হয় ও এখান থেকে হাতে লেখা পত্রিকা ‘কণিকা’ বের’ হয়ে থাকে। এই লাইব্রেরীর শ্রীগোপীকান্ত শ্রীমানী গ্রন্থাগার পরিচালনা শিক্ষা শেষ করে বর্তমানে হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের সক্রিয় সদস্য ও অধ্যাপক নির্বাচিত হয়েছেন।

'মাকড়দহ সারস্বত লাইব্রেরী'র কাজ চলে সকাল ৭টা থেকে ৯টা ও বিকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত। পাঠাগারে বর্তমানে ২৪খানি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে ও সর্বসাধারণের পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে ১০০৲ টাকা বা ৫০৲ টাকা কিংবা সেই মূল্যের পুস্তক ও আসবাবপত্র লাইব্রেরীতে দিলে লাইব্রেরীর আজীবন সদস্য হওয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ সদস্যের চাঁদা যথাক্রমে নয় আনা ও সাড়ে চারি আনা, আর পুস্তক নেবার যোগ্যতা একসঙ্গে দুইখানা ও একখানা করে। লাইব্রেরীর বর্তমান সভাপতি শ্রীশ্রীধরচন্দ্র ভট্টাচার্য, সহঃ সভাপতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন শ্রীমানী ও লাইব্রেরীয়ান শ্রীঅজিতকুমার ঘোষাল। এ ছাড়া পরিচালক মণ্ডলীর সভ্য শ্রীনফরচন্দ্র শ্রীমানী (ন্যাস-রক্ষক) ও শ্রীশরদিন্দুশেখর শ্রীমানীর (আজীবন সদস্য) নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সারস্বত লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৩১০৫। এ ছাড়া এ লাই-ব্রেরীতে হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহ সত্যি ভালো। একশো দেড়শো বছরের পুরানো অসংখ্য পুঁথি এখানে রক্ষিত হয়েছে। সারস্বত লাইব্রেরীর প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহও দেখবার মতো। পুরাতন পুস্তকের মধ্যে রামকমল সেনের ইংলিশ টু বেঙ্গলি (শ্রীরামপুর প্রেস, ১৮৪৩) ও রেভাঃ ডব্লিউ ইয়েটস্ ডি ডির "ইনট্রডাকশন টু বেঙ্গলি লেঙ্গুয়েজ" (জে ওয়াগনার সম্পাদিত, ১৮৪৭) প্রভৃতির নাম করা যায়। জেলাবোর্ডের সাহায্যে ও জনসাধারণের বদান্যতারই বর্তমান লাইব্রেরীর ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে। সরকারী সামাজিক শিক্ষা পরি-কল্পনা খাতে বর্তমানে ৩০০৲ টাকা করে পাওয়া যাচ্ছে। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪), বলাই দেবশর্মা (১৩৪২ বঙ্গাব্দ), ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায় (১৯৪৪), রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ (১৯৪৮), ডাঃ কে এন কাটজু (১৯৪৮), স্পীকার শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৫১) প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ লাইব্রেরীতে এসেছেন ও লাইব্রেরীর কার্যকলাপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন,—গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত 'মাকড়দহ সারস্বত লাইব্রেরী'র পক্ষে এ কম কৃতিত্বের কথা নয়।

[২১-১-৫৩]

হাওড়া সেবা সংঘ পাঠাগার

"আমি চাই এমন লোক যাহাদের শরীরে পেশাসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত হইবে, আর তাহাদের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব ও ক্ষত্রবীর্য—ব্রহ্মতেজ।"—১৯৩৩ সালে মুদ্রিত সঙ্ঘের নিয়মাবলীর উপরিভাগে স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী মুদ্রিত রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হাওড়ার জননেতা হরেন্দ্রনাথ ঘোষের দেওয়া বিবৃতিতে দেখতে পাওয়া যায়,—"সুতরাং স্বাস্থ্যোন্নতির সাথে সাথে যাতে এই সঙ্ঘের সভ্যগণের মানসিক উন্নতি হয়, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রতিষ্ঠাতৃগণের লক্ষ্যের মধ্যে ইহা মুখ্যভাবেই স্থান পেয়েছিল। তাঁদের এ চিন্তাধারার মূলে প্রেরণা যুগিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ বাণী—" (স্মরণী, পৃঃ ১৮)। এ ছাড়া সঙ্ঘের প্রতীক-বাণী হল,—'শিক্ষার প্রসার চাই—চাই সংঘশক্তি আর ঐক্য।' এটুকু এজন্য বলতে হ'ল যে, গোড়ায় সঙ্ঘের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হয়তো সত্যি ছিল; কিন্তু তারি সঙ্গে শরীর ও মনের দিক দিয়ে জাতিকে গড়ে তোলার স্বপ্নও দেখেছিলেন এর স্থাপয়িতারা এরি কর্মধারার ভেতর দিয়ে, আর সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতেই সেদিন পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সঙ্ঘের ব্যায়ামাগারের আর পাঠাগারের।

সমারোহের সহিত সঙ্ঘের রজত-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে (১৯৪৯)। সেই উৎসবের পৌরোহিত্য করেন বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই উপলক্ষে সঙ্ঘের বহু-বিচিত্র সার্থক কার্যকলাপের জন্যে প্রশংসা-মুখর বাণী পাঠিয়েছিলেন অরুণা আসফ আলি, সুচেতা কৃপালনী, শরৎচন্দ্র বসু, মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি, সন্তোষকুমার বসু, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য (আনন্দবাজার), আর সি ব্যানার্জি (হিন্দুস্থান), নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই। এর থেকে সঙ্ঘের কার্যকলাপের খ্যাতি-প্রতিপত্তির একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাকাল ধরা হয়েছে ১৯২৩ সালে, আর সম্ভবতঃ ১৯৪৮ সালের

২৯শে মে যখন সংঙ্ঘ রেজিষ্টারি করা হয় (১৮৬০ সালের ২১নং আইন), সে সময়েও ১৯২৩ সালই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাগজপত্র দেখে তো মনে হয়, সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার প্রামাণ্য তারিখ হবে ১৯২১ সাল। হরেন্দ্রনাথ ঘোষই (আরম্ভ থেকে সঙ্ঘের সম্পাদক) এর সঠিক খবর দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর দেওয়া মুদ্রিত বিবৃতিতে এ বিষয়ে এটুকু মাত্র পাওয়া যাচ্ছে—'রাজনৈতিক পটভূমিকায় সঙ্ঘ আরম্ভ হয়েছিল। দীর্ঘকালের ব্যবধানে সঠিক সময় নিরূপণ তাঁর স্মৃতি-শক্তির বাইরে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর বাড়ী খানাতল্লাস করে পুলিস বই ও সমস্ত কাগজপত্র যা পেয়েছে, নিয়ে গেছে বারবার। কাজেই সঙ্ঘের সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল লিপিবদ্ধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। খুব সম্ভব সঙ্ঘের পরবর্তী সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষাল এম-এ, বি-এল-এর দেওয়া মুদ্রিত বিবরণী থেকে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার তারিখ দেওয়া হয়েছে। সন্তোষবাবু ছিলেন দ্বিতীয় পরিচালক-মণ্ডলীর একজন। এ-বিষয়ে তাঁর দেওয়া বিবরণী (স্মরণী, ২০-২১ পৃঃ) থেকে যা পাওয়া যায় তা' হ'ল—১৯২৩ সালের মার্চ মাসে তিনি হাওড়া কোর্টে যোগদান করেন। হরেনবাবুর পরিচালনায় সঙ্ঘ চালু ছিল। অল্পদিনের ভেতরই হরেনবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।'—এর থেকে এটুকু স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, এর আগেও সঙ্ঘ বর্তমান ছিল। ১৯৩৮ সালের পরবর্তীকালের খাতাপত্র অনুযায়ী যে বিবরণী পাওয়া যায় (স্মরণী, ২২ পৃঃ) তাতে আছে,—'১৯২০-২১ সালের আন্দোলন। বিদেশী সরকারের দমন নীতির ফলে প্রকাশ্য আন্দোলন যখন বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থায় আসে, সেই সময়ে হাওড়ার জনকয়েক যুবকের চেষ্টায় "হাওড়া সেবা সঙ্ঘ" স্থাপিত হয়।'—এর থেকে মনে হয় ১৯২১ সালই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রামাণ্য তারিখ হওয়া উচিত। এ সময়ে বাঙ্গালা দেশে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল দেখতে পাওয়া যায়।

'হাওড়া সেবা সঙ্ঘ' গড়ে ওঠে হাওড়ার কয়েকজন যুবকের চেষ্টায়। প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন হরেন্দ্রনাথ ঘোষ (সম্পাদক), ধীরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, বি-এল, গৌরমোহন রায় এম-এ, বি-এল, শরৎচন্দ্র পাল, অজিত মল্লিক প্রভৃতি। উপযুক্ত পরিচালকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে সঙ্ঘের কাজ চলতে থাকে। বাঙ্গালা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তারা জানেন, এ সমস্ত সঙ্ঘের কার্যকলাপ প্রকাশ্য এবং গুপ্ত এই দুই পথ ধরেই চলতো, থাকতো

সেবা বিভাগ, ব্যায়ামগার ও পাঠাগার প্রত্যেক সঙ্ঘেরই। পাঠাগারের গ্রন্থসমূহ গুপ্ত স্থানে রক্ষিত হত, আর সেখান থেকে বিপ্লবাত্মক পুস্তক পড়তে দেওয়া হ'ত সঙ্ঘের কর্মীদের। অবশ্য এর কোনটাই পুলিসের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বাঙ্গালা দেশের কতো মূল্যবান গ্রন্থসম্পদ আর গ্রন্থাগার যে এরকম রাজরোষের আর সর্বনাশকারী দমননীতির কবলে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে—রাতারাতি স্থানান্তরিত করেও বাঁচানো যায়নি, তার হিসেব দেওয়া সম্ভব নয়। 'হাওড়া সেবা সঙ্ঘের' ব্যায়ামগার আর পাঠাগার যে বার বার সে দমননীতির আঘাত সয়ে সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতিকে তুচ্ছ করে আজো টিকে আছে, সেটাই সত্যিকারের আশ্চর্যের বিষয়। ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন, কর্মীদের কি পরিমাণ প্রাণ-প্রাচুর্য থাকলে পরেই তবে সেটা সম্ভব।

এ সঙ্ঘের প্রথম উদ্বোধন করা হয় নরসিংহ দত্ত রোড ও হেম চক্রবর্তী লেনের সংযোগ স্থলে অজিত মল্লিক মহাশয়ের মাঠে। অল্পদিনের ভেতর সঙ্ঘের কার্যকলাপই বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জি লেনে স্থানান্তরিত করা হয় আর ধীরেন্দ্রকুমার সেনের সভাপতিত্বে গঠিত হয় নূতন কার্য-নির্বাহক সমিতি। দেখতে দেখতে সেবা-সঙ্ঘ সমস্ত অঞ্চলে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে, আর সাহিত্য ও পাঠাগার বিভাগ, সেবা বিভাগ ও ব্যায়াম বিভাগের কাজ চলতে থাকে। বিশেষভাবে ব্যায়াম বিভাগের লাঠিখেলা ও বিভিন্ন ব্যায়াম কৌশলে আকৃষ্ট হয়ে নূতন নূতন কর্মীরা এসে সঙ্ঘে যোগদান করেন। এই জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সঙ্ঘ কর্তৃক হাওড়ার প্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসব প্রবর্তিত হয় ১৯২৮ সালে আর সেই থেকেই বীরাষ্টমী ব্রত পালন করে আসছেন সঙ্ঘের কর্মীরা। এই বীরাষ্টমী দিবস শক্তিচর্চা ও সভা-সমিতি প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। বর্তমান বৎসরে (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) বীরাষ্টমী দিনের সভায় সভাপতিত্ব করে ডাঃ মেঘনাদ সাহা।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঘন-ঘটায় সমাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। ১৯৩০ সালে হরেন্দ্রনাথ ঘোষ জেলে যান। সঙ্ঘ বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত হয় ও সঙ্ঘগৃহে তালাচাবি পড়ে। সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্মিগণের অনেকেই কারাবরণ করেন সে সময়ে। কর্মিগণ কিন্তু গোপনে সঙ্ঘের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। জয়দেব কুণ্ডু লেনে সঙ্ঘের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় ও সঙ্ঘের

পরিচালনাভার গ্রহণ করেন হরেন্দ্রনাথের অগ্রজ ৺সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়। পরিচালকমণ্ডলীতেও কিছুটা অদল-বদল করতে হয়েছিল সে সময়ে। হরেনবাবু দ্বিতীয়বার জেল থেকে মুক্ত হ'বার পর সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। আড়াই মাস ধরে বামাচরণ কুণ্ডুর মাঠে ডাকুবাবুর সাহায্যে (অমরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু) সে প্রদর্শনী চলতে থাকে ও সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা। ইতিমধ্যে কর্মীদের ভেতর দলাদলির ফলে সঙ্ঘে ভাঙ্গন ধরে। অন্যদিকে পুলিসী-জুলুমের ফলে কর্মীদের ভেতর যোগাযোগ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে ও সঙ্ঘ মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। সেই মৃতপ্রায় সঙ্ঘকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে এগিয়ে আসেন কার্তিকচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সেই থেকে আজ পর্যন্ত চৌদ্দ বছর ধরে হাওড়া সেবা সঙ্ঘ কার্তিকচন্দ্র দত্তের পরিচালনাধীনেই চলছে। সরকারী কর্ম-নীতির পরিবর্তনের ফলে প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় ও ১৯৩৮ সাল থেকে সঙ্ঘের কার্যকলাপ আবার প্রকাশ্যভাবে চলতে থাকে।

হাওড়া সেবা সঙ্ঘের সমস্ত কার্যকলাপের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সাহিত্য সভা ও পাঠাগারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের লাঠিখেলা, কুস্তি সামরিক বাদ্য প্রভৃতিও চলতে থাকে। পাঠাগার বিভাগ পুনর্গঠিত হয় ১৯৩৮ সালে। সেই সময় অনেকেই বইপত্র ও টাকা দিয়ে পাঠাগারকে সাহায্য করেন। এ প্রসঙ্গে "প্রকাশ ইনষ্টিটিউট" পাঠাগারকে যে ইংরেজী বই-এর সংগ্রহ দান করেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৩ সালে সঙ্ঘের কার্যালয় ৩৩।১ নরসিংহ দত্ত রোডে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানেও সেই স্থানেই সঙ্ঘ কার্যালয় অবস্থিত আছে। সঙ্ঘ-পাঠাগারের গৃহ-নির্মাণের জন্য শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত বৃন্দাবন মল্লিক লেনে আড়াই কাঠা জমি দান করেছেন। গৃহ-নির্মাণ তহবিলে ইতিমধ্যে কিছুটা টাকা সংগ্রহ করাও হয়েছে। পাঠাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আরো অধিক টাকা সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। আশা করা যায় জনসাধারণের অকুণ্ঠ বদান্যতায় গৃহ-নির্মাণ তহবিল দ্রুত পুষ্ট হয়ে উঠবে। হাওড়া পৌর প্রতিষ্ঠান বর্তমানে পাঠাগারকে ১৮০৲ টাকা করে অর্থ সাহায্য করে চলেছেন।

পাঠাগার পরিচালনা ছাড়া পাঠাগারের উদ্যোগে নববর্ষ উৎসব, মিলনোৎসব,

রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নেতাজী জন্মোৎসব প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এর সাহিত্য সভা, বিতর্ক সভা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র সেন (সম্পাদক—দেশ), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সাহিত্যানুরাগীরা।

পাঠাগারের কিশোর বিভাগে কিশোরদের উপযোগী বই ও পত্র-পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে। কিশোর সভ্যদের মাসিক চাঁদা চার আনা ও জমা এক টাকা করে। সাধারণ সভ্যদের চাঁদা আট আনা ও জমা দুই টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনশিক্ষা খাতে পাঠাগারকে বার্ষিক ৩০০৲ টাকা করে সাহায্য করে থাকেন। সর্বসাধারণের পাঠের জন্য পাঠাগারে প্রায় সব ক'টি পত্র-পত্রিকাই রাখা হয় আর পাঠাগারে বসে বইপত্র পড়বার বিশেষ সুবন্দোবস্তই রয়েছে এখানে। প্রথমাবধি পাঠাগারের উন্নতির জন্যে শ্রীমদনমোহন মল্লিক ও শ্রীসুকুমার লাহা বিশেষ সাহায্য করে চলেছেন, এ প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। বর্তমানে এই পাঠাগারের পুস্তক-সংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশী। জাতীয় সাহিত্য, বিপ্লবাত্মক সাহিত্য, বিদেশী বিশেষ বিশেষ সাহিত্য ও ইতিহাস গ্রন্থের মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ এই পাঠাগারে। বারে বারে ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করতে না হ'লে 'হাওড়া সেবা সঙ্ঘ পাঠাগার' যে আজ হাওড়ার তথা সমস্ত জাতির সম্পদ বলে গণ্য হ'ত, একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। বহু বিচিত্র কর্মধারার ভেতর দিয়ে সঙ্ঘ আজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে চলছে। দেশ-বিদেশের সাময়িক পত্রিকার সংগ্রহ সঙ্ঘ-পাঠাগারের বিশেষত্ব।

হাওড়া সেবা সঙ্ঘ পাঠাগারের বর্তমান সভাপতি হাওড়ার পৌরপ্রধান আদর্শবাদী শ্রীকার্তিকচন্দ্র দত্ত মহাশয়। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন মল্লিক ও সাহিত্য সম্পাদক শ্রীসুকুমার লাহা অপর দুইজন অধ্যক্ষের সাহায্যে বর্তমানে পাঠাগার পরিচালনা করে থাকেন।

[৩০-১২-৫২]

হাওড়া সংঘ

পঁয়ত্রিশ বছর আগের হাওড়া—তখন আজকালকার মতো ট্রামবাস ছিলনা। জনসংখ্যা ছিল নগণ্য, স্কুল আর লাইব্রেরী যা ছিল সেটাও নাম করবার মতো নয়—মেয়েদের লেখাপড়া শিখবার উপায়ই ছিল না বলা চলে আর সিনেমার কথা কেউ ভাবতেও পারতো না—রস পরিবেশনে একমাত্র উপায় ছিল থিয়েটার। ফলে নবীনেরা উত্তোগী হ'লেন, প্রবীণেরাও হ'লেন সহানুভূতিশীল—প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগলো। ১৯১৭ সালে জনসেবার—দুঃস্থ আতুরদের সেবা করবার আদর্শ নিয়ে "অনাথ বন্ধু সমিতি" স্থাপিত হ'ল। শিক্ষার ব্যবস্থা করতে ১৯২০ সালে স্থাপিত হ'ল "বয়েজ ট্রেণিং কটেজ" আর ১৯২৫ সালে হ'ল 'আদর্শ বালিকা বিত্তালয়ের' প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া স্থাপিত হ'ল ১৯২৩ সালে 'সানরাইজ ড্রামাটিক ক্লাব' আর ১৯২৪ সালে 'সাধনা পাবলিক লাইব্রেরী' (বর্তমানে হাওড়া সঙ্ঘ পাঠাগার)। একটা নবজাগরণের স্রোত বয়ে চললো সমস্ত অঞ্চলকে ঘিরে—জনসাধারণ পুস্তক আর পত্র-পত্রিকা পাঠের সুযোগ পেল এই লাইব্রেরীর মারফৎ। তারপর ১৯২৫ সালের শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে 'ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী' হলে অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়ার সভাপতিত্বে এক সাধারণ জনসভায় এই সমিতি, বিত্তালয়, ক্লাব আর লাইব্রেরী সব কটা মিলিত হয়ে নতুন নাম গ্রহণ করলো 'হাওড়া সঙ্ঘ'।

হাওড়া সঙ্ঘ বর্তমানে ২৫।১ নীলমণি দত্ত লেনে সঙ্ঘের নিজস্ব বাড়ীতে অবস্থিত। এই বাড়ীর জন্য জমি কেনা হয় ১৯৪৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী। ১৯৪৮ সালের ৩০শে মে সঙ্ঘ ভবনের ভিত্তিস্থাপন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত। আর নবনির্মিত সঙ্ঘ ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হয় ১৯৪৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে। 'হাওড়া সঙ্ঘ পাঠাগার' বর্তমানে এই বাড়ীরই এক তলার সুপ্রশস্ত হল ঘরে অবস্থিত।

সঙ্ঘ পাঠাগার প্রথম আরম্ভ হয় 'সাধনা পাবলিক লাইব্রেরী' নামে ১৯২৪

সালে। সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন ও জনসাধারণের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের সুবিধা-সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই এর আরম্ভ। লাইব্রেরীর প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন বিনয় মল্লিক, তুলসী দাস হাজরা, সুশীল বসু, আশুতোষ কুণ্ড, পঞ্চানন সরকার, নিশিকান্ত ঘোষ, হরিদাস পাল প্রভৃতি। তুলসীদাস হাজরা বিনা ভাড়ায় লাইব্রেরীকে তাঁর বৈঠকখানা ঘর ছেড়ে দিলেন আর দান করলেন একটা আলমারি ও একটা টেবিল। কার্তিক বিশ্বাস লাইব্রেরীকে আরও দু'টি আলমারি দিলেন আর জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিলেন একটি লম্বা টেবিল, দু'টি বেঞ্চি ও দুটি আলমারি। কর্মীরা পুস্তক সংগ্রহ করে লাইব্রেরী গড়ে তুললেন। বিনয় মল্লিক, পঞ্চানন সরকার প্রভৃতির বদান্যতা লাইব্রেরীর প্রথম অবস্থায় বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য। সকলের সমবেত চেষ্টায় লাইব্রেরী দেখতে দেখতে উন্নত হয়ে উঠলো।

লাইব্রেরীর কলেবর ও কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগলো। তুলসীদাস হাজরার বৈঠকখানা থেকে সঙ্ঘ পাঠাগার উঠে যায় লোকনাথ খাঁর বাড়ীতে ভাড়াটে ঘরে। চার আনা চাঁদার উপর নির্ভর করেও পাঠাগার তখন বেতন দিয়ে লাইব্রেরীয়ান রাখতে পেরেছে। সেখান থেকে লাইব্রেরী উঠে যায় মন্মথ দাসের (খোকাবাবু) বাড়ীতে (বর্তমানে যেখানে সঙ্ঘ ভবন অবস্থিত)। তারপর ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে লাইব্রেরী উঠে যায় ১৯৩১ সাল নাগাদ। এইখানেই কুমার মনীন্দ্রদেব রায় ও তিনকড়ি দত্তের নির্দেশে পাঠাগারের ছাত্র বিভাগ খোলা হয়। ছাত্র-কর্মীদের উৎসাহে ১৯৩১ সালে পাঠাগারে 'শিশু-সাহিত্য বাসরে'র আয়োজন করা হয় আর 'রাধাবাসরে'র সাহিত্যিক গোষ্ঠিকে আমন্ত্রণ করা হয় একাধিক বার। এ ছাড়া এ সময়ে লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য (মাস পয়লা), অখিল নিয়োগী, বিজনবিহারী গাঙ্গুলী, ক্ষিতীন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ শিশু-সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। লাইব্রেরীর কার্যকলাপ বেড়ে উঠায় আবার লাইব্রেরীর স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল, লাইব্রেরী এবার উঠে এলো শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ ঘটকের বাড়ীর নীচের তলার ঘরগুলোতে।

এখানেই সঙ্ঘ পাঠাগারের উন্নতির জোয়ার বলা চলে। এ সময় সাহিত্য-

বাসরের অনুষ্ঠান হ'ত প্রায়ই। নানা অনুষ্ঠানে এখানে যোগ দিয়েছেন সার যদুনাথ সরকার, মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল গুপ্ত, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, গোপাল হালদার প্রভৃতি বাংলা দেশের সাহিত্যিকেরা। ১৯৩৯ সালে পাঠাগার থেকে হাতেলেখা পত্রিকা 'জয়যাত্রা' বের হতে থাকে, সেটাই বর্তমানে বুদ্ধদেব ঘটকের সম্পাদকত্বে 'রেখা'য় রূপান্তরিত হয়েছে। পাঠাগারের 'পাঠচক্র' এ সময়েই গড়ে উঠে, বর্তমানেও পাঠচক্রে সাহিত্য আলোচনা বৈঠকে বসে থাকে প্রতি সপ্তাহে। প্রতি বৎসর পূজার ষষ্ঠী তিথিতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন সঙ্ঘ পাঠাগারের বিশেষত্ব। সাধারণ সভ্য-সভ্যা, ছাত্র-ছাত্রী, বালক-বালিকার জন্য পৃথক্‌ভাবে ৮টি বিভাগে এই প্রতিযোগিতা চলে আসছে ১৯৪৭সাল থেকে। প্রত্যেক বিভাগের ১ম স্থান অধিকারীকে 'চ্যালেঞ্জ কাপ' ও বই আর ২য় স্থান অধিকারীকে কেবল মাত্র বই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পাঠাগারের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ৯০০০, বহু বাঁধানো সাময়িক পত্রিকা পাঠাগারে রক্ষিত আছে। পাঠাগারের 'ফ্রি রিডিং রুম' প্রশস্ত কক্ষে অবস্থিত। এখানে জনসাধারণের পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা আছে। প্রায় সব ক'টি সাময়িক পত্রিকা ও তিনখানা দৈনিক এখানে রাখা হয়ে থাকে। সঙ্ঘ পাঠাগারের সভ্যেরা ছাত্র ও সাধারণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কলেজের ছাত্রদের তিন আনা আর স্কুলের ছাত্রদের দু' দুই আনা করে মাসিক চাঁদা দিতে হয়, ছাত্রদের জমা দিতে হয় না। সাধারণ সভ্যদের দুই শ্রেণী জমা যথাক্রমে পাঁচ টাকা ও তিন টাকা, মাসিক চাঁদা ছয় আনা ও বারো আনা আর শ্রেণী হিসাবে একসঙ্গে বই নেবার যোগ্যতা দুই খানা ও একখানা। সঙ্ঘের পাঠাগারের বর্তমান চেয়ারম্যান ডাঃ ভবানী দে, সম্পাদক, শ্রীগোবিন্দলাল মিত্র আর শ্রীরাধারমণ ঘোষ পাঠাগারের বর্তমান গ্রন্থাগারিক।

'হাওড়া সঙ্ঘে'র কেন্দ্রীয় কমিটির বর্তমান সভাপতি শ্রীকানাইলাল সরকার আর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সত্যেন্দু কুণ্ডু।

[১৯-১১-৫২]

সমাপ্ত